স্মৃতিটুকু থাক

স্মৃতিটুকু থাক

শক্তিপদ রাজগুরু

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
—মাঘ, ১৩৭১

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৯

মুদ্রাকর :
দিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

স্মৃতিটুকু থাক

পাহাড়ের মুলুকে যাঁরাই গেছেন তাঁরা দেখেছেন পাহাড়ের সানুদেশ থেকে পাহাড়ি রাস্তাটা একদিকে ক্রমে গভীর খাদ অন্য দিকে উদ্যত পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে আধা বাঁক, বিপজ্জনক চুলের কাঁটার মত বাঁক পার হয়ে উপরে উঠতে থাকে, একদিকে অতল খাদ, চাইলেই মাথা ঘুরে যায়, কোনরকমে এপথের শেষ হলে যেন বাঁচা যায়। কোনরকমে এই কষ্টকর পথ পার হয়ে পর্বতশীর্ষে উঠে নীচের দিকে চাইলে মনে হয় সবুজ শ্যামল রোদ মাখা এক সুন্দর জগৎকে, এই জগৎ যেন এক স্মৃতির জগৎ—রূপ রংএ রঙিন একটি ছবিই। তা এখন অতীত।

....মানুষের জীবনপথটাও প্রায় তেমনিই যখন সে এই দিনগুলোর মধ্য দিয়ে চলেছিল—তখন তা ছিল সুখ-আতঙ্কের আলো ছায়ায়, কখন উজ্জ্বল, কখন ধূসর, বিবর্ণ। কিন্তু দীর্ঘ জীবন পথ অতিক্রান্ত হবার পর যখন পিছন ফিরে চায় মনে পড়ে কত দিনের স্মৃতি, কত সঙ্গী বন্ধুদের কথা। আজ তারাও হারিয়ে গেছে। এক সে পড়ে আছে নিঃসঙ্গ। পিছনের স্বপ্নরঞ্জিত দিন-কত স্মৃতি সেদিন এক নতুন জগতের সন্ধান দেয় তাকে।

আমিও আজ যেন তেমনি এক পিছনে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিচারণই করতে চলেছি, যে জগৎকে একদিন দেখেছিলাম কাছ থেকে, সেই সব দিক পালদেরও কিছু কিছু চিনেছিলাম আজ সেসব স্মৃতির জগতে নির্বাসিত।

তখন সরকারি চাকরির জোয়ালে আটকে পড়েছি, কলকাতা মহানগরীতে নবাগত। থাকি একটা মেসে। সেই মেসের পাশের মেসে থাকেন সাহিত্যিক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। বীরভূমের এক দূর গ্রাম নাগরাকোন্দার মানুষ।

আমিও এই নাগরাকোন্দায় কিছুদিন কাটিয়ে এসেছি, অন্ডাল সাইথিয়া লাইনের পাঁচড়া স্টেশন থেকে নেমে লাল রুক্ষপ্রান্তর, বন্ধ্যা-অনুর্বর শস্যরিক্ত মাঠ পার হয়ে সেই গ্রাম। দূর থেকে উঁচু বাঁধের উপর প্রহরীর মত তালগাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। বিবর্ণ এক অপরাহ্নের আলোয় নাগরাকোন্দাকে দেখেছিলাম।

সেই গ্রামের পর কিছুটা বুঝি শালবন—তার ওদিকে রূপসীপুর। সেখানে শুনেছিলাম সাহিত্যিক শৈলজানন্দের বাড়ি। এদিকে লাভপুর গ্রামকে আগেই দেখেছি। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক তারাশঙ্করের বাড়ি।

নাগরাকোন্দার সুবাদেই ফাল্গুনীদার সঙ্গে পরিচয়, প্রতিবেশী মাঝে মাঝে তার

ঘরেও যেতাম, মেসের মধ্যে সেইটাই ছিল বিশাল বেডরুম, দশফিট বাই আটফিট আন্দাজ ঘর, বোধহয় তাও হবে না। চারিদিকে বই, কাগজপত্র ঠাসা, তক্তপোশটাতেও বইয়ের স্তূপ। এই পরিবেশেই ফাল্গুনীবাবু সাহিত্য সাধনা করে গেছেন।

আমিও এর মধ্যে একটু আধটু লেখা শুরু করেছি। দেশ পত্রিকাতেও লেখা গল্প প্রকাশিত হচ্ছে। আর একটা সৌভাগ্য আমার হয়েছে, শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আমি মুগ্ধ পাঠক, সেই বিভূতিবাবুকেই খুঁজে বের করেছি মিত্র ঘোষের আড্ডায়। আর তার স্নেহ লাভেও ধন্য হয়েছি।

তখন বাংলা সিনেমার গৌরবময় যুগ, আমি থাকি মধ্য কলকাতার মির্জাপুর অঞ্চলে। আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে জেলে পাড়ার কিছু তরুণও আছে। তাদের নেশা ছিল পুরবীতে প্রথম শোতেই মুক্তি পাওয়া সিনেমা দেখার। তখন লাইনের বালাই নেই। প্রচণ্ড ভিড়, তার মধ্যে দুলাল কাজিত ব্যায়ামপুষ্ট দেহ নিয়ে জামাটা খুলে মুখে বেশ কিছু বন্ধুর জন্য টিকিট কেনার টাকা নিয়ে, এই জনতার মাথার উপর দিয়ে কি কৌশলে ভাসমান অবস্থায় কাউন্টারে গিয়ে পৌঁছতো সেটা সেই জানে।

ব্যাস, টিকিট কেনা শেষ, দলবেঁধে আমরা প্রথমশোর দর্শকের ভূমিকাই নিতাম। বাংলা ছবির হাউস তখন গম গম করত। সাহিত্য থেকেই যেতো সিনেমার কাহিনী। দর্শকও বলতো—বই দেখতে যাচ্ছি। বই-এবং সিনেমার তখন একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাই সাহিত্য রচনা করতে করতে আমিও সিনেমার স্বপ্ন দেখতাম।

অবশ্য সিনেমার সম্পর্কে ছেলেবেলাতেই আমার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছিল। তখন আমি থাকি বাবার কর্মস্থল মুর্শিদাবাদ জেলার এক সীমান্তের গ্রামে। সদর শহর বহরমপুর থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে, মহকুমা শহর থেকেও ছ'মাইল ভিতরের এক গণ্ডগ্রামে। রাস্তাঘাট বলতে মহকুমা শহর থেকে হাঁটা পথ, মাটির মরাম। ময়ূরাক্ষী, কানা ময়ূরাক্ষীর দৌলতে বর্ষায় তা দুর্গম।

সেই গ্রামে শীতের সময় মেলা বসতো। জায়গাটা মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান-বীরভূমের সীমান্তে তারাশঙ্করবাবুর গ্রাম থেকে দশ মাইল-বারো মাইল' এদের বেরুবার অন্য পথ ছিল এই লাভপুর হয়েই।

ফলে আমি তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্য রচনার মূল উপাদান—তাঁর সাহিত্যের পটভূমি, বহু চরিত্রকেই দেখেছিলাম। ময়ূরাক্ষীর বাঁধ ভেঙে আমাদের গ্রামবসতও প্লাবিত হত, ময়ূরাক্ষীর বন্যা, তারিণী মাঝিদের মত অনেককেই দেখেছি, মেলায় মেলায় ফেরা কবিয়াল' ভ্রাম্যমাণ ঝুমুর দলের বহু রকম ঝুমরিওয়ালীদের দেখেছি।

দেখেছি বহু বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের আখড়াকে, বহু বাউলকে ;এই অঞ্চলের ক্ষয়িষ্ণু অহঙ্কারী ধসেপড়া জমিদারকুলকে। তার অভিযান উপন্যাসের এই ঢং ঢং ধাঁসেও আমি বহুবার হয়তো যাতায়াত করেছি, ফলে তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্য আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্য তার পটভূমি, তার চরিত্র, তাঁর মানবিকতা আর

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি প্রেম, তার সংবেদনশীল সহজিয়া ভাবও আমাকে আকর্ষণ করেছে। এই দুই দিকপাল আমাকে অজ্ঞাতসারেই সাহিত্য জগতের পথে এনেছেন বলেই মনে করি।

যা বলছিলাম, সেই গ্রামীণ মেলায়, সেবার প্রথম এল সিনেমা, অর্থাৎ তখনকার ভাষায় টকি বাজী। তখনও সবাক ছবির প্রচলন হয়নি গ্রামের দিকে। সবে শহরে হচ্ছে। গ্রামের মেলায় বিরাট তাঁবু গেড়ে সেখানে গেল এক তাঁবুর সিনেমা, নামটা আজও ভুলিনি তাদের কোম্পানির নাম ছিল 'রাজপুতনা নাগর টকিজ'।

মেলার সবার সেটাই বিশেষ আকর্ষণ। সদ্য কাটা ধানমাঠে তখনও ধানের কিছু গোড়া রয়ে গেছে। তার উপর চট পেতে জনসাধারণের বসার জায়গা, বেঞ্চ কয়েকটা ছিল পিছন দিকে। তার দাম বেশি, আমার বন্ধু ন্যাড়া বলে,--ইকিরে, যাত্রার আসরে, সার্কাসে কাছের টিকিটের দামই বেশি, ইদের দেখি উল্টো ব্যাপার। যত দূরে তত বেশি টিকিটের দাম, কাছেই বসবি চল ভালো দেখা যাবে। বোধহয় দু'আনা টিকিটের দাম, এই ধানের গোড়ার উপর চট পেতে দেখলাম এক বিচিত্র ব্যাপার। আমার মনে হয় ভক্ত প্রহ্লাদ, সাবিত্রী সত্যবান মানুষগুলো পর্দায় নড়ছে, মুখ নাড়ছে আর কথাগুলো পর্দায় লেখা পড়ছে, যমরাজ বিষ্ণু—দেবদেবীদের সাক্ষাৎ দেখে বহু জন প্রণামও করছে।

ক'দিন বেশ হৈ চৈ করে কাটল। এর মধ্যে আমি ন্যাড়ার কৌশলে ওদের সিনেমা চালাবার মেশিনগুলো দেখেছি। একটা গোটানো ফিতে ঘুরছে তীব্র আলোর সামনে—পর্দায় সেই ছবিটা পড়ছে।

ওই ফিতেটাই আসল, ন্যাড়াকে বলি- এই ফিতে কিছুটা পেলে আমরাও সিনেমা দেখাতে পারি।

তখন স্কুলে ফাইভ সিক্সে পড়ি, ন্যাড়া বলে পারবি, দেখি ওই ফিলিম মেলে কিনা।

যা পাওয়া গেল আশেপাশে তা সামান্য টুকরো টাকরা, ওতে কোন কাজই হবে না। তবে ওতেই দেখা যায় শিল্পীদের মুখগুলো—অর্থাৎ ওদের অভিনয় করিয়ে তারই ছবি তোলা হয়েছে। সেই ছবিই প্রতিফলিত করা হচ্ছে পর্দায় এটা বোঝা গেল।

মেলা চুকে গেছে, পরিত্যক্ত বাগান, ধানমাঠ সেদিন ন্যাড়া এসে খবর দেয় সবজে পাড়ার কানু ওই মাঠে গরু চরাতে গিয়ে বেশ অনেকটা লম্বা ফিলিম পেয়েছে। তা হাত চারেক পাঁচতো হবেই, বেশিও হতে পারে। গোটানো আছে গোল করে। ওটা পেলে টকি বাজী দেখাতে পারবি? আমার মাথাতে কৌশলটা ঘুরছিল। পরীক্ষা করতে দোষ কি? তাই বলি,--তা হতে পারে, ওই ফিলিমটা আন।

ন্যাড়া বলে—কানু ব্যাটা গরু চরালে কি হবে, মহা ঠ্যাটা, বলে একটাকা না পেলে দেবে না।

তখন এক টাকার দাম অনেক। দু'চার আনার সঞ্চয় থাকে, তবে এক টাকা

কোথায় পাবো। বোসদের হরির ও টকি বাজী দেখার সখ, তাছাড়া ওই ফিলিম থাকলে আমরা নিজেরাই যখন তখন টকি দেখতে পারবো। তাই চাঁদা তুলেই কুল্যে বারোআনা উঠলো, তার থেকে বড় মোমবাতি কিনতে হবে—পর্দা না হয় কাপড়েরই হবে। তাই কানুকে অনেক জপিয়ে শেষে ন্যাড়া দশআনায় রফা করে, ফিল্মটা আনলো। বোধ হয় ওদের বাতিল ফিলিম তাও প্রায় ছ'হাত লম্বা।

নতরফের জমিদারবাবুদের কাছারি বাড়ির ওদিকে একটা বড় ঘর পড়েই থাকত। অন্ধকার, পুরানো ঘরটাতেই সিনেমা হল হবে আমাদের। একটা টিনেব চোঙ্গতো জুটে গেছে। দেওয়ালে কাপড়ের ছোট পর্দা টাঙিয়ে, বড় মোমবাতি জ্বেলে টিনের চোঙের মধ্য দিয়ে আলোটা বের হবে, তারই সামনে এই ফিল্মটা ধরতে হবে—নিশ্চয়ই প্রতিচ্ছবি পড়বে পর্দায়।

তখন শিশুমনের ধারণাগুলো আজ হাস্যকরই মনে হয়, কিন্তু দূর প্রত্যন্ত পল্লীর শিশুদের কাছে সেদিন এইটাই ছিল স্বপ্ন।

দর্শক জুটেছে বিনা পয়সায় টকি বাজী দেখবে। বন্ধুরা ভিড় করেই এসেছে। ন্যাড়া খুব ব্যস্ত টিনের চোঙের প্রান্তে কাঁচও লাগানো হয়েছে—আলো হিসাবে জ্বালা হয়েছে বড় মোমবাতি। এদিকে সাপের ল্যাজের মত ফিল্মটা খুলে গিয়ে একপ্রান্ত কি করে মোমবাতির উপর পড়তেই দপ্ করে ফিল্মটা জ্বলে ওঠে—আর নিমেষের মধ্যে সারা ফিল্মে আগুন ধরে গেল—আমরা হতচকিত, চোখের সামনে এত কষ্টে সংগৃহীত ফিল্ম পুড়ে ছাই—আমরা অবশ্য ছেড়েই দিয়েছিলাম ভয়ে ফিল্মটা। ওই ফিল্ম যে এমনি বারুদের মত জ্বলে উঠবে তা ভাবিনি। ন্যাড়া বিজ্ঞের মত বলে।

—এই ফিল্মের কারবারে খুব বিপদরে। একেবারে ফায়ার—

এসব ভালো জিনিস নয়। ফিলিম টিলিমের থেকে দূরে থাকাই ভালো। না সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

আজ এতদিন পরেও ন্যাড়ার সেই কথাগুলো মনে পড়ে। তখন অবশ্য ফিল্ম ছিল খুবই বিপজ্জনক দাহ্য পদার্থ।

এখন নানা গবেষণার পর ফিল্ম আর তেমন দাহ্য পদার্থ নয়। তবু ফিল্ম এর ব্যবসা মোটেই নিরাপদ নয় সেটা মনে হয়।

তবু স্বপ্নপশারীদের এই জগতে অনেকেই স্বপ্নের পশরা নিয়ে আসে, কেউ অনেক পয়সাই রোজগার করে, কেউ বিকিকিনিব হাটে দেউলিয়া হয়ে যায় তবু এ জগতে আনাগোনা থামে না।

আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল সেকালের নামকরা চিত্রনাট্য লেখক বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের। আমি তখন লেখালেখি করছি। তখন বাংলা সাহিত্য জগতে সত্যিকাব ভালো লেখার কদর করতেন সম্পাদকরা। সেখানে মানুষের পরিচয়ের থেকেও বড় পরিচয় ছিল তার লেখা। গুণাগুণ বিচার করা হোতো এই ভাবেই।

না হলে অচেনা অজানা এক মফস্বলের তরুণ ডাকযোগে সেদিন নামী সাপ্তাহিক

পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছিলাম আর চার-পাঁচদিন পর সাইকেল পিওন এসে চিঠি দিয়ে যায় আপনার গল্পটি মনোনীত হয়েছে যথাসময়ে পত্রস্থ করা হবে।

আজ আর এসব হয় কিনা জানা নেই। তখন বাংলা সাহিত্যের জগতে সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়াও ছিল প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী-পরিচয়, আরও অনেক ছোট বড় মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ছিল দীপালি-ভগ্নদূত-শিশির, ছোটোদের জন্য শিশুসাথী, মৌচাক, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকা। তরুণ লেখকদের লেখার অনেক সুযোগও ছিল। তখন পত্র-পত্রিকার লেখকদের আড্ডা ছিল, কিন্তু সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র বা পরস্পর পিঠ চুলকানি সমিতির উদ্ভব হয়নি। সকলের মধ্যেই মেলামেশা আন্তরিকতা ছিল। সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছুকে বেছে নিয়ে গলায় সোনার বকলেস পরিয়ে তাদের আভিজাত্য প্রদানের প্রচলনও ছিল না। ফলে নিজেদের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল।

কলেজ স্ট্রিট পাড়াতে তখন সব সাহিত্যিক মনীষীরাই আসতেন। প্রশান্তকুমার মহলানবীশের মত লোককেও দেখেছি দাশগুপ্ত ব্রাদার্স-এর বই-এর দোকানে। রসিকতা করে তিনি বলতেন।

—আমি অক্সফোর্ডে থাকি হে।

— অক্সফোর্ড।

অধ্যাপক মহলানাবীশ বলতেন—অক্স মানে কি 'এঁড়ে' আব ফিওর্ড মানে 'দহ'—কি হলো? 'এঁড়েদহ'-কে কি অক্সফোর্ড বলা যায় না বাংলাভাষায়?

মিত্রঘোষের ছোট্ট দোকান তখন শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে। এই ছোট ঘরে সমবেত আড্ডা জমাতে দেখেছি সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশী, তারাশঙ্করবাবু, বিভূতিবাবু, সুবোধ স্যান্যাল, কৃষ্ণধন বসু প্রমুখদের। খবরের কাগজের উপর মুড়ি, চানাচুর আর বাতাসা দিয়ে আপ্যায়ন করতেন ছোট্ট গজেনদা, সুমথবাবু ওই মহারথীদের, দেখেছি কালীকামুখুয্যের হাতিবাগানের উপর সাহিত্যিক শিল্পীদের আড্ডা, মাছভাতের উৎসব, উল্টোরথে প্রসাদ বসু, গিরীশ বসুর আড্ডাতে ছিল তেলেভাজার উৎসব।

শেষদিকে মধুসূদন মজুমদারদের নবকল্লোলের আড্ডার পর আজ সেসব আড্ডা-আসর গল্পকথায় পরিণত হয়েছে। কলকাতায় ফাঁকা থাকলে এখানে বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর পি.সি.সরকার ও আসতেন প্রায়, তার আলাপচারিতাও ছিল আড্ডার আকর্ষণ।

যা বলছিলাম, সেই বিনয় চাটুয্যের কথা। বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের পড়াশোনা ছিল প্রচুর। বিশেষ করে বার্নার্ডশ' এর উপর তার ছিল প্রগাঢ় ভক্তি। কাটাকাটা তির্যক সংলাপ যা শ'এর নাটকের সম্পদ, বিনয়দা সেই রীতি তার সংলাপেও আনতেন।

তখন নিউথিয়েটার্স-এর ছিল গৌরবময় যুগ। বীরেন সরকার মশাই-এর ওই প্রতিষ্ঠান তখন সারা ভারতের একক এবং অনন্য প্রতিষ্ঠান। ভারতের ফিল্ম জগতে

নিউ থিয়েটার্স তখন সর্বজন পরিচিত প্রতিষ্ঠান। শিল্পী, সঙ্গীতপরিচালক, পরিচালক, লেখক, চিত্রনাট্য লেখকরা সেখানে মাস মাইনের ভিত্তিতে কাজ করতেন। ওদের শিল্পী তালিকাতে ছিলেন রাজকাপুরের বাবা বিখ্যাত অভিনেতা পৃথ্বীরাজ কাপুর। তাই রাজকাপুর, শশীকাপুরের ছেলেবেলা কেটেছে কলকাতার ভবানীপুরে। ছিলেন ভারত বিখ্যাত গায়ক শিল্পী কে.এল. সায়গল যার জাদুকণ্ঠ সারা ভারতকে মুগ্ধ করেছিল। পাহাড়ী সান্যাল-কাননদেবীরাও ছিলেন এখানেই, আরও অনেকেই ছিলেন। পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন নীতিন বসু, ফণী মজুমদার, বিমল রায়, হেমচন্দ্র চন্দ্র, কার্তিক চাটুয্যে, শিল্পী নির্দেশনায় ছিলেন সৌরেন সেন, এডিটিং এ ছিলেন কচিবাবু, আর সঙ্গীতের দিকে ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতি। অরবিন্দবাবুও ছিলেন এখানেই। চিত্রনাট্য বিভাগে ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিনয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিনয়দা থাকতেন সাদার্ন এভিন্যুর দিকে একটা দোতলা বাড়িতে, তখন ওই অঞ্চল অনেক ফাঁকা। নীচে বড় ঘরটা বইএ ঠাসা, বিনয়দা বিয়ে-থা করেননি বলে ওর ঘরে ছুটির দিন জমতেন হেমচন্দ্র, বিমল রায় আরও অনেকে। বিমল রায় ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। মাঝে মাঝে বিনয়দার বাড়িতে গানের আসরে বিমলবাবুকেও গাইতে দেখেছি, তখন তারা বোম্বাই-এ পাড়ি দেননি।

যতদূর মনে পড়ে অঞ্জনগড় ছবির প্রস্তুতি চলছে।

তখন কলকাতার মেট্রো-লাইটহাউস-গ্লোব-এলিট প্রভৃতি হলে বিদেশী বিখ্যাত ছবির নিয়মিত প্রদর্শনী হত।

হলিউডের ভালো ভালো ছবিই নিয়মিত দেখানো হতো। গন্ উইদ দি উইন্ড ক্লিয়োপেট্রা, প্রিজনার্ অব জেন্দা (যার থেকে হয়েছিল ঝিন্দের বন্দী), অসংখ্য ভালো ছবিই দেখানো হতো। তখন আন্তর্জাতিক মানের অভিনেতা অভিনেত্রী যেমন জন ব্যারিমুর, পলমুনি, রবার্ট তোজার্ট, ক্ল্যারি গ্রান্ট, গ্রেগরী পেক, গ্রেটা গার্বো, মার্সিন মনদো-ইন্গ্রিস বার্গমান, সোফিয়া লোরেন, এদের অভিনয়ের দাপটও ছিল এখানে। এখানের শিল্পীরাও এই আন্তর্জাতিক মানের অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অভিনয়ের থেকেও নিজেদের অভিনয় ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হতেন। তাছাড়া তখন কলকাতার বুকে মিনার্ভা, স্টার, রংমহল, নাট্যনিকেতেন (পরে শ্রীরঙ্গম) এসব মঞ্চ রমরমিয়ে চলত—আর মঞ্চে অভিনয় করতেন বাংলার বাঘা বাঘা শিল্পীরা। শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্রমন রায়, রবি রায়, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সন্তোষ সিং, রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, প্রভৃতিরা। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে সরযূদেবী, নীহারিকা, রাজলক্ষ্মী দেবী, রেবা বোস, প্রভা দেবী আরও অনেকে বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় করতেন। এছাড়াও অনেক শিল্পী তখন পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ছাড়াও গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করতেন। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলি, প্রেমাংশু বসু,

ঠাকুরদাস মিত্র, প্রদীপ কুমার প্রভৃতিরা বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারেই অভিনয় করতেন, ফলে প্রচুর অভিনয় জানা শিল্পী মঞ্চ থেকে ছবিতে আসতেন। অভিনয়ের সামগ্রিক মানও ছিল অনেক উন্নত। সেদিন কৌতুক অভিনেতারাও ছিলেন অনেকে শক্তিমান অভিনেতা। রণজিত রায়, ইন্দু মুখুয্যে, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ হালদার, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চাটুয্যে প্রভৃতিরা ছিলেন শক্তিমান শিল্পী। ফলে ছবিতে অভিনয় ছিল একটা সম্পদ। তাই সেদিনের দর্শক ভালো ছবি, ভালো অভিনয়—জোরালো কাহিনীকারই পেতেন আর তা ছিল বাংলার নিজস্ব।

বিনয়দার কথা বলছিলাম—সাদা আনন্দময় চিরতরুণ বিনয়দা আর শৈলজানন্দবাবুর উপর ছিল চিত্রনাট্য রচনার ভার। এদের নিজস্ব ঘর ছিল নিউথিয়েটার্স-এর ভিতর ঢুকে বাঁপাশে দোতলায়।

আমার অফিসে তখন সকালের ডিউটি। ওইটাই আমি বেছে নিয়েছিলাম কারণ বেলা একটার পর থেকে পুরো সময়টাই আমার। মেস তখন ফাঁকা, খাওয়াদাওয়ার পর লেখাপড়ার কাজ চালাতাম দুপুর থেকে সন্ধ্যা অবধি। আবার মাঝে মাঝে বের হয়ে পড়তাম বই পাড়ায়, না হয় বিভিন্ন সম্পাদকের দপ্তরে। কোন কোনদিন যেতাম বিনয়দার কাছেও নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে।

তখন টালিগঞ্জ অবধি সহজে যাবার উপায় ছিল ট্রামই। এত বাস-মিনিবাস-এর রুট তখন ছিল না। মিনিবাসের পত্তনই হয়নি। দেশবিভাগের আগে আমি বলছি বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ সালের কথা। তখন টালিগঞ্জ ছিল করপোরেশনের বাইরে, অন্য মিউনিসিপ্যালিটির অধীন, বসতি ছিল এই প্রিন্স আনোয়ার শা রোড অবধি, নিউ আলিপুর তখন ফাঁকা মাঠ ধুধু জমি, জলা কাশবন, খেজুর ঝোপে ভরা। কোন কোম্পানি ওই জলা তখন বোজাচ্ছে। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সামনে ছিল বিশাল দেবদারু গাছের জটলা। বড় বড় গাছগুলো ছায়া মেলে থাকত, বলত গাছতলা।

আজ তাদের দু'একজন টিকে আছে কোনমতে আর গাছতলা এখন অটোরিক্সার স্ট্যান্ড, ঝুপড়ির দোকানে ভর্তি শুনি সন্ধ্যার পর ওখানে ভাবী শিল্পী, হবু পরিচালকরা, কলাকুশলীরা আসেন, ওখানে ক্ষণে ক্ষণে এখন ছবি, টি ভি সিরিয়াল তৈরি হয় আবার হারিয়েও যায়।

তখন ট্রাম ডিপোর পর টালিগঞ্জের বসতি খুঁজে পাওয়া ছিল ভার, গাছগাছালির রাজ্য, শান্ত পরিবেশ, লোকালয় কিছু ছিল এই চণ্ডী ঘোষ রোডের তিনমাথায়, তাও সামান্য। কোন বাসও গর্জন করে যেত না। নিস্তব্ধ পরিবেশে গড়ে উঠেছিল ট্রাম ডিপোর পিছনে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও, তার আগে ছিল রাধা ফিল্ম স্টুডিও, পরে সেখানে দূরদর্শনের কেন্দ্র বসে প্রথম দিকে, এখন সেটা বন্ধই রয়েছে।

ইন্দ্রপুরীর বাঁদিকে ছিল বিশাল বাগান ঘেরা কালী ফিল্মস্ স্টুডিও, এখন তার অনেকটা জায়গা চলে গেছে রাস্তায়, টিকে আছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও রূপে অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে। তার পরে বাঁদিকে ছিল ফিল্ম কর্পোরেশন স্টুডিও, এখন

সেখানে উদ্বাস্তুদের বাহ্য, একটা ফ্লোরই দাঁড়িয়ে আছে। একটা পুকুর ছিল, গাছঘেরা সুন্দর পুকুর। এখন গাছ আর নাই। পুকুর ও ডোবায় পরিণত। আধখানায় মাল্টিস্টোরেজ বড়ি উঠছে।

তারপর ছিল ফাঁকা—এখন ঘিঞ্জি জনবসতি, স্কুল, তারপর ছিল সবুজ প্রশান্তি নির্জনতার মাঝে নিউথিয়েটার্স স্টুডিও, এটা ছাড়িয়ে খালের দিকে একটু এগোলে ছিল ক্যালকাটা মুভিটোন। সেটাও বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল, ঘাট বাঁধানো পুকুর, বাগান মাঠও ছিল, এখন পরিত্যক্ত। আরও একটা স্টুডিও ছিল বি-এস খেমকাদের-সেটা ছিল অধুনা মুর এভেনিউ-এর কাছে। এখন ধ্বংস হয়ে গেছে।

সেদিন নিউ থিয়েটার্স এবং অন্য স্টুডিও তো ফিল্মের ডায়ালগ সাউন্ড ভ্যানে ডাইরেক্ট রেকর্ডিং করা হত।

এখন সিন টেক করার সময় অভিনেতারা অভিনয় করলেন, সংলাপ বললেন, সংলাপটা অবশ্য নাগরা মেশিনে রেকডিংও করা হল, পরে ওই ডায়ালগগুলো আবার বলে ছবিতে সেই ডায়ালগই লাগানো হয়। একে বলে 'ডাবিং'। এতে বাইরের কোন শব্দ থাকে না—ডায়লগ স্পষ্টতর হয়।

কিন্তু তখন এই রীতিতে কাজ হত না।

ছবির টেকিং-এর সময় শিল্পীদের ছবি নেওয়া হত ক্যামেরাতে আর মাইকে সেই ডায়ালগ রেকর্ড করা হত ফ্লোরের বাইরে রাখা সাউন্ড রেকর্ডিং ভ্যানে রাখা রেকর্ডিং মেশিনে। কারণ ওই স্টুডিও এলাকা ছিল নিঝুম, গাড়ির যাতায়াত ছিল না। ফলে এই ভাবেই রেকর্ডিং করা হত। তখন সাউন্ড রেকর্ডিস্টরা ছিলেন অনেকেই নামী শব্দ গ্রাহক, লোকেন বসু, মধু শীল, জে, ডি, ইরানী প্রভৃতি আরও অনেক নামীদামি রেকর্ডিস্ট ছিলেন, জে. ডি. ইরানীকে সকলে সম্মান দিয়ে বলত—ফাদার ইরানী।

এরা বাংলার বহু সেকালের শ্রেষ্ঠ ছবির রেকর্ডিং করে ছিলেন এই ভাবেই। যতদূর মনে পড়ে, 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবির শব্দসংযোজন এই ভাবেই করা হয়েছিল আজকের টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। গান রেকর্ডিং করতে এখন পরিচালকরা ছোটেন বোম্বাই-এ, নাহলে নাকি রেকর্ডিং এর মান উন্নত হয় না। কিন্তু তখন রবিশংকর, আলিআকবর খাঁ—এ কানন, এদের বাজনা, গান এখানেই রেকর্ডিং করা হত। পথের পাঁচালী, অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, হারানো সুর, সপ্তপদী—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সব গান, বড় বড় পরিচালকদের সব ছবি, নিউথিয়েটার্সের ছবির সব গান, কে—এল সায়গল, পঙ্কজবাবুদের গানও এই কলকাতাতেই রেকর্ড করা হত এবং সে সব রেকর্ডিংও হত বিশ্বমানের। সে সব ছবি তখনকার সর্বভারতীয় বাজারে চলত।

নিউথিয়েটার্স স্টুডিও তে যেতাম বিনয়দার কাছে, ওখানেই দেখেছিলাম শৈলজানন্দকে, দেখেছিলাম একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বীরেন সরকার মশায়কে। ছায়া সবুজ সুন্দর সাজানো স্টুডিও, ঢুকে বাগানে একটি সুন্দর খড়ের ছাউনি দেওয়া গোলঘর, পিছনে একটা পুকুর, শীতের শেষ, বসন্তের শুরু।

দেওদার গাছে এসেছে নতুন পাতার ঝলমলানি, আমের বোলের গন্ধে মিশেছে কাঠাল ফুলের মদির সুবাস, ছায়াঘন পরিবেশে ওই খড়ের গোলঘরটা দেখে দাঁড়ালাম। বিনয়দা বলেন,—ওটা রবীন্দ্রনাথের জন্য তৈরি হয়েছিল। তিনিও এই স্টুডিওতে একটা ছবি করেছিলেন সেই সময় এই ঘরেই বসতেন।

এই স্টুডিও কে মনে হল যেন একটি তীর্থ।

নিউ থিয়েটার্স -এর এইটা ছিল এক নম্বর স্টুডিও। এখানে তখন তিনটে ফ্লোর, ওদিকে প্রসেসিং ল্যাবরটারী, ওখানে ফিল্মকে ডিভিশন, প্রিন্ট করা হতো, ওর পিছনে রাস্তার ওদিকে বিশাল কম্পাউন্ডঘেরা মিউজিক ডিপার্টমেন্ট। এ ছাড়াও প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে ছিল এদের আর একটা স্টুডিও। সুন্দর একটা একতলা বাড়ি, সামনে গাছগাছালি দিয়ে সাজানো বাগান, এখানেও ছিল দুটো স্পটিং ফ্লোর। এটাকে বলা হতো নিউ থিয়েটার্স দু'নম্বর স্টুডিও।

এর একটা আগে আজ যেখানে নবীনা সিনেমা—তার পিছনে প্রচুর জায়গা—বাগান নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'ভারতলক্ষ্মী স্টুডিও'। এর কর্ণধার ছিলেন শ্রীবাবুলাল চৌঘানী। ভারতলক্ষ্মী স্টুডিও প্রচুর ভালো ছবি করেছিল। গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি পরিচালকরা এখানে দুর্গাদাসবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতিদের নিয়ে অনেক নামী ছবি করেছিলেন।

প্রফুল্ল রায় ছিলেন খুবই রাশভারি ধরনের মানুষ। তখনও ছবির জগতে বহু ছেলে ছোকরার দল হিরো হবার জন্য স্টুডিওর আশেপাশে ঘুরত। তখন স্টুডিওতে আজকের মত সকলের অবারিত দ্বার—পাইকাবী আড্ডা—হাটের পরিবেশ ছিল না। স্টুডিওতে প্রবেশ করার উপায় এত সহজ ছিল না। তবু কোন উৎসাহী তরুণ স্টুডিওতে ঢুকে প্রফুল্লবাবুর সামনে হাজির হয়ে হিরো সাজার কথা বললে তিনি গর্জন করে বলতেন—পাশের দোকানের আয়নায় নিজের থোবড়া খানা ভালো করে আর একবার দেখে তবে এসো, যাও তো।

ওর ধমকের চোটে হবু হিরোর দল পালাতে পথ পেতো না। তখনকার দিনের বাঘা বাঘা অভিনেতারাও প্রফুল্লবাবুকে সমীহ করে চলতেন আর প্রযোজক স্বয়ং বাবুলালজী নিরীহ ভদ্রলোক, তিনিও প্রফুল্ল বাবুকে সমীহ করতেন, কারণ মতানৈক্য নাহলে প্রফুল্লবাবুর তখন রাগ দেহি মূর্তিকে সবাই এড়িয়ে চলতেন। প্রফুল্লবাবু 'ঠিকাদার' ছবি আজও স্মরণীয়। দুর্গাদাস ছিলেন সেদিন উত্তমকুমারের মত জনপ্রিয় শিল্পী।

এই দুর্গাদাস ছিলেন তৎকালীন কোন জমিদার বংশধর, ছিল দরিয়া ধরনের মানুষ, তেমনি খেয়ালী, থিয়েটারের একনম্বর অভিনেতা। দুর্গাদাসবাবু শুনলেন মঞ্চমালিক নাকি কলাকুশলী, মঞ্চকর্মীদের মাইনে ঠিকমত দিচ্ছেন না। অথচ তার অভিনীত নাটক তখন হাউস ফুল চলেছে।

তিনি হঠাৎ একদিন বসে গেলেন, এদিকে হাউসফুল মঞ্চমালিক ঘোষণা করলেন—দুর্গাদাসবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আজ অভিনয় বন্ধ। মঞ্চের

বাইরে, লবিতে গোলমাল।

হঠাৎ দেখা যায় রাস্তার ওদিকে গাড়িতে করে দুর্গাদাসবাবু এসে হাজির। ভিড়ে ভিড়।

তিনিই বলেন—অসুস্থ আমি নই, ওসব বাজে কথা। মঞ্চ মালিক স্টাফদের মাইনে দেননি, তাই আমি অভিনয় করছি না। ওদের মাইনে মিটিয়ে দিলেই আমি মঞ্চে নামব।

বলাবাহুল্য মালিক সেই দিনই কর্মীদের সব প্রাপ্য মিটিয়ে দেন, অভিনয়ও হয়।

তখন যুদ্ধের বাজার।

ব্লাকমাউন্ট, ট্রেখত—বাফেল দয়ালের যুগ, তবু ছবির কাজ চলছে। অবশ্য এদেশে ফিল্ম তৈরি হত না (স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও এখনও হয় না বল্লেই চলে) বাইরের থেকে কোডাক, গ্যাভা, ফুজি এসব কোম্পানির ফিল্ম আসত। তাই কোটা নির্ধারিত করা হত এক একটা ফিল্মের নামে।

সেইসময় পরিচালক হেমেন গুপ্ত একটা হিন্দি বাংলা ছবি 'দ্বন্দ্ব' এর কাজ শুরু করেছিলেন। বাংলা ছবি 'দ্বন্দ্ব' তৈরি হয়ে গেছে। তেমন চলেনি তাই হিন্দিতে ওই নামে অন্য গল্প করতে চান।

তখন আমি এই লাইনে যাতায়াত করি। লেখাও বের হচ্ছে সব পত্র-পত্রিকাতে। দেশ, ভারতবর্ষে তখন লিখছি। 'প্রবাসী' তখনকার নামী অভিজাত পত্রিকা। আপার সার্কুলার রোডে নিজস্ব বাড়ি, কিছুটা ইংরেজ আমলের ছোট ক্যাসেল টাইপের। রবীন্দ্রনাথ লিখতেন 'প্রবাসী' তে নিয়মিত। এদের ইংরেজি পত্রিকা ছিল মর্ডান টাইমস্ আর হিন্দি পত্রিকা ছিল 'বিশাল ভারত'।

এই পত্রিকাতে লেখা ছিল সম্মানের ব্যাপার। তখন তরতাজা তরুণ। একটি ছোটগল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে একদিন গেলাম এদের দপ্তরে। দোতলার বিশাল ঘরে টেবিলে কাগজের স্তূপ নিয়ে কাজ করছেন গম্ভীর ধরনের এক ব্যক্তি। ইয়া গোঁফ আর চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। ভীতকণ্ঠে বলি একটা ছোটগল্প দিতে এসেছিলাম।

ভদ্রলোক আমার দিকে গম্ভীর ভাবে চেয়ে আপাদমস্তকে সন্ধানী দৃষ্টি নিয়োগ করে বলেন—তরুণদের লেখা তো আমরা ছাপি না। প্রবীণদের লেখাই ছাপা হয়। এখানে তার কথাই হতাশই হলাম। ফিরে আসছি হঠাৎ দরজার কাছে এসে ঘাড়ে কি দুষ্টু বুদ্ধি চাপল জানি না। ফিরে অনুমতি চাইলাম তার—একটা কথা বলব? —বলো!

মশাই—তাহলে দশ-পনেরো বছর পর পত্রিকা তুলে দেবেন?

—মানে, ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে চাইলেন। আমি সবিনয়ে জানাই।

—আজ যারা প্রবীণ, দশ পনেরো বছর পর তারাতো সব চলে যাবেন তখন কাদের লেখা দিয়ে পত্রিকা চালাবেন?

ভদ্রলোক এক মিনিট আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলেন—ঠিক আছে।

লেখাটা রেখে যাও।

সেই লেখা তিনি পত্রস্থ করেছিলেন 'প্রবাসী'তে। পরবর্তীকালে নিয়মিত লিখতাম সেখানেও। সেই ভদ্রলোক ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বাগল। তখন সুপারিশ, পিঠ চুলকানি নয়-লেখার মানই ছিল বিচার্য।

দেশ পত্রিকায় লিখছি।

তখন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসেছি। সহজ সরল স্নেহ প্রবণ এক শিক্ষক। সাহিত্যের পাঠ আমি তার কাছেই প্রথম নিয়েছিলাম। দেশ পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হল 'আবর্তন'। বিভূতিবাবু তখন কোলাঘাটে ওর শ্বশুরমশায়ের চাকরিস্থল, সেখান থেকে ঘাটশিলা গেছেন। সেবার ৪২-এর সাংঘাতিক ঝড় দুর্যোগ গেছে, তিনি ওই দুর্যোগের সময় কোলাঘাটে থেকে ওই তাণ্ডব দেখে ঘাটশিলায় গেছেন। ঘাটশিলা থেকে তিনি চিঠি দিয়ে জানালেন আমার গল্প তিনি পড়েছেন। আমি যে লেখালেখি করার চেষ্টা করি তখনও জানলেন।

তিনি তখন স্থায়ীভাবে রয়েছেন তার গ্রামের বাড়ি গোপালনগর স্টেশনের কাছে চাল্‌কে বারাকপুরের বাড়িতে, ঘাটশিলার বাড়িতে যাতায়াত করেন। সেখানে থাকেন তার ছোট ভাই ডাক্তার নুটুগোপালবাবু।

কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে আমার মেসেই তাকে আনতাম, রাত্রিবাসও করতেন। তখন আমি থাকি মেডিক্যাল কলেজের সামনে আরপুলি লেনে। একতলায় আমার একটা সিঙ্গল রুম। বিভূতিবাবু এলে তাকে ওই ঘর ছেড়ে সেই রাতে আমি অন্য কোনঘরে রাত কাটাতাম।

বিভূতিবাবু দশটার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়তেন। উঠতেন ভোর চারটেতেই। এখানেও তার ব্যতিক্রম হত না। দেশ-এ তখন দুটো গল্প বের হয়েছে। বিভূতিবাবু বললেন—এরা লেখার জন্য দখিনা দেয় তুমি গিয়ে বলো। খবর নির্দেশ পেয়ে সেদিন আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে গেলাম। আজকের বড়বাজারেব ফলপট্টি যেখানে সেখানে বর্মন স্ট্রিট, সেই বর্মন স্ট্রিটে একটা লজঝর বাড়ি। একদিকে একটা গেট, নীচে কাগজের সর্টিং অফিস—দোতলায় দেশ পত্রিকার অফিস। তখন সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিম সেন, লেখার ব্যাপারে দেখাশোনা করতেন সাগরময় ঘোষ, ওদিকে বসতেন লেখক সুবোধ ঘোষ, পরে এসেছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মনও।

আজও মনে পড়ে এতবড় লেখক সুবোধদাকে। সৌম্যদর্শন, সদা প্রফুল্ল এক ব্যক্তিত্ব, আর অদ্বৈতবাবু নিরীহ শান্ত একটি মানুষ। একটি কালজয়ী উপন্যাসই তিনি রেখে গেছেন—তিতাস একটি নদীর নাম।

দেশ অফিসে সাগরময়বাবু ছিলেন জহুরি। লেখা দেখেই তিনি বুঝতে পারতেন তার সম্ভাবনা। এই সাগরময়বাবুই আমাকে উৎসাহিত করতেন। একা আমাকেই নয়—আমার সমসাময়িক বহু লেখককেই তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন-আজ তারা সাহিত্যজগতে সুপরিচিত।

লেখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও হল। প্রথম সম্মান দক্ষিণা পেলাম সাত টাকা, সেটা বিয়াল্লিশ সাল। ওই টাকার মূল্য তখন অনেক, দুমণ চাল হত তাতে।

বঙ্গশ্রী, দেশ, প্রবাসী, ভারতবর্ষে লিখছি।

দু'একটা উপন্যাসও বের হয়েছে। সেদিন হেমেন গুপ্ত মশাই জানালেন যে তিনি হিন্দিতে একটা ছবি করবেন তার গল্পের নাম হবে 'তকবার'। সেই নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটা গল্প লিখতে হবে।

এই প্রথম সিনেমার জন্য গল্প লিখতে হবে।

তার আগে থেকেই একটা নেশা আমার ছিল—সিনেমা দেখা। কলেজ হোস্টেলে থাকতে একদিনে ম্যাটিনি আর ইভনিং শো-তে দুটো সিনেমাও কখনও দেখেছি।

কলকাতায় এসে বিশেষ করে ইংরেজি সিনেমা বেশি দেখতাম আর তখন এসপ্ল্যানেডে আমেরিকান সিনেমার ম্যাগাজিনও আসতো অনেক। একটা ম্যাগাজিনে দেখতাম ৪/৫ টা করে তখনকার জনপ্রিয় সিনেমার গল্পগুলো ছাপা হত গল্পের আকারে। সেইসব ম্যাগাজিন সংগ্রহ করতাম আর সেইসব ছবি এলে দেখতাম। এছাড়াও জনপ্রিয় ফিল্মের পুরো চিত্রনাট্য সংগ্রহও পাওয়া যেত। এ ছাড়া জেন অস্টেন, পামেলা, গন উইথ দি উইন্ড, গুডবাই মির বিপস, র‍্যানডম হার্ভেস্ট, হাউ গ্রিন ওয়াজ মাই ভ্যালি, রেইন বো এ্যানা এন্ড কিং অব শ্যাম প্রভৃতি বহু বিখ্যাত মূল উপন্যাস তখন এখানে পকেট বই-এর আকারেও এসেছিল সৈন্যদের জন্য। সেসবও সংগ্রহ করতাম—পড়ছি, আবার ছবিও দেখেছি। উপন্যাস থেকে কি ভাবে ছবির ভাষাতে আনা হয়েছে সেটাও প্রত্যক্ষ করেছি। এইভাবে নিজে নিজেই উপন্যাসের ভাষা আর সেলুলয়েডের ভাষা দুটোকেই বোঝার চেষ্টা করেছি।

তাই হেমেনবাবুর প্রস্তাবটা সহজেই গ্রহণ করলাম। গল্প লেখার কাজে হাত দিলাম। নিটোল একটি পারিবারিক গল্প। গ্রাম আমার চেনা, তাই গ্রাম্য পরিবেশেই সেই গল্প লেখা হল হেমেনবাবু তখন থাকেন সাউদার্ন এভেন্যুর কাছে বম্পাস রো-তে।

তার পাশের ফ্ল্যাটেই থাকেন আর এক চিত্রপরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত। তিনিও বিশিষ্ট ভদ্রলোক। যাতায়াতের ফলে তার সঙ্গেও পরিচয় হলো।

. হেমেনবাবু নিজে ছিলেন বিপ্লবী। ঢাকার বিপ্লবীদের সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। সেই অগ্নিযুগের অলিখিত অনেক কাহিনীই শুনেছি তার মুখে। তিনি ধরা পড়েন কলকাতায় বৌবাজার অঞ্চলে। তারপর কারাবাস।

পরে এলেন চিত্রজগতে। তকরার ছবির পর বিপ্লবীদের নিয়ে বোধ হয় দুটি ছবি করেছিলেন। ভুলি নাই আর বিয়াল্লিশ। বিয়াল্লিশ ছবিটি সারা বাংলায় সাড়া এনেছিল।

তখন কলকাতাতেও হিন্দি ছবি তৈরি করত নিউ থিয়েটার্সে, দু এক অন্য প্রযোজকও। তাই এখানে হিন্দি 'তকরার'ও তৈরি হল। হিরো খুজে বের করলেন

হেমেনবাবু ইফতিকার আমেদ নামের একটি তরুণকে। ইফতিকার তখন মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্সে চাকরি নিয়ে এসেছে কলকাতায়। এসপ্ল্যানেড ইস্ট এ তার অফিস। তাকেই প্রথম আনলেন হেমেনবাবু, পরে ইফতিকার আমেদ বোম্বাই-এ গিয়ে বহু হিন্দি ফিলিম বিশেষ করে পুলিশ অফিসারের রোল করেছে শেষ জীবন অবধি। অশোককুমারের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন ইফতিকার। পরে বোম্বাই চিত্রজগতে গিয়ে আমিও হারানো বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছিলাম।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও তখন জমাট। জে.ডি ইরানী তখন ফুল ফর্মে। বেটেখাটো গাট্টা গোট্টা চেহারা তখন 'নবাব' ছিলেন হিন্দির নামী অভিনেতা। নবাব, ইফতিকার, মলিনা দেবী, (হিন্দি ভালো বলতেন) রণজিৎ রায় আরও অনেককে নিয়ে তকরার শেষ হল।

আমি অবশ্য সিনেমা নিয়ে বেশি তখন মাতিনি। ওই কাহিনীর জন্য পেয়েছিলাম দুশো টাকা। তাতেই খুশি। লেখার উপর নির্ভর করে দিন চলেনা। সরকারি চাকরিতে ভাল ভাতের সমস্যা মিটে যায়, লেখালেখি পড়াশোনা নিয়েই থাকি।

এই সময় আমার অফিসে সহকর্মী হিসাবে ছিল মোহিনী চৌধুরী। পরে সে হয়েছিল প্রখ্যাত গীতিকার। তখন আমি আর মোহিনী একই বিভাগে কাজ করি। সুদর্শন একটি তরুণ কবি কবি চেহারা। ওদের বাড়ি বেহালার ট্রাম ডিপো ছাড়িয়ে আরও ভিতরে ইউনিক পার্কে।

আমি তো পুরা গাঁইয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়ার গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে ফিরে সবে কলকাতা মহানগরীতে এসেছি চাকরি নিয়ে, থাকি মধ্য কলকাতার মেসে।

মেসে যারা থাকে তাদের জীবন যাত্রার ধরনটাই আলাদা।

তারা না ঘরকা, না ঘাটকা।

তারা এই শহরে থাকে সাধারণত থাকে সোমবার দুপুর থেকে শনিবার একবেলা। বিকালে পড়ি-কি-মরি করে ট্রেন ধরে বাড়ি ছুটবে। ফিরবে সোমবার ভোরের ট্রেন ধরে। অফিস করে সন্ধ্যায় মেসে ফিরে আবার শনিবারের পথ চেয়ে থাকে। বাকি কদিন অফিস আর মেস। এছাড়া তাদের জগতে আর কিছুই নাই।

কলকাতার বাসিন্দাও ঠিক নয়, গ্রামের মানুষও নয়।

আজীবন ওইভাবে কাটিয়ে শেষ জীবনে গ্রামে ফিরে যায়। এই পরিবেশে এই মেস কালচারে থেকে আমি যেন একঘরে হয়ে গেছি। কলকাতার জীবনের মূল স্রোত থেকে এদের মত আমি বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। তাই এই লেখাপড়ার জগৎ, বইপাড়ায় সাহিত্যিক, প্রকাশক, কাগজের অফিসেও যাতায়াত করি। এই বৃহত্তর জীবন স্রোতের সামিল হতে চাই। তাই মোহিনীর সঙ্গে মেশার মধ্যে একটা আনন্দ পাই উৎসাহ অনুপ্রেরণা পাই।

আমি পত্র-পত্রিকাতে লিখছি, মোহিনী গান, কবিতা লেখে। মূলত তাই দুজনের মানসিকতার একটা মেলবন্ধনই ঘটে। দুজনেই একই পরিবেশে কাজ করি। পোস্টাপিসের কাজ। পাহাড় প্রমাণ চিঠি-প্যাকেট আসে, সেসবের সটিং—বিলির

ব্যবস্থা করতে হয়। প্রায় দেড়শো পিওন দুটো সিফ্‌টে এসব ডিলি করে। রেজেস্ট্রি, মনিঅর্ডার, ওসব হয় অন্য বিভাগ থেকে।

হৈ চৈ টাইমলি ডেলিভারির ব্যবস্থা করা সে যেন হাটের ব্যাপার। এই পরিবেশ ঠিক মেনে নিতে পারি না। মোহিনীও বলে এসব ভালো লাগে না, —কিন্তু উপায় কই। বেঁচে থাকার জন্যই এসব করতে হবে, পাশাপাশি লেখার কাজও চালাতে হবে, থামলে চলবে না।

মোহিনীর কবিমন এতে ঠিক সায় দেয় না। সে চায় এই জীবন থেকে মুক্তি পেতে।

তখন বাংলা ছায়াছবির জগতে বিদ্যান নামকরা গীতকার অনেকেই রয়েছেন। অজয় ভট্টাচার্য (কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাই), শৈলেন রায়, প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, হিমাংশু রায় আরও অনেকে। তাদের রচিত গান তখন প্রতিটি ছবির সম্পদ আর তা ফিরত লোকের মুখে মুখে। মোহিনী বলত—এদের মধ্যে নিজের ঠাঁই করে নিতে হবে, তোমাকেও ঠাঁই করে নিতে হবে একালের লেখকদের মধ্যে।

তখন বাংলা সাহিত্যে রয়েছেন দিকপাল সাহিত্যস্রষ্টারা। তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, গজেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, সুমথ ঘোষ প্রমুখ। উঠে আসছেন নারায়ণ গাঙ্গুলী, বিমল মিত্র প্রমুখ।

'বলি,—এদের সঙ্গে তুলনা, ছাড়ো তো!'

মোহিনী বলে মানুষকে স্বপ্ন দেখতে হয়, নাহলে সে উপরে উঠতে পারে না, পা ফেলে চলো, ঠিকমত চলতে পারলে পাহাড়ের উপরেও উঠা যায়।

ছুটির দিন ওর বাড়িতে যাচ্ছি, তখন অনুমান ১৯৪৪ সাল হবে। প্রথম সেদিন ওর নির্দেশমত এক নির্জন দুপুরে বেহালা ট্রাম ডিপোতে নেমে ডান হাতে ব্রাহ্মসমাজ রোড ধরে এগোচ্ছি, পাশেই এক বিরাট বাগান, জঙ্গলই বলা চলে, প্রাচীন মহীরূহর ভিড়, তলেও ঘন জঙ্গল, কাঁচা ইট মাটির পায়ে চলা পথ, ঘন বাঁশ বনের বুক চিরে গেছে, জনমানব নেই—দুপুরেও শুনশান, আমার প্রবেশপথও সীমিত।

এ যেন মঙ্গোপার্কের দেশ, এর মধ্যে ইউনিক পার্ক কোথায়? আজকের এই অঞ্চলের বাসিন্দারা এই বর্ণনা শুনে হয়তো বিশ্বাসই করবেন না, কিন্তু এই ছিল সেদিন এই অঞ্চলের অবস্থা। এর মধ্যে খুঁজে বের করলাম কোন মতে ইউনিক পার্ককে।

এই অঞ্চলটা তখন সাফসুতরো, কিছু ঘরবাড়ি ও গড়ে উঠেছে, একটা বড় পুকুরকেও ওরা সংস্কার করিয়েছেন। মোহিনীর ইউনিক পার্কের বাড়িতে ক্রমশ একটা আড্ডা গড়ে উঠল। আর ছুটি ছাটার দিনটা ওখানেই কাটত—ওর বড় বৌদির হাতের রান্নার আকর্ষণই মেসের ঘ্যাঁট আর জালা কোল ছেড়ে দুপুর ভোর ওখানেই আড্ডা জমত। দু'চার জন সাহিত্যপ্রেমী, কবিও জুটে গেল, জুটল অমল ঘোষ হাজরা, সে তখন আর. জি. কর. মেডিক্যালের ছাত্র। এলো স্বরাজ বোস, এখানেই পরিচয়

হয়েছিল চিত্রাভিনেতা গোবিন্দ ভট্টাচার্যের সঙ্গে, তিনি পরিচিত ছিলেন অভি ভট্টাচার্য রূপে। অবশ্য তখনও অভি ভট্টাচার্য হননি।

তকরার ছবি শেষ হয়ে গেল, মুক্তিও পেল। তখন ছবির মুক্তির সময় অভিনেতা অভিনেত্রী, কলাকুশলীদের হলে আমন্ত্রণ করে একটা বিশেষ প্রদর্শনী করা হত। আমিও গেলাম, জীবনে প্রথম ছায়াছবিতে আমার কাহিনীর চিত্ররূপ দেখানো হচ্ছে। অনেক আশা নিরাশার দোলা মনে। পর্দায় নাম পড়েছে, সব নাম চলে গেল, কিন্তু আমার নাম আর এলো না। দেখলাম কাহিনীকার হিসাবে আমার নাম নাই। অথচ আমার লেখা কাহিনী, সেই চরিত্র সেই ঘটনা সংস্থাপন সবই রয়েছে।

পরে আমাকে বলা হল—এটা একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। এটা তো সেই বাংলার হিন্দিরূপ, তাই সেই নামই রাখতে হয়েছে, কিছু মনে করবেন না।

বুঝলাম ফিল্মলাইনে অনেক কিছুই হয়, আর কোন কিছুতেই কিছু মনে করতে নেই। এখানে টিকে থাকতে গেলে ধরিত্রীর মত সর্বংসহা হতে হবে।

মোহিনীও সবই শুনেছে, সেও সান্ত্বনা দেয়—ছাড়ো ওসব কথা। কলমের কালি তো ফুরোয়নি। লিখে চলো, একদিন না একদিন পথ ঠিক হবেই। মোহিনীও ফিল্মলাইনের গান লেখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এর মধ্যে গ্রামোফোন কোম্পানীতেও যাতায়াত শুরু করেছে গানের খাতা নিয়ে। মোহিনীর হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। খুবই সুন্দর, মনোহারী হাতের লেখা। গান কবিতাও লিখত ভালোই। তার কিছু গান গ্রামোফোন কোম্পানির তদানীন্তন সঙ্গীত বিভাগের অন্যতম কর্তা হেমবাবুরও পছন্দ হলো। তখনও ক্যাসেট, টেপ এর প্রচলন তত হয়নি। গ্রামোফোন কোম্পানি ডিস্ক রেকর্ডেই সে সব গান-এর প্রচার করতেন।

আমার লেখার কাজ ও থেমে নাই তখনকার দিনের অন্যতম বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। সেখান থেকেও আমার কয়েকটা উপন্যাস বের হয়েছে, সেগুলো নামও করেছে।

সিনেমা লাইনের কথা ভাবি, কিন্তু ভয়ও হয়।

তখন আমি মেস ছেড়ে বেলেঘাটায় থাকি, তখন বেলেঘাটায় সি-আই-টি রোড হয়নি, ওদিকে শুধু বড় বড় বস্তি, জলা, সল্টলেক তখন জলাভূমি, আর আজ যেখানে হয়েছে মেট্রোপলিটান বাইপাস—যেটা ছিল একটা খাল, কলকাতার পূর্বসীমা এই খালটা এসে মিশেছিল শ্যামবাজারের খালে। নৌকায় পারাপার হয়ে ওদিকে ভেড়ি আর ভেড়ি, ভেড়ির লাগোয়া দু'চার ঘর বসতি।

সেই খাল আজ রাস্তা আর বিস্তীর্ণ ভেড়ি বুজিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের সল্টলেক সিটি।

বেলেঘাটায় তখন আমাদের একটা ক্লাব ছিল, নবমিলন ক্লাব। এই অঞ্চলে অতীতে কবি নজরুল ইসলাম কিছুদিন ছিলেন বলে শুনেছি। কিছুটা বাম রাজনীতি

ঘেঁষা ক্লাব, তখন ছিল সি. পি. আই। এই ক্লাবের একটু দূরেই থাকত আজকের ফুলবাগানের কাছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, কবি অরুণাচল বসু ;আর বেলেঘাটা মেন রোডে থাকত শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। দরাজ দিল হৈ চৈ করা তরুণ। যেমন গলার জোর তেমনি জোর তুলির টানেও।

সুকান্তকে ও ছোট ভাই এর মত স্নেহ করত। এই নবমিলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন মোহন দা, মোহন গাঙ্গুলী। শুড়া থার্ডলেপ অধুনা অবিনাশ শাস্ত্রী রোডে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে পুরোনো বাড়ি। আম-জাম-নারকেল গাছে ঘেরা ফাঁকা জায়গা। সেখানেই গড়ে উঠেছিল ওই ক্লাব, পাঠাগার, সুকান্তও সেখানে আসত—মুখচোরা লাজুক একটি তরুণ, পরে অসুস্থ হয় তখন যেতে হয় তাকে যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে।

শিল্পী দেবব্রত খেয়ালী এক শিল্পী। ছবি আঁকে নিজের রীতিতে আর তার ছবিতে সিগনেচার থাকত 'দে' বলিষ্ঠ একটি টানে তার শিল্পীসত্তার প্রতিবাদীরূপ ফুটে উঠত।

দেবু ছাড়া নারকেলডাঙ্গা রোড থেকে আসত সত্যেন চাটুয্যে, সত্যেন তখন ফিল্মে সাউন্ড রেকর্ডিং শুরু করেছে, দক্ষিণে টালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ ছাড়াও তখন কলকাতার মধ্যে পার্কসার্কাস অঞ্চলে ছিল রূপশ্রী স্টুডিও, মধ্য কলকাতায় নারকেলডাঙা অঞ্চলে ছিল অরোরা স্টুডিও, সিঁথির মোড়ে ছিল এম-পি স্টুডিও, আনাকর স্টাটিকটিক্যাসি ইনপিটুউটে দিন নারাং স্টুডিও আর এড়েদায় ছিল সুন্দর গ্রামীণ পরিবেশে ইষ্টার্ণ টকিজ স্টুডিও। সবগুলোতেই কমবেশি কাজ হত। এত স্টুডিওর সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় তখন বাংলা ফিল্মের ব্যবসা ভালোই ছিল।

এদের মধ্যে এম. পি. প্রডাকশনের সিঁথি মোড়ের এম-পি স্টুডিও ছিল জমজমাট। তখন এক ঝাঁক তরুণ কলাকুশলী এখানে কাজ করতেন—তাদের সকলেই পরবর্তীকালে ফিল্মজগতে সুনাম অর্জন করেছিল। এখানে দেবু কিছু ছবিতে আর্ট ডিরেক্টর ছিল, ছিল শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, ক্যামেরায় রামানন্দ সেন—আরও অনেকে।

অগ্রদূত গোষ্ঠীর অধিকাংশ ছবিই উত্তমবাবু অন্যদের নিয়ে তা তৈরি হত এখানেই। মুরলীধর প্রডাকশনের সব ছবিই এখানে হয়েছে। তখন শ্যামবাজার থেকে প্রাইভেট বাসই চলতো সিঁথির মোড় অবধি, ভাড়া ছিল চার পয়সা।

সত্যেন চ্যাটার্জী, দেবব্রত মুখুয্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে এম-পি-স্টুডিওতে আসতাম। বি-টি রোড তখন ফাঁকা, সিঁথির মোড়ও নির্জন। একটা অশত্থ গাছ ছিল, সেখানে বাস দাঁড়াতো। স্টুডিওতে ঢুকে বাঁ দিকে একটা পুকুর। ডাইনে অফিসঘর, তার পর বাগান, দুটো ফ্লোর, একটা বড় অন্যটা কিছু ছোট। ওদিকে কলা বাগান, পাশে চালা ঘরে ক্যানটিন, এদিকে কিছু বাগান, আমগাছ আর পরিচালকদের বসার ঘর। গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ওখানে বসতেন। অগ্রদূত গোষ্ঠীও ওখানে ছবি করেন।

গুণময় বাবু তখনকার দিনে পরিচিত পরিচালক। অনেক বক্সঅফিস হিট ছবি করেছেন। দেবুকেও ভালবাসতেন। গুণময়বাবুর সহকারী পরিচালক ছিলেন পঙ্কজ দত্ত, পরবর্তীকালে পঙ্কজবাবু দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ছিলেন খুবই বোদ্ধা চিত্রসমালোচক।

তখনও দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছবির সমালোচনা করা হত। সত্যজিৎ বাবুর পথের পাঁচালী ছবি মুক্তির পাবার পর সেই সময়কার চিত্র সমালোচকবৃন্দ অবশ্যই এই ছবিকে অভিনন্দিত করেছিলেন, কিন্তু অন্তরালে সত্যজিত বাবুর এই মহান শিল্পীকৃতি নিয়ে কিছু গুঞ্জনও উঠেছিল, অনেকেই মনে করেছিলেন সত্যজিৎবাবু দেশের দুঃখ দারিদ্রকে মূলধন করে বিদেশে বাণিজ্য করতে চান। কিন্তু এই পঙ্কজ দত্তই সেই সময়ের 'দেশ' পত্রিকায় একটি স্মরণীয় সমালোচনা লিখেছিলেন—তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন এই মহান শিল্পকৃতি বিশ্বজয় করবে, তার ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হয়নি।

পঙ্কজদা তখন ওই স্টুডিওতে শুধু ছবিই নয়—শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে ওখানের আড্ডা জমে ওঠে, উত্তমকুমার তখনও উত্তমকুমার হয়ে ওঠেননি। তার সুটিং-এর অবসর থাকলে তিনিও এসে যোগ দিতেন। তিনি ছিলেন মৃদুভাষী মধুর গলা, হাসি ছিল আকাশ ফাটানো।

ওই পুকুরে একটা নৌকাও ছিল, শুটিং-এ লাগত, মাঝে মাঝে নৌকাতেই বিহার হতো। কুমার মিত্র নামে একজন বয়স্ক কমিক অভিনেতা ছিলেন—তিনি কর্পোরেশনের প্লামবিং সেকশনে কাজ করার ফলে উড়িয়া জলকল কর্মীদের কাছে উড়িয়া ভাষাটা শিখেছিলেন। উড়িষ্যাবাসীর ভূমিকার রোলগুলো দারুণ করতেন, ফিটবাবু, পরণে কাঁচি ধুতি গিলেকরা পাঞ্জাবী, পায়ে পামসু চকচকে, হাতে ছড়ি। প্রায়ই স্টুডিওতে আসতেন।

সত্যেন ছিল সাউন্ড রেকর্ডিষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র একবার কোন গান রেকর্ডিং করতে এলে সত্যেন একটা পিস নিগেটিভে তার উদাত্ত গলার, যেতে যেতে একলা পথে নিভেছে মোর বাতি গানটা রেকর্ড করেছিল এই গানটা মাঝে মাঝে শুনতাম ওই গান যেন আমাদের অনুপ্রাণিত করতো।

কুমার বাবু এলে কোন কোন দিন সত্যেন, দেবুর দল কুমারদাকে নিয়ে বৈকালের দিকে নৌকায় উঠে মাঝপুকুরে গিয়ে আর তীরের দিকে ফিরতো না। কুমার বাবুর একটু পানাভ্যাস ছিল, রোজ সন্ধ্যায় তাঁর দু'একগ্লাস পানীয় চাই। তখন মদের দোকান সূর্যাস্তের পরেই বন্ধ হয়ে যেত। কুমারবাবু যখন মাঝ পুকুরে সূর্য অস্তাচলমুখী। কুমারবাবুর অনুনয়, বিনয়, তারপর কাতর প্রার্থনা শুরু হত—ওরে নামিয়ে দে, রেশনের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে, সূর্যি ডুবে যাচ্ছে—নামা!

এরাও নির্বিকার, কুমার বাবু জলেই লাফ দেবে, নেশার টান বলে কথা। শেষ এদের জন্য চা সিঙ্গাড়ার বাজেট বরাদ্দ করে কুমারবাবু তীরে এসে সিধে দৌড়

লাগাতেন রেশনের দোকানের দিকে। আমরাও চা-সিঙ্গাড়ার ভাগ অবশ্য পেতাম।

ওদিকে চাকরির জোয়াল টেনে লেখার কাজও চালাচ্ছি। এর মধ্যে মোহিনীর কিছু গানের রেকর্ড বের হয়েছে। গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের একখানা গান যতদূর মনে হয়, 'নাই বা হলো মিলন মোদের' এই জীবনে—গানটা খুব জনপ্রিয় হয়েছে। দু'জনেই দু'জনের পিঠ চাপড়া চাপড়ি করি। আর আমাদের পিঠে চাপড়ায় আমাদের বন্ধু হবু ডাক্তার—অমল ঘোষ হাজারা, তার আর এক চ্যালাও জুটেছে। বেহালার ছেলে অশোক সরকার, বেপরোয়া একটি তরুণ, নিজের স্বপ্নে বিভোর।

এদিকে আমার এখন নতুন আড্ডা জমেছে দেবুদের সঙ্গে। এমনি দিনে আমার একটা গল্প 'সীমন্তিনী' নজরে পড়লো গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনিও দেখেছেন আমাকে দেবুদের দলে স্টুডিওতে আড্ডা মারতে।

তিনিই বললেন—ওটা আমি ছবি করবো, তুমি রাজী? আমার অবস্থা—পাগলার মত, কোন পাগলকে কে শুধিয়েছিস—ভাত খাবি? পা হিসাবী পাগল বলে—হাত ধোবো কোথায়?

অর্থাৎ খাবার পরের কথাই ভাবছে সে, আমিও রাজী।

এক তখন কলকাতায় শুধু কলকাতায় কেন, সারা বাংলা মুলুকে (তখনও দেশ বিভাগ হয়নি) বিষ্ণুপুরের অম্বরী তামাক, অন্যতামাকের, খুব চল ছিল, হুঁকো, গড়গড়ার স্থান নিতে পারেনি বিড়ি, সিগ্রেট, বিষ্ণুপুরী তামাকের সব চেয়ে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন বিষ্ণুপুরের মুখুয্যেরা। তাদেরই কেউ এই ছবির প্রযোজক।

ছবির কাজ শুরু হলো, পঙ্কজ দা তখন ওখানে প্রবীন সহকারী। দেবু, সত্যেনরাও রয়েছে। একদিন গুণময়দা দেখেন পঙ্কজদার জুতোর সেলাই খুলে গেছে, সেটে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। গুণময়বাবু কাজের শেষে পঙ্কজদাকে অফিসে ডেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলেন,

—আজই নতুন জুতো কিনে নিও।

দেবু কাছেই ছিল, বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আজই কিনে দেবো ওকে।

পরদিন সেটে এসেছেন গুণময়বাবু, পঙ্কজদাও।

গুণময়বাবু দেখেন পঙ্কজদার পায়ে সেই পুরোনো জুতোই, তবে চকচকে পালিশ আর মেরামত করা। শুধোন,

জুতো কেনো নি?

পঙ্কজদা ইতি ইতি করে। পরে খবর পাওয়া গেল ওকে নিয়ে বের হয়েছিল দেবু পার্টি। ওরাই কোন মুচিকে দিয়ে পঙ্কজদার সেই জুতো আচ্ছাসে মেরামত করিয়ে বলে দ্যাখ, এ নতুন জুতোর মতই, আর বাকিটাকা ওরাই পানভোজনে ব্যয় করেছে পঙ্কজবাবুর কাছ থেকে নিয়ে।

তখন ইংরেজ শাসনের শেষ যুগ। হেমেন গুপ্ত ছবি করলেন 'বিয়াল্লিশ সাল'

সেই ছবিতে ইংরেজদের অপশাসনের অনেক ঘটনাই ছিল তাই ইংরেজরা ছাড়পত্র দেবে না। শেষ অবধি ছাড়পত্র মিলল আর সেই ছবি ও সাড়া তুললো।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর জনসাধারণের সেদিন প্রচণ্ড সমর্থন ছিল। তাই এক প্রযোজক এগিয়ে এলেন শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র চিত্ররূপ দিতে।

এর অন্যতম পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত ছিলেন হেমেনবাবুর প্রতিবেশী। সেই সুবাদেই আমার সঙ্গে পরিচয়। এই 'পথের দাবী'-তে চিত্রনাট্য লেখার জন্য তিনি আমাকে আনলেন। হাইকোর্ট পাড়ায় সেই প্রযোজকের অন্যসব ব্যবসা। এর আগে তারা প্রমথেশ বড়ুয়াকে দিয়ে 'আমিরী গরিবী' নামে ছবিটি করেছেন। এর পর হাত দিতে চান 'পথের দাবী' ছবিতে। এর দুজন পরিচালক। একজন সতীশবাবু, অন্যজন একটু তরুণ। নাম যতদূর মনে পড়ে দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়। ছেলেটি ইংল্যান্ডে আলেকজান্দার 'কর্ভা'র স্টুডিওতে কাজ করেছে। বাংলা ছায়াছবির জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।

আর চিত্রনাট্য লেখার জন্য এর মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে কমিটি মত করেছেন। সেখানে চেনা মুখের মধ্যে দেখলাম প্রাবন্ধিক নারায়ণ চৌধুরীকেও। বিজ্ঞমানুষ, কিন্তু রসসাহিত্যের জগতের মানুষ তিনি নন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখাতেই তার খ্যাতি। অন্যদের নাম মনে নাই। তবে একজনকে দেখে ভরসা হলো তিনি গীতিকার প্রণব রায়। দীর্ঘদেহী সুরসিক মানুষ।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বহু পঠিত বহু আলোচিত একটি সৃষ্টি। প্রথমে ইংরেজ সরকার এই উপন্যাসকে 'ব্যান' করেছিল, পরে সেই আদেশ তুলে নেওয়া হয়।

এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের চিত্রনাট্য লেখা কঠিন ব্যাপার। কমিটির অন্যরা এনিয়ে মোটেই ভাবিত নন। আমিই প্রণব রায়কে বলি,—কি হবে প্রণবদা? এরা তো তেমন গুরুত্বই দিচ্ছেন না। নিজেরাও হাত লাগাচ্ছেন না।

প্রণবদা ছবির সম্বন্ধে বোঝেন। নিজেও বেশ কিছু ছোট গল্প লিখেছেন দু'একটা ছবির চিত্রনাট্যও করেছেন, পরিচালনাও করেছেন। তিনি বলেন ওটা আমাদেরই করতে হবে। ওরা যেমন আছেন থাকুন, আমরাই হাত লাগাই। সতীশবাবুকে পরে বসতে হবে।

আজ দীর্ঘদিনের ব্যাপার, 'পথের দাবী'র প্রাথমিক চিত্রনাট্যের খসড়া তারপর তার ডেভেলাপমেন্ট করার কাজ শুরু করলাম প্রণবদা আর আমি। সতীশবাবুও বসলেন সঙ্গে , এইভাবে চিত্রনাট্য তৈরি হলো।

তখন বাংলা ছায়াছবির জগতে দেবী মুখোপাধ্যায় একটি জনপ্রিয় নাম। অপূর্ব কণ্ঠস্বর, সুস্বাস্থ্যবান পুরুষ, তাকে করা হলো সব্যসাচী, চন্দ্রাবতী দেবী করেছিলেন সুমিত্রা, আর ভারতীর চরিত্র করেছিলেন সুমিত্রা দেবী। তলোয়ারকরের ভূমিকায় ছিলেন—কমল মিত্র। এই ছবির সুরকার ছিলেন দক্ষিনা মোহন ঠাকুর। সুদর্শন চেহারা। তার বিশেষ অবদান ছিল তার সানাই 'বাদ্যযন্ত্রে'।

পরবর্তীকালে তিনি বোম্বেতে চলে যান, তার ছেলে এখন ফিল্মজগতের নামী রেকর্ডিস্ট।

আর জামাই বোম্বাই প্রবাসী বিশিষ্ট লেখক শচীন ভৌমিক।

এই চিত্রনাট্যে একটা পরীক্ষা করেছিলাম মনে পড়ে। জাহাজঘাটায় সব্যসাচীর প্রথম আসার সময় শরৎবাবুই তার উপন্যাসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রসঙ্গে কয়েকটি ছত্র লিখেছিলেন অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভাষায়।

সাধারণতঃ ছবিতে কোন প্রধান চরিত্রের আবির্ভাবের সময় বিশেষ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সংযোজন করা হয় চরিত্রটার পূর্ণ প্রকাশ ঘটানোর জন্য, এখানে তেমনি কোনও মিউজিক না দিয়ে জাহাজঘাটায় নদীর পটভূমিকায় শরৎবাবুর সেই লাইনগুলোতে বসানো হয়েছিল আর কণ্ঠস্বর দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ ভদ্র, এই বিশেষ পরীক্ষাটা সার্থক ভাবে উৎরে ছিল।

সিনেমার কাহিনীর গতি অবশ্যই করতে হবে। তার জন্য চাই ঘটনা কিন্তু পথের দাবিতে অপূর্বের বিচার, ব্রজেনের ভূমিকার পর ঘটনা সংস্থাপন বেশি নাই। খোদার উপর খোদকারী করার সাধ্য ত আমাদের ছিল না। তাই পথের দাবি ছবির চিত্রনাট্য খুবই সাবধানতার সঙ্গে করতে হয়েছিল। প্রণব রায় মশায়ও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, ফলে সমবেত চেষ্টাতে পথের দাবি ছবি সাফল্য অর্জন করেছিল।

পরবর্তীকালে পথের দাবী অবলম্বনে সব্যসাচী ছবি হয়েছিল, সেখানে মূল ভূমিকাতে ছিলেন উত্তম কুমার। কিন্তু পথের দাবী উপন্যাসকে যথাযথ ভাবে সেখানে অনুসরণ করা হয়নি বলেই আমার মনে হয়েছিল।

গুণময়বাবু সীমন্তিনী ছবি শুরু করেছেন। তখন মেয়েদের জন্যই ছবি তৈরি হত, প্রচলন ছিল ঘরের মেয়েরা ছবি দেখে ভালো বলে তবেই সেই ছবি চলবে।

যে যুগের কথা বলছি তখন টি-ভির প্রচলন হয়নি, হিন্দী ছবিও তখন বাংলা ছবির ঘাড়ে চেপে বসতে পারেনি। শরৎ বাবুর গল্পই ছিল 'হটকেক'। এর মধ্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা স্বয়ংসিদ্ধা, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, প্রেমেন মিত্র দের সাহিত্য নির্ভর ছবি বাজার মাৎ করছে। বাঙালি তখন সাহিত্যনির্ভর, পরিচ্ছন্ন ছবি দেখতে অভ্যস্ত।

তখন জহর গাঙ্গুলী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাসবাবু, যোগেশ চৌধুরী, মিহির ভট্টাচার্য,. দেবী মুখোপাধ্যায়দের যুগ। আসতেন বিশ্বজিতও। আর ছবি তৈরির খরচও কম। .

কলাকুশলীদের মহিমাও ছিল কম। সেই টাকাতেই তারা এস এস ইউনিটে ৫/৮ ঘণ্টা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন। একজন শিল্পী তিনি নায়কই হোন তবু একটা দিন যাকে দিতেন, সেই পুরোদিন ওই টাকাতে তাঁরই কাজ করতেন। একটা ছবির চরিত্রই সেদিন ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। এটা উত্তমকুমারকেও করতে দেখেছি। সেদিন তার ভাবনা কেন্দ্রীভূত থাকতো সেই চরিত্রকে ঘিরে। তাই সামগ্রিকভাবে অভিনয়ের মান

ছিল উন্নত। চরিত্রগুলো বর্ণ রূপ নিয়ে প্রতিভাত হত।

সহকারী পরিচালকরাও একই ইউনিটের কর্মী ছিলেন। ফলে গল্প, চরিত্রগুলোর ঘটনার পরম্পরা তাদের মাথায় থাকত। শিল্পীদের সহজেই তা বুঝিয়ে পরের কাজ শুরু করাতে পারতেন। শিল্পীর মাথাতেও চরিত্রটার লাইট শেডগুলো ফুটে উঠতো।

এখন একই হিরো দশটার জায়গায় এগারোটা, বারোটায় সেটে এসে বললেন—আমাকে লাঞ্চের পরই আজ ছেড়ে দিতে হবে। পরিচালক প্রযোজকের করার কিছুই নাই, হিরো যে সেটে এসেছেন তাতেই তারা কৃতজ্ঞ। দুম দাম করে সব প্ল্যান বদলে হিরোর শটগুলো নিতে শুরু করল। অভিনয়ের মান! ওসব পরে ডাবিং-এর সময় দেখা যাবে, হিরো এখানে ঘণ্টা তিনেক কোন গ্রামের ভোলা ভালা ছেলের রোল করে তিন ঘণ্টাতেই পুরো রোজের পয়সা নিয়ে, ছুটলেন আর এক স্টুডিওতে। সেখানে আর এক পাইকারী পরিচালক বসে আছেন।

তিনি বৈকালে এক প্রযোজকের ছবির শুটিং করছেন—এই হিরো সেখানে কোন বড় উঠতি ব্যবসাদার, প্রেম ট্রেম করছেন কোন ধনীর দুলালীর সঙ্গে। বৈকালে হিরো শহুরে প্রণয়ীর রোল করছেন সন্ধ্যা ছয়টা অবধি।

তারপর সন্ধ্যা সাতটাতে সেই পাইকেরী পরিচালকের আর একটা ছবি। অন্য ছবির সেটের পর্দা বদলে—উত্তরের ঘাট দক্ষিণে করে এক বিদ্রোহী তরুণের ভূমিকাতে ঘন দাড়ি লাগিয়ে নেমে গেলেন হিরো—সমাজের সব দুর্নীতিকে দূর করার জন্য পুলিশকে কড়া কড়া ডায়ালগ দিয়ে দাড়ি খুলে এখানেও তিনঘণ্টার কাজ করে পুরো টাকা নিয়ে আজকের মত রণে ভঙ্গ দিলেন।

একদিনে তিন তিনটে নায়কের চরিত্র করে তিন গুণ রোজগার করে গেলেন, পরে দেখা যাচ্ছে তিন তিনটে ছবিই ঝাড়।

আর ছবির বিষয়বস্তু সে সব প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। আজই এই দুর্বার শোষণের জন্যই বাংলা ছবির মান—বাজার সবই কোথায় নেমেছে তা দর্শকরাই বলছেন।

সেদিন ছবির জগতে সেই শোষণ ছিল না অবহেলা ছিল না। ছিল সুন্দর একটা পরিবেশ, একটা ছবির পিছনে ছিল সকলেরই অবদান।

এইসময় বাংলার অবস্থাও ছিল অন্যরকম। যুদ্ধের সময়, যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা সবই চলছে। তবু বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে অবক্ষয়ের সূচনা তখনও হয়নি। এই সময় বাংলার সাহিত্যপত্রগুলোও ভালোই চলছে। এতদিন সাহিত্যিকে প্রাধান্য দিয়েই পত্র পত্রিকাগুলো চলত। খেলার খবর, তাতে থাকত। সিনেমার খুব একটা ঠাঁই সেখানে ছিল না।

অথচ সিনেমা তখন খুবই জনপ্রিয় মাধ্যম।

সিনেমা নিয়ে 'রূপাঞ্জলি' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশিত হত মাসিক, আর ছিল সাপ্তাহিক 'দীপালি'।

এদের মধ্যে প্রকাশিত হতে শুরু করল 'রূপমঞ্চ'। সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় বন্ধুবৎসল, সদালাপী একটি তরুণ। গ্রেষ্ট্রিট থেকে প্রথমে প্রকাশিত হত, তারপর এলো হাতিবাগান বাজারের দোতলায়। সাজানো অফিস কালীশবাবু নিজে ছিলেন ভালো ফটোগ্রাফার, ফলে শিল্পীদের ছবি দিয়ে সাক্ষাৎকার, তাদের জীবনী, বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা এই সঙ্গে কিছু ছোট গল্প ইত্যাদি মিশিয়ে রূপমঞ্চ বের হতে শুরু করলো আর জনপ্রিয়তাও লাভ করল।

কালীশবাবুর কাগজে লিখি, প্রায় সমবয়সী আমরা। তাই বন্ধুত্বও গড়ে উঠতে দেরি হলো না। সেখানেই জমাটি আড্ডা গড়ে উঠল। মাঝে মাঝে এখানে মাছ ভাতের আয়োজন হত। বহু শিল্পী-পরিচালক-লেখক আসতেন দিনভোর হৈ চৈ হত। তখন অগ্রদূতের অন্যতম পরিচালক বিভূতি লাহা ফড়েপুকুরে থাকতেন। প্রচারবিদ ফণী পালও থাকতেন এদিকে, পরিচালক সতু সেন-শিল্পীদের অনেকেই আসতেন। রূপমঞ্চকে ঘিরে একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

কলেজষ্টিট পাড়ায় ডি.এম. লাইব্রেরিতে সন্ধ্যার পর অনেকে আসতেন। প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার ছিলেন বিপ্লবীদের সহযোগী। স্পষ্টভাষী মানুষটির অন্তরে ছিল স্নেহের ধারা। বাইরে তার কোন প্রকাশই ছিল না। স্বভাবত দৃষ্টিকৃপণ-বিচিত্র ধরনের মানুষ।

কোন অফিসের বিল এসেছে সাতশো বাইশ টাকা। গোপালদা সাতশো টাকা দিয়ে বলতেন-ব্যস, এতেই হবে।

বেয়ারা বলে—অফিসের বিল, আমাকে তো পুরো হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে। আর দশটাকা দিয়ে গোপালদা বলেন-ব্যস!

বেয়ারাও নাছোড়বান্দা। শেষ অবধি পুরো টাকা দিয়ে গোপালদা বলেন—

খুব খারাপ লোক হে বাপু। দুটো টাকাও ছাড়ো না।

সাহিত্যিক সুধীরঞ্জন মুখুয্যে বলে—গোপালদা, আমাদের টাকার বেলায় যা করেন এখানেও তাই করছেন?

গোপালদা বলেন—দ্যাখো সুধী, ওর থেকে হিসেবে তুমি ঢের ভালো বোঝো। তুমি কত নিয়েছো বলো তো?

গোপালদার আড্ডায় মাঝে মাঝে গোপালদা পাশেই চাচার হোটেলের কাটলেটও খাওয়াতেন মুড মেজাজ ভালো থাকলে।

এদিকে মিত্রঘোষের আড্ডায় তাবড় ব্যক্তিদের সমাবেশ। সেখানে দেশবিভাগ-দাঙ্গা-রাজনীতি সাহিত্য সব নিয়েই আসর সরগরম থাকত।

এইসময় শৈলজানন্দ বাবু নিউথিয়েটার্স ছেড়ে নিজের কাহিনী, চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবি করলেন 'শহর থেকে দূরে'। অভিনয়ে ধীরাজ ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, মলিনা দেবী, প্রভাবতী, রেণুকা রায় আর এলেন কৌতুকাভিনেতা ফণী রায়।

তখন অনেক বয়েস তার। অ্যামেচার অভিনয় করতেন নাটকে। শৈলজানন্দ

তাকে গ্রাম্য এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের রোলে আনলেন। 'শহর থেকে দূরে' এসেই বাজার মাৎ করে দিল।

শৈলজানন্দ ছিলেন মূলত সাহিত্যিক। বীরভূমের লোক। কয়লা খনির অফিসে কাজও করেছিলেন।

তখন রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ঝরিয়া অঞ্চলে বহু বাঙালি ব্যবসায়ীদের কয়লাখনি ছিল। কয়লাখনির ব্যবসা শুরু করেন প্রথম দিকে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তারাই প্রথম রাণীগঞ্জের কাছে কোলিয়ারির ব্যবসা শুরু করেন 'কারটেগোর কোম্পানি'র নামে। পরে ক্রমশ বীরভূম, মুর্শিদাবাদের অনেক রাজা, ধনী জমিদাররা, কলকাতার অনেক বাঙ্গালীও কোলিয়ারির ব্যবসা শুরু করেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গঙ্গাটিকুরির জমিদার। নিজে ওকালতি ছাড়াও রসসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তিনিই রাণীগঞ্জের কাছে জোড়জানকীতে কোলিয়ারির পত্তন করেন।

সেই কোলিয়ারিতে কিছুদিন কাজ করেছিলেন শৈলজানন্দবাবু, তারই অভিজ্ঞতা নিয়ে তার উপন্যাস 'পাতালপুরী' বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। তারপর সাহিত্যসাধনা শুরু করেন কলকাতায় এসে আর সিনেমার সঙ্গেও যুক্ত হন। শহর থেকে দূরে তাকে এনে দিল প্রভূত খ্যাতি। তারপর সিনেমা জগতেই বেশি ধ্যান দিলেন তিনি। তার নন্দিনী, বন্দী, মানে না মানা, অভিনয় নয়, সন্ধ্যাবেলার রূপকথা ছবি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

এই সময় আমার উপন্যাস 'শেষনাগ' নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত পড়ে তাকে নাট্যরূপ দেবার মনস্থ করলেন স্টার রঙ্গমঞ্চে।

দেবনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন ভারতবর্ষ পত্রিকার সহসম্পাদক। মৃদুভাষী বিশিষ্ট সজ্জন। ভারতবর্ষের সম্পাদক ছিলেন ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্সে তখন আমার কাজলগাঁয়ের কাহিনী, মনিবেগম কুমারীমন প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষে নিয়মিত লিখছি। সেই সুবাদেই দেবুদার সঙ্গে পরিচয়।

দেবনারায়ণবাবু এর মধ্যে শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে বহু মঞ্চসফল নাটক লিখেছেন। নাট্যজগতের এক সুপরিচিত নাম। নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী উপন্যাস' থেকে তার নাট্যরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে মঞ্চে।

তখন দেবনারায়ণ বাবু স্টার রঙ্গমঞ্চের নাট্যকার ও পরিচালক। তিনিই আমার ওই উপন্যাসটি স্টারের সত্তাধিকারী সলিল মিত্রকে বরাত দিলেন তাদের পরবর্তী নাটকের জন্য। উপন্যাসটা পড়ে সলিলবাবুর পছন্দ হলো, তবে দু'একটা জায়গাতে তার একটু বক্তব্যও জানালেন। উপন্যাসে লেখক যতদূর যেতে পারেন মঞ্চে ঠিক ততটা যাওয়া সম্ভব নয়, তাই দু এক জায়গায় তার কিছু অমত রইল। জানালাম এটা নিয়ে দেবুদার সঙ্গে আলোচনা করছি।

আলোচনা করে কিছু পরিবর্তনও করা হলো। সলিলবাবুরও পছন্দ হলো বিষয়বস্তু।

তখন মঞ্চে অবশ্য অন্য নাটক চলছে। এটা হবে তারপর, এখন শুরু হবে নাটক প্রস্তুতির পালা।

তখন বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নাটকের অবদানও কম ছিলনা। ভারতবর্ষের কোনও শহরে নাটকের এত রমরমাও ছিল না। মারাঠী সাহিত্যে নাটকের অবদান অনেক। সেখানেও প্রচুর নাটকের দল ছিল। সেদিনের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী হীরাবাঈ বরোদকরও মঞ্চের নাটকে গাইতেন। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ভি. শান্তরামের পরিবারের সঙ্গে মারাঠা নাট্যমঞ্চের যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালেও মারাঠী নাটক, নাট্যমঞ্চ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বিজয় তেন্ডুলকর, অমর পালেকর, নানা পাটেকর, ডাঃ শ্রীরাম লাঘু এরাও নাটক থেকেই এসেছেন ছায়াছবিতে।

কিন্তু বাংলা নাটকের ঐতিহ্য অনেক গভীরে নিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও গিরিশ ঘোষের নাটক দেখতে আসতেন। বলতেন এতে লোকশিক্ষা হয়। নটী বিনোদিনীকে তিনি আশীর্বাদ করে, মঞ্চকে জাতীয় জীবনে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

সেই সময় কলকাতার স্টার, মিনার্ভা, রংমহল, নাট্যনিকেতন (পরে বিশ্বরূপা) -এ বৃহস্পতিবার, শনি আর রবিবারে দুটো করে শো হত। ছুটিছাটার দিনেও দুটো শো হতো। নাটকের টিকিটের দাম সিনেমার তুলনাতে অনেক বেশি। তবু দর্শকের অভাব হতো না। সাধারণ মানুষ, মফস্বলের দর্শকরা তো আসতেনই। এছাড়াও আসতেন শহরের একটা বিশেষ শ্রেণী। গাড়ির লাইন পড়ে যেত সেদিনের কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে (পরে নামকরণ হয় বিধান সরণী)। থিয়েটারের দর্শকের অভাব ছিলনা। এরা তো পেশাদার নাট্যমঞ্চ। এছাড়াও বহুরূপী, নান্দনিক, শৌভনিক, রূপকার লিটল থিয়েটার শতমিতা প্রভৃতি বহু অপেশাদার নাট্য সংস্থা তখন নাট্যজগতে বহু শক্তিমান শিল্পীদের নিয়ে নাটক করে চলেছে। প্রখ্যাত অভিনেতা শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, অমর গাঙ্গুলী, এদিকে উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত প্রভৃতিরা। ওদিকে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখার্জি, চারুপ্রকাশ ঘোষ সকলেই মূলত ছিলেন গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেতা। তাপস সেন ছিলেন এদের আলোর জাদুকর, পরে সঙ্গীতে এসেছিলেন সলিল চৌধুরীও।

এই গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন রবিশংকরও। তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাবার আগেকার ঘটনা এসব।

গ্রুপ থিয়েটারও পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত। এই গ্রুপ থিয়েটারের পটভূমিকাতে ঋত্বিক ঘটক একটি ছবিও করেছিলেন কোমলগান্ধার নামে। সে পরের কথা।

রঙ্গমঞ্চে নিজেদের কিছু রীতিনীতি ছিল। স্টার থিয়েটার তখন কলকাতার সেরা মঞ্চ। হল—মঞ্চ পুরো এয়ার কনডিশনড, ঝকঝকে হল। সলিলবাবু বাংলা

নাট্যজগতে একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তাঁর বাবা এই মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তমবাবুও এখানে দীর্ঘদিন ধরে শ্যামলী নাটকে অভিনয় করেছেন, নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন সাবিত্রী, ছবি বিশ্বাসও এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছেন নিয়মিত।

থিয়েটারের দিনগুলোয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এক নজর দেখার জন্য এপাড়াতে ভিড় পড়ে যেত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে দেব নারায়ণদার একটা কথা। সেদিনের শিল্পীদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে একটা গ্ল্যামার ছিল, সাধারণ মানুষ থেকে তারা একটু দূরে, একটু দুর্লভ হয়েই থাকতেন। ফিল্ম আর কেউ কেউ এইসব মঞ্চে থিয়েটার করতেন। এছাড়া তাদের দেখা যেত না। সাধারণ মানুষের কাছে তারা ছিলেন কল্পলোকের বাসিন্দা। তাই দেখার জন্য থিয়েটারে, সিনেমা হাউসে ভিড় করত মানুষ।

কিন্তু আজ সেই শিল্পীদের অনেকেই প্রভূত অর্থোপার্জনের জন্যই যাত্রা বা যাত্রার নাম এড়িয়ে ওপন ওয়াল, ওয়ান ওয়াল ইত্যাদি নাম দিয়ে শহর কেন দূর মফস্বলের ধান মাঠের উপর অভিনয় করে করে নিজেদের ওভার এক্সপোজড্ অর্থাৎ সহজলভ্য-সহজদৃশ্য সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে নামিয়ে এনে 'শো বিজনেসের' ক্ষতিই করেছেন। গ্রামের মানুষই বলে আরে অমুক! সেই হিরো তো এই মাঠে বসে চা, চপ খেয়ে পালা গেয়ে গেছে। তাকে দেখতে পনেরো টাকার টিকিট কাটতে হবে ধ্যুস্! আজ তারই খেসারত দিতে হচ্ছে সিনেমা শিল্পকে।

সলিলবাবুর সঙ্গে আমার চুক্তিও হয়ে গেল।

উপন্যাসের মলাট খুলে ফেলে সাধারণভাবে বাঁধাই করে দেবনারায়ণদা নাট্যরূপ দিতে শুরু করলেন। আমিও মাঝে মাঝে বসি দেবুদার সঙ্গে। আমাকে বলা হয়েছে উপন্যাসের নামও প্রকাশ না করতে।

কারণ তখন অন্য নাটক চলছে।

এদের শিল্পীদের সঙ্গে চুক্তি হয় নাটক হিসাবে। সেই নাটকের চাহিদামতই শিল্পী বাছাই করতে হয়। এই নাটকে যারা আছেন, পরবর্তী নাটকে তারা নাও থাকতে পারেন। কর্তৃপক্ষ অন্য শিল্পীকেও নিতে পারেন। তাই পরবর্তী নাটক সম্বন্ধে ওদের এইসব নীতি গ্রহণ করতে হয়।

তখন কমল মিত্র মঞ্চসফল অভিনেতা, স্পষ্টবাদী লোক, ভারি চেহারা-জমিদার বংশের ছাপ দেহে, মনে, সজ্জন ব্যক্তি। বর্ধমানের লোক। কণ্ঠস্বর দেহ সবই তার মঞ্চের উপযোগী। অভিনয় ক্ষমতা দিয়েই তিনি নিজের ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। দেবুদার ঘরেও প্রায় আসতেন। তখন স্টারে রয়েছে অনুপ কুমার, ভানু বাড়ুয্যে, কমলবাবু, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, গীতা দে আরও অনেকে।

দেবনারায়ণদা নাট্যরূপ দেবার সময় নিজে লিখতেন না। বই দেখে তিনি এক একটা সিন ধরে সংলাপগুলো একটার পর একটা বলে যেতেন আর তার এক সহকারী সুবলবাবু লিখে যেতেন। পুরো সিনটা এই ভাবে লেখার পর পড়া হত,

তারপর আবার মাজা ঘষা করতেন।

দু'একটা সিন আমাকেই এইভাবে বলে যেতে বলতেন। কিন্তু দেখলাম ওটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। নাটক লেখার ক্ষেত্রে সংলাপের প্রাধান্যই বেশি থাকে। বলে গেলে সংলাপের ওজনটা ঠিক বোঝা যায়, কিন্তু আমার সে অভ্যেস নেই। তাই নিজেকেই কলম ধরে একটা সিন লিখে সাজাতে হয়। দেবুদা তার ওপর কাটা ছেড়া করে আবার নতুন রূপ দেন। নাটক লেখার মক্‌সোটা ওইভাবেই দেবুদার কাছেই শুরু করি।

এর মধ্যে বেশ কিছু ঘটনাই ঘটে গেছে। স্মৃতিচারণ করার এই মুস্কিল। বহু স্মৃতি মনে ভিড় করে আসে। তাই সব আগে পিছের ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে যায়।

তখনও বেলেঘাটাতেই রয়েছি।

শিল্পী দেবব্রতের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। গুণময়বাবুর সীমন্তিনী ছবি নানা বিপর্যয়ের মধ্যে শেষ হয়েছে। তবে সে ছবি আমার মনোমত হয়নি।

কারণ অর্থাভাবের জন্যই সেই ছবিতে নায়ক, সহ নায়ক দুজনকেই নিতে হয়েছে নতুনদের মধ্যে থেকে, নায়িকাও কেউ নামকরা নয়। এক ফণী রায় মশায় ছিলেন তখনকার নামী অভিনেতা, তাও পার্শ্বচরিত্রে। এইখানে দেখেছিলাম এক অভিনেতাকে, হাওড়ার দিকের মানুষ। সারাজীবন এই সাইড রোলেই কাটিয়ে গেল। অতীতে অনেক বাড়ি-অর্থ ছিল। ছবি করার মোহে এই লাইনে এসে সেসব গেছে। পরিবার পরিজনও নাই। ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে। তবু এখনও স্বপ্ন দেখে এই সিনেমা থেকেই আবার সে নাম করবে।

দেহ শুকিয়ে আমসী, চোখ কোটরাগত—তবু হিরো হবার স্বপ্ন দেখে সে। যেন মরীচিকার দিকে ছুটে চলেছে ঊষর রৌদ্রদগ্ধ মরু প্রান্তরে এক মৃগ আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে। সেই তৃষ্ণা কোনদিনই মিটবে না—কোনদিন নির্জন মরুভূমিতে লুটিয়ে পড়বে।

ছায়াছবির জগতে এমন অনেক স্বপ্নবিলাসীদের দেখেছি, হিরো হতে এসে জিরো হয়েছে। শূন্যে পরিণত হয়ে গেছে।

তাই সিনেমা জগৎ থেকে একটু দূরে দূরেই থাকি। চাকরিটা করছি। এর মধ্যে মোহিনী চৌধুরীর কিছু গান বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। সত্য মুখার্জির গাওয়া 'পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়। সেদিন অফিস ক্যান্টিনে বসেই একটা গান দেখালো। তখন আমরা 'পথের দাবী'র কাজ করছি। তাতে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' নজরুলের এই কবিতাটার কিছু আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু গোল বেধেছিল গানের স্বত্ব নিয়ে। তাই ওটা 'পথের দাবী'-তে লাগানো যায়নি।

সুকান্ত তখন আর বেঁচে নেই—সে থাকলে ভালো গান কিছু হত। সে আগেই ওই যাদবপুর হাসপাতালেই মারা গেছে।

এসব আলোচনাও করতাম মোহিনীর সঙ্গে।

তার মনেও দেশাত্মবোধক গান কিছু লেখার বাসনা ছিল। পৃথিবী আমারে

চায়—সেই ভাবনারই ফসল। সেদিন দেখালো একটি গান—

সুন্দর বাঁকানো স্টাইলে ওর হাতের লেখা—মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কত প্রাণ হল বলিদান।

দেখেই চমকে উঠি—দারুণ হয়েছে। হেমবাবুকে দেখা।

হেমবাবু তখন এইচ - এম - ভি'র বাংলা গানের বিভাগের অন্যতম কর্মকর্তা।

সেই গান হেমবাবু তখনকার প্রখ্যাত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-কে দিয়ে রেকর্ড করিয়েছিলেন। সেই গান আজও সমাদৃত।

এর মধ্যে মোহিনীও ছবির জগতে যাতায়াত শুরু করেছে গান লেখার জন্য। দুজনের মধ্যে কথাও হয়, অনেক পরিকল্পনাও হয়। এই সময় মোহিনী শৈলজানন্দের বোধ হয় মানে না মানা ছবিতে গান লেখার সুযোগ পায়। টাকার অঙ্কটা মনে নাই—চেকটাও দেখালো।

তারপর তারই অভিনয় নয়, সন্ধ্যাবেলার রূপকথাতেও গান লিখেছিল। শুটিং-এও যেত। ব্যক্তিগতভাবে শৈলজাদা আমাকে ও চিনতেন, আমিও তার গ্রামে গেছি, ওই অঞ্চলেরই মানুষ, লেখালেখি একটু আধটু করি, তাই স্নেহ করতেন আর আমরা বীরভূম বাঁকড়ি টানেই কথা বলতাম। এই কথ্যভাষার মধ্যে শৈলজাদা বোধ হয় ষোল আনা দিনের স্মৃতিকেই ফিরে পেতেন। স্টুডিওতেই নয়—বাগবাজারে তখন পশুপতি বোস লেনের মোড়ের বাড়িতে থাকতেন তিনি, ওই বাড়িতেও যেতাম, শৈলজাদার কথায় একটা আত্মীয়তার সহজ সুর ফুটে উঠত—সেটা ছিল লালমাটির দেশের বৈশিষ্ট্য। সহজ সরল দিলখোলা মানুষ ছিলেন শৈলজানন্দ।

আর তারাশঙ্করবাবু ছিলেন এর বিপরীত রীতির মানুষ। কথাবার্তায় সংযত। বাইরে কঠিন। শৈলজাদা ছিলেন ঈষৎ গোলগাল চেহারার মানুষ, নজরুলের বাল্যবন্ধু, তাই চুলগুলোও কিছুটা নজরুলের স্টাইলেই বোধহয় রাখতেন, হাস্যমুখ।

তারাশঙ্কর বাবু ছিলেন তার তুলনায় শীর্ণকায়, গম্ভীর প্রকৃতির। বাইরে কঠিন কিন্তু অন্তরে কোমল—স্নেহপ্রবণ, দরদী, কিন্তু সহজে সে সবের বহিঃপ্রকাশ ঘটত না। সেই স্নেহের স্পর্শ কে যে পেয়েছে সে তবু ছুটে যেত তাঁর কাছে।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় আর এক ধরনের মানুষ। প্রথম দেখাতেই তিনি সকলকে আপন করে নিতে পারতেন। পেশায় ছিলেন শিক্ষক, ছেলেদের নিয়েই তার দিন কাটে, তাই তরুণদের কাছেও তিনি সহজ—কাছের মানুষ।

মিত্র ঘোষের দোকানে মাঝে মাঝে আসতেন, আর তাকে দেখেই বোঝা যেত বৌদি এ বাড়িতে আছেন না বাবার ওখানে গেছেন। কখনও আসতেন পাট ভাঙা ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী, চকচকে জুতো—সুন্দর ছাতা নিয়ে।

গজেনদা বলতেন—বুঝেছি, বৌদি তাহলে চালকেতেই রয়েছেন। আবার কখনও দেখা যেতো ময়লা একটা ধুতি, আধময়লা হাফসার্ট, পায়ের জুতোটা ক্যাম্বিসের, তার গোড়ালিও বসা, হাতের ছাতাটাও লটপটে, শ্রীহীন।

গজেনদা বলতেন—বুঝেছি।

অর্থাৎ বৌদি বাপের বাড়িতে।

সেবার ঘাটশিলা থেকে এসেছেন বিভূতিবাবু, এর সঙ্গে আমিও গেছি শনিবারের চিঠি অফিসে। তখন শনিবারের চিঠির অফিস ছিল শ্যামবাজারে মোহন বাগান লেনে। বিভূতি বাবুর পকেটে একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি দেখে শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীদাস মশায় সেটা নেবেনই—বিভূতিবাবু সেটা দেবেন না, কারণ শনিবারের চিঠি দেবে মাত্র দশটাকা—অন্য কোন পঁত্রিকা পঁচিশ টাকা দেয়, তাকেই দেবেন ওটা।

শেষ অবধি সজনীবাবুই সেটা দখল করলেন। ছাপাও হলো শনিবারের চিঠিতে। গল্পটার নাম 'মন্বন্তর'। এটি বিভূতিবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প।

হেমেন গুপ্ত ওই 'বিয়াল্লিশের' আগে একটা ছবির প্ল্যান করলেন। বিভূতিবাবুর কোনও গল্প নিয়ে ছবি করবেন। সব শুনে আমিই গেলাম বিভূতিবাবুর গ্রামের বাড়িতে। তখনও দেশ বিভাগ হয়নি। খুলনা মেল ছাড়ে শিয়ালদহ থেকে দুপুরে, ওই ট্রেনেই উঠলাম।

বারাসত ছাড়িয়ে গাড়ি চলেছে, মনে পড়ে লাইনের দু'দিকে তখন ঘন ঝোপজঙ্গ ল, বেতের জঙ্গলও ছিল। হাবড়া স্টেশন থেকে ধূ ধূ মাঠ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিত্যক্ত একটা এয়ার স্ট্রিপও রয়েছে।

বনগাঁ থেকে বনগাঁ রানাঘাট সেকশানের গাড়িতে উঠলাম। পরের স্টেশন গোপালনগরে নামলাম তখন অপরাহ্ন। ফাল্গুনের শুরু। ফাঁকা স্টেশন, ধূলি ধূসর সড়ক। গাবগাছে এসেছে বেগুনি রংয়ের পাতাব বাহার, বাঁশ বনে এসেছে ঝরাপাতার রং—বাতাসে আমের বোলের সুবাস বাজারের পাশ দিয়ে সড়কটা চলে গেছে। একটু ফুলের সমারোহ একনজর দেখেই মনে হবে এ জগৎ যেন খুব চেনা-দেখা। এ যেন পথের পাঁচালীর দেশেই এসেছি।

বাংলা সাহিত্যের দু'জন সাহিত্যিকের সাহিত্য সম্ভার উঠে এসেছে তাদের চেনা জগৎ থেকেই। নিখুঁত ভাবে এসেছে তাদের সাহিত্যে সেখানের মানুষ আর প্রকৃতি। তাই তাদের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী ভাবে আসন করেছে। তাদের একজন তারাশংকর, অন্যজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোন পাঠককে নিয়ে গিয়ে লাভপুর স্টেশনে ছেড়ে দিলে কিছুদিন আগে অবধি সে দেখত সেই স্টেশন প্রান্তর, ছোট লাইনটা দিঘির পাড় দিয়ে চলে গেছে। সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছে লাল ফুলের হোলি—মনে হবে ঠাকুরঝিকেই দেখা যাবে মাথায় ঝকঝকে দুধের ঘটি —দেখা যাবে নিতাই কবিয়াল না হয় রসকলির কোন বৈষ্ণবীকে।

সেইই তারাশঙ্করের দেশ। আজ লাভপুর স্টেশন তার পরিবেশ দেখে হতাশ হয়েছি। সেই জগৎ হারিয়ে গেছে আজকের আগ্রাসী মানুষের থাবায়। মনে হয় সেই গোপালপুর, চাল্‌কে বারাকপুরও বদলে গেছে, হারিয়ে গেছে 'পথের পাঁচালীর'

জগৎ।

সেদিন স্কুলের ছুটি। পথের ধারেই গোপালপুর স্কুল। তিনি তখন সেখানের শিক্ষক, সেখানেই তার গ্রামের সন্ধান করে গোপালনগর হাটতলা ছাড়িয়ে চলেছি।

সেই সড়ক ছেড়ে ডানদিকে গ্রামের পায়ে চলা পথ ধরে চলেছি, আমবাগানে মঞ্জরীর সুবাস, মৌমাছিদের গুঞ্জরন। ঘেটু ফুলের ভিড় পথের দু'দিকে একটু এগিয়ে এসে দেখা গেল এক বৃদ্ধ বকুল। নীচের দিকটা বাধানো হয়েছিল কোনদিন, তারপর শিকড়ের চাপে ফেটে গিয়েও বেদীটা রয়েছে। চারিপাশে জুড়ে ছড়ানো বকুল। ওদিকে পুরোনো একতলা বাড়ি, রকেই বসেছিলেন বিভূতিবাবু। আমাকে দেখে খুশিতে উপছে পড়ে বলেন—তুমি এসেছো, খুব ভাল হয়েছে। মনটা ভালো নাই। ছেলেরা সব চলে গেল।

শুনে অবাক হই। তখনও বাবলু (তারাদাশ) আসেনি। নিঃসন্তান দম্পতি। সংসারে এক ভাগ্নে তরুণ সুটুকে আর ভাগ্নী দুর্গা। পরবর্তীকালে দুর্গার বিয়ে হয়েছিল আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বলি—ছেলেরা? মানে।

বিভূতিবাবু বলেন।

—বুঝলেন? স্কুলের ছেলেরা এবার যারা 'এলাউড' হয়েছিল তারা চলে গেল রানাঘাট সেন্টার থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে। এতদিন ছিল স্কুলে। আজ ওদের খাবার নেমন্তন্ন করেছিলাম। ওরা খেয়ে দেয়ে চলে গেল। কে কোথায় হারিয়ে যাবে 'জীবনের পথে'।

কেমন প্রকৃত স্নেহপ্রবণ শিক্ষককেও সেদিন আবিষ্কার করেছিলাম বিভূতিবাবুর মধ্যে।

গ্রামে কোন গৃহস্থের বাড়িতে গেলে গৃহস্বামী তার খামার, বাগান ইত্যাদিই দেখায়। পুকুরে কেমন মাছ আছে, কোন গরুটা কত দুধ দেয়, এই সবগল্পই করে।

এই গৃহস্বামী সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের মানুষ, বৌদি তো এর মধ্যে আমাকে চা-জলখাবার দিয়েছেন। বিভূতিবাবু বলেন—

চলো তোমায় ইছামতীর ঘাট, নীলকুঠীর মাঠ—বাঁওড়ের ধার দেখিয়ে আনি। এগুলো তাঁর সাহিত্যকর্মেই নয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

ইছামতী এখানে তখনও গভীর ছিল, পাশে বনবাদাড়, একটা শিমূল গাছে ফুলের বাহার। অতীতে ইছামতীতে নাকি কুমীরও থাকত। তারই এক বোনকে এখানে কুমীরে ধরেছিল।

এই ঘাট ছিল বিভূতিবাবুর খুব প্রিয়। এখানেই স্নান করতেন, ওদিকে দিগন্তপ্রসারী মাঠ।

ঘাট থেকে এলাম নীলকুঠির মাঠে। এদিকে ওদিকে ঘন জঙ্গল, কিছু ধ্বংসস্তূপ, ওদিকেই ইছামতী নদী। এককালে নীলচাষ যখন হত এটাই ছিল নীলকর সাহেবদের কুঠি। এখন ধ্বংসস্তূপ। এই নীলকরদের আমল নিয়েই বিভূতিবাবু পরে 'ইছামতী'

উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

ওই মাঠের মধ্যে একটা বাবলাগাছ। স্বর্ণলতার গাঢ় হলুদ লতার আবেষ্টণীতে সেটা একটা হলুদ পুঞ্জে পরিণত। তার সামনে এসে আমাকে বললেন—গাছের নীচে ঢুকে পড়ো।

আমিও ঢুকে পড়ি। দেখলাম সেখানে রাখা আছে তাল পাতার গোড়ার দিকের কয়েকটা টুকরো। তাদের আকার কিছুটা ঘোড়ার পিঠে বসার জন্য যেমন চামড়ার আসন হয় অনেকটা তেমনি। চলতিকথায় এগুলো তালের বেগড়ো। বিভূতিবাবু বলেন দু'টো নিয়ে এসো।

দু'খানা ছোট বেগড়ো বের করে বগলদাবা করে এবার চলতে থাকে বাঁওড়ের দিকে। তখন সূর্য অস্তাচলগামী।

সেই মাটির সরণিটা বাঁওড়ের জলাভূমিকে ঘিরে হাসুলি বাঁকের সৃষ্টি করে গেছে। ওদিকে বাঁশবন। ঘেরা গ্রামসীমায় সবুজ বোরোধানের ক্ষেত। বিভূতি বাবু একটা বোগড়েতে বসেছেন জলের ধার ঘেঁষে। বিদায়ী সূর্যের আলো ম্লান থেকে ম্লান হয়ে আসছে। বাঁওড়ের জলে কচুরীপানার ভেটাভেট রং ফুলগুলোও আঁধারে হারিয়ে যায়, একটি দিকের পরিক্রমা সেরে সূর্য বিদায় নিল, আদিগন্ত প্রকৃতি যেন বিদায় বেদনায় মূক। প্রকৃতির বুকে প্রশান্তির আবেশ।

পাশে বসে আছি আমি, তবু মনে হয় উনি যেন কোন জগতে হারিয়ে গেছেন। স্তব্ধ ধ্যানরত এক মূর্তিতে পরিণত, মুখে প্রগাঢ় প্রশান্তির ছায়া।

আকাশের বুকে আবার ঝিকিমিকি ওঠে। বাঁওড়ের জলে সেই আলোর ফুলকি। ধ্যান ভঙ্গ হয় বিভূতিবাবুর।

—চলো, ওঠা যাক।

ধ্যানাসন থেকে উঠলেন। আবার সেই বেগড়ো বগলে করে এনে সেই স্বর্ণলতা ঘেরা গাছের নিচে রেখে বাড়ির দিকে ফিরছি। বাঁশবনে ঝরাপাতার স্তূপ। চারিদিকেই ফুটন্ত ঘেটুফুলের সমারোহ। এই বাঁশবনে কারা শুকনো পাতা গাদা করে আগুন দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে ঝরাপাতার স্তূপ।

বিভূতিবাবু থমকে দাঁড়িয়ে বেশ রাগত স্বরেই কার নাম ধরে ডাকতে একটা লোক পাশের মাটির চালা থেকে বের হয়ে আসতে বিভূতিবাবু তাকে বলেন

—বাঁশ ঝাড়ের নীচে আগুন জ্বালিয়ে দিলি?

লোকটা বলে—আজ্ঞে শুকনো পাতার ছাই তো বাঁশঝাড়ে সারের কাজ করবে। বৃষ্টি নামলে কত বাঁশের মুখি বেরুবে দেখবেন আপনার বাঁশঝাড়ে—বিভূতিবাবু তার বাঁশঝাড়ের বংশবৃদ্ধির কথা ভাবেন না তার ভাবনা এই নীচের ফুটন্ত ঘেঁটু ফুলের জন্য। বলেন,

—তাই বলে এত সুন্দর ঘেঁটুফুলগুলোকে জ্বালিয়ে দিবি? কি লোকরে তুই!

সার্থক প্রকৃতি প্রেমী না হলে অফুরান ঘেঁটুফুলের কথা কেউ ভাবে? তাই

বোধহয় তার সাহিত্যে প্রকৃতিই প্রধান হয়ে উঠেছিল।

বিভূতিবাবু ছিলেন ভোজন রসিক মানুষ। খাওয়ার সমঝদার ছিলেন। নিজেও খেতে ভালবাসতেন, অপরকে খাওয়াতেও ভালোবাসতেন। রাতে লুচি-আরও কি সব, আর ছিল তাঁর ওখানের সোনামুগের ডাল তার লেখাতেই আছে—খাঁটি ক্ষীরের মত স্বাদ, সেই ডালের স্বাদ আজও স্মৃতি হয়ে আছে।

তখন তিনি 'দেবযান' লেখার পরিকল্পনা করছেন, হাতও দিয়েছেন। দেখেছিলাম এ অন্য ভাবস্পর্শ তার চিন্তাধারাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। দেহাতীত-কালাতীত এক মহাকালকে তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছেন ওই অমর সৃষ্টির মাধ্যমে এ তাঁর নিজস্ব এক অনুভূতি যা আমার ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য নেই।

বিভূতিবাবুর বাসনা ছিল তার কোন লেখার ছবি হোক।

হেমেনবাবুর সঙ্গে কথাও হলো, গল্পের জন্য তিনি সম্মান দক্ষিণা চেয়েছিলেন যতদূর মনে পড়ে তখনকার দিনে মাত্র দেড় হাজার টাকা। হেমেনবাবু ছবির কাজ এগোবার চেষ্টা করেও সফল হননি, সে ছবি হলো না।

পরবর্তীকালে একদিন বিভূতিবাবু খবর পাঠালেন কলকাতা আসছেন, সুইনহো স্ট্রিটে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে উঠবেন। গেলাম, উনি জানালেন দেবকী বসু তাঁর 'পথের পাঁচালী'র ফিল্ম করতে আগ্রহী তাই নিয়ে কথা পাকা হবে।

শুনে খুশিই হলাম, পরে শুনলাম দেবকীবাবু তার মেয়ের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত। তাই কথা আর তখন হয়নি। সেই প্রসঙ্গও কেন জানি না চাপা পড়ে গেছল।

পরে সত্যজিৎবাবু পথের পাঁচালী, অপুর সংসার, অপরাজিত ছবি করেছিলেন। তাঁর 'পথের পাঁচালী' বিশ্বজয় করেছিল। বিভূতিবাবু তা দেখে যেতে পারেননি।

সেই সময় তিনজন পরিচালক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছবির জগতে এলেন। সত্যজিৎবাবু, ঋত্বিক ঘটক আর মৃণাল সেন। আমি তখন মধ্যকলকাতার মেসে থাকি। দুপুরে লেখালেখি করি, কোথায় বের হই। আমর্স্টহাস্ট্রিটের শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে একটা বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে তখন মৃণাল সেন থাকেন।

মৃণালবাবুকে স্টুডিওতেও দেখেছি দেবব্রত, সত্যেনবাবুদের সঙ্গে। সেই সূত্রেই আলাপ। তাই কোন দিন বৈকালে ওর আমর্স্টস্ট্রিটের ফ্ল্যাটেও আসতাম। সিনেমা সাহিত্য নিয়েও আলাপ আলোচনা হত। তার আলোচনায় বুদ্ধিদৃপ্ততার ভাব ফুটে উঠত। সিনেমা জগতে যে নতুন কিছু দেবার পরিকল্পনা তিনি করেছেন, তার প্রস্তুতিও চলছে সেটাও বুঝেছিলাম। মিষ্টভাষী, সংযতবান তরুণটিকে সেদিন থেকেই ভালো লেগেছিল।

বেলেঘাটায় চলে এসেছি, এখানে ওই 'নবমিলন' ক্লাবকে ঘিরে নানা কর্মকাণ্ড চলেছে। সুকান্ত আর নেই। দেবব্রতরা, মোহনদা, তার ভাইরাও রয়েছে। ওই সময় ক্লাবে আসত প্রফুল্ল। তার সঙ্গে ক্লাবে আসত তরুণ প্রশান্ত শান্ত নম্র স্বভাবের কথা কম বলতো, কিন্তু কাজে ছিল অকৃত্রিম নিষ্ঠা। প্রফুল্ল পরে মস্কোতে 'প্রাভদায়' কাজ

নিয়ে চলে যায়। আর সে দেশে ফেরেনি, ওখানেই মারা গেছল।

বহুকাল পর একটি অনুষ্ঠানে দেখা হল সেই প্রশান্তের সঙ্গে। সেই নিজের পরিচয় দিলেন। অতীতের পরিচয়। সেই প্রশান্ত আজ কলকাতার মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়।

রেনেসাঁর যুগ সম্বন্ধে পড়েছি কিছু কিছু। সেটা ছিল এক ঝাঁক প্রতিভার নব জাগরণের যুগ। আমার মনে হয় আমিও একটা যুগকে দেখেছিলাম সেদিনও ছিল নবজাগরণের যুগ।

সাহিত্য ক্ষেত্রে তখন তিন বাড়ুয্যের প্রতিষ্ঠা, রয়েছেন বিভূতি মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্যবাবু আরও অনেকে। নবাগতদের মধ্যে উঠেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলমিত্র, নরেন মিত্র, সমরেশ বসু আরও অনেকে।

গানের জগতে রয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, গিরিজাশঙ্কর, জ্ঞান গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র, মান্না দে, চিন্ময় লাহিড়ী—ওদিকে শান্তিদেব, জর্জ দেবব্রত বিশ্বাস, পঙ্কজবাবু, কণিকা, সুচিত্রা, হেমন্তকুমার, শচীন দেববর্মন প্রভৃতি। অভিনয়ের ক্ষেত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, শিশির ভাদুড়ী, এগিয়ে এসেছে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত।

যন্ত্রসঙ্গীতে উঠছেন রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁ—স্বমহিমায় রয়েছেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, উঠছে এ.কানন প্রভৃতি। বাংলায় তখন সর্বক্ষেত্রেই পুরাতন-আগামী প্রজন্মের প্রতিভার বিকাশ।

তার তুলনায় পরবর্তীকাল যেন অনেক নিঃস্ব। বর্তমানের পুঁজিই নেই তাতে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সম্বন্ধে হতাশাই আসে। কোন ক্ষেত্রে নিষ্ঠা-সাধনার অবকাশ নাই, দুদিন অভিনয় করেই টাকার হিসাব করতে বসে।

সেদিনের সংবাদপত্রগুলো দেখলে বোঝা যাবে সেদিন ওইসব উদীয়মান প্রতিভার কোন স্বীকৃতিই সে দিনের সংবাদ মাধ্যম তাদের দেয়নি তারা নিরলস সাধনা করেই পরবর্তী জীবনে এই জায়গাতে এসেছিলেন, মিডিয়া তাদের ঠেলে তোলেনি।

কিন্তু আজ তপস্যা না করেই ফলের প্রত্যাশা, আর মিডিয়া গুলোও একটা ছবি করলেই তার ছবি ছাপিয়ে শতগুণ বর্ণনা করে লিখে তাকে হাউই এর আকাশে তুলে দিল নক্ষত্র হতে। কিন্তু হাউই তো আকাশে ফেটে ফুলঝুরি হয়েই মিলিয়ে গেল। আজকের মিডিয়া এদের ওই হাউই বাজীতেই পরিণত করেছে তারা কেউ হচ্ছে না।

থিয়েটার, নাটক আজ শেষ হবার মুখে, একদিন যে পেশাদার নাট্যমঞ্চগুলো টিকিয়ে রেখেছিল বাংলার অন্যতম সংস্কৃতিকে আজ তারা অবলুপ্ত প্রায়। নেই বললেই চলে উত্তর কলকাতা, এমনকি দক্ষিণে তপন থিয়েটার, সুজাতা সদন, যোগেশ মাইম, মুক্তমঞ্চ, কালিকা থিয়েটার সব উঠে দু'একটা গ্রুপ থিয়েটার কোনমতে টিকে আছে। নান্দীকারের মত দলও আজ টিকে থাকার জন্য লড়ছে।

সেই দিন গুলোকে মনে পড়ে, মহাসমারোহে স্টারে এবার মঞ্চস্থ হতে চলেছে আমার 'শেষনাগ' উপন্যাস অবলম্বনে 'শেষাগ্নি'। বন কেটে সদ্য গড়ে ওঠা ইস্পাতনগরী এর পটভূমিকা। আদিম আরণ্যক পরিবেশ সামন্ততান্ত্রিক জগতের বুকে আসছে নতুন যন্ত্রসভ্যতার প্রকাশ। সেই সংঘাতকে নিয়েই এই উপন্যাস।

কমল মিত্র বর্ধমানের মানুষ, দুর্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা সগড়ভাঙ্গার জমিদার দুর্গানারায়ণের বংশধরদের তিনি চেনেন, সেখানেও অভিনয় উপলক্ষ্যে গেছেন। নাটকের অন্যতম মূল চরিত্রে তিনিই অভিনয় করেছেন। নাটকের ঘোষনার পর সেদিন তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। এতদিন এসব বলার কথা ছিল না, এবার বলছি। অনুপকুমার, ভানু তখন ফুল ফর্মে। ভানু বাবু বলতেন

—আইজ হাউস ফুল!

দেবুদা বলতেন — তুমি দেখেছো?

—না, যাইনি, ওই সলিলবাবুর সিগ্রেট টানা দেইখাই বুঝছি, যেদিন হাউস ফুল হয়, তখন সলিলবাবু অফিসে বইসা মৌজ কইরা ধীরে ধীরে সিগ্রেট টানেন। আর যেদিন সেল ডাউন থাহে হেদিন ঘন ঘন ফুস্ ফুস্ কইরা সিগ্রেট টানেন।

ব্যাপারটা সত্যিই, সলিলবাবুকে দেখেছিলাম এক মঞ্চ সফল প্রযোজক হিসাবেই। আরও দেখতাম তিনি কখনও মঞ্চে, গ্রীনরুমে পা দিতেন না সাধারণ শোতে, সব ছেড়ে দিতেন পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের উপরই। ওই অফিসে বসেই কাজ দেখে চলে আসতেন।

উদ্বোধনের আগে সাত আট দিন মঞ্চ বন্ধ থাকত নাটকের রিহার্সেলের জন্য। তার আগে পার্ট লিখে শিল্পীদের দেওয়া হয়েছে, তারা পার্ট পড়ছেন। রিহার্সেল হয় বসে বসেই।

তারপর শো বন্ধ করে শুরু হয় মঞ্চে রিহার্সেল, ওদিকে সেট সেটিং এর কাজ, পোষাক তৈরির কাজও চলছে। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের শিল্পীরাও তৈরি হচ্ছেন। নাটকে টেপ বাজত না—লাইফ মিউজিকই বাজাতেন যন্ত্রীরা। শেষাগ্নি নাটকে দুর্গাপুর স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে, শালবন—গর্জ—শেষে জমিদার প্রাসাদ ড্যামের জন্য ডিনামাইট দিয়ে ভাঙ্গার দৃশ্য ছিল, দামোদরের তীর এসব ছিল পটভূমিতে। সলিলবাবু আর্ট ডিরেক্টারকে আমার সঙ্গে গাড়ি নিয়ে দুর্গাপুর পাঠালেন তাকে ওইসব জায়গা, শালবন, নদীর ধার, স্টেশনের কাছের গর্জ সব দেখিয়ে আনলাম, তিনি ফটো তুলে এনে সেইমত সেট বানালেন, সন্ধ্যার ট্রেন বাতি জ্বেলে বনের গভীর থেকে বের হয়ে আসতো স্টেজে, হাততালিতে হল ফেটে পড়ত, শেষ দৃশ্যে বাড়িভাঙার ব্যাপারটাও ছিল দারুণ চমকপ্রদ বিস্ফোরণে থাম—ছাদ ভেঙ্গে পড়ছে। ধুলোয় মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যেত।

একটা নাটককে সফল করার জন্য কোন খামতিই রাখতেন না, তাই নাটকও প্রায় সাতশো রাত্রি করে চলত।

মঞ্চে রিহার্সেল শেষ হলো, এবার ফুল রিহার্সেল। মঞ্চেই হতো সেটা। তারপর দিন হবে ম্যাটিনী আর ইভনিং দুটো রিহার্সেল শোই। এতে সেট সেটিং—বাদ্যযন্ত্রী, শিল্পীরাও মেক আপ নিয়ে একেবারে শো যেমন হয় সেই ভাবেই অভিনয় করবেন। এতে সকলেরই ওই সময়—দুটো শোর রিহার্সেল হবার পর তারপর হবে উদ্বোধন।

সেদিন শিল্পী, কলা-কুশলীরা ভক্তিভরে গ্রীনরুমে যেখানে রামকৃষ্ণদেব পদার্পণ করেছিলেন, সেই জায়গাতে ঠাকুরের ছবিকে পুজো দিয়ে প্রণাম করেন, পরস্পরকে প্রণাম আলিঙ্গন করে ঠাকুরকে স্মরণ করে মঞ্চে নামেন। হাউস ফুল।

আমাকেও দর্শকের আসনে বসে নাটক—তার দর্শকদের উপর রিঅ্যাকশন, কোথায় হাততালি উঠছে, কোথায় নাটক একটু জোরদার করা দরকার, এগুলো দেখে শো'র পর বসতে হত দেবুদার সঙ্গে। কিছু সামান্য মাজা ঘষাও চলত তিন চার রাত্রির অভিনয়ের মধ্যে। তারপর নাটক জমে যেত তখন পরিচালকের কাজ সব শিল্পীকে সময়মত এনে নাটক চালু করে দেওয়া। শিল্পীরা মাস মাইনে পেতেন, আর দুটো শোর দিন কোম্পানিই তাদের টিফিন দিত।

এর মধ্যে বিচিত্র ঘটনাও ঘটত। একদিন গীতা দে এসে দেবুদার কাছে জানায়

—আর, অভিনয় করা যাবে না ভানুবাবুর জন্য।

—কেন? ভানু কি করলো?

—দেখবেন গিয়ে, তারপর বলবেন।

ভানু গীতাদের সিন চলছে। দেবুদা দেখেন ভানু পকেট থেকে একটা আরশোলা বের করেছে, গীতা দে স্টেজে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করছে এক জাঁদরেল মহিলার, হঠাৎ ওই আরশোলা দেখে গীতার চক্ষু স্থির। আরশোলাকে তার বাঘের চেয়েও বেশি ভয়। পার্ট করবে না আরশোলা সামলাবে তাই নিয়েই বিব্রত।

ভানু তখন আরশোলা ছেড়েছে, সেটা ফর ফর করে উড়ছে, এগিয়ে যাচ্ছে গীতার দিকে, গীতাও তত বিব্রত। কোনমতে সিন শেষ করে এসে দেবুদাকে বলে—দেখলেন কান্ড।

ভানু নির্বিকার। বলে—ঠিক আছে, আরশোলারে কইয়া দিমু, আর যাইব না।

আর এক শক্তিমান অভিনেতা ছিলেন অনুপ কুমার। ছেলেবেলায় শিশিরবাবুর কাছে অভিনয় শিখে পরে মঞ্চ-ছবির জগতকে মাতিয়ে ছিলেন। শেষাগ্নিতে ও করত একটা বন্দী ডাকাতের চরিত্র, গীতা দে গাঁয়ের মেয়ে, তার বাড়িটা পাঁচীলে ঘেরা, ঢোকবার বের হবার পথ মাত্র একটাই। অনুপ চুরি-চামারি করে যা পায় তার কিছু দেয় ওই মেয়েটিকে, একটু প্রেম নিবেদনের চেষ্টাও করে তবে দজ্জাল মেয়েটা তাকে পাত্তাই দেয় না।

এই সিনটা মিনিট আট দশের, কিন্তু অনুপ বিরাট মাপের অভিনেতা, গীতা দে ও তাই। কমিক সিন অনুপ গীতার পাল্লাটা জমে উঠত, ফলে দশমিনিটের সিন দাঁড়াত পনেরো-আঠারো মিনিটে। দর্শকরা আপাতত নিলেও নাটকের উপর ঘা আসতে

পারে, তাছাড়া শো টাইম বেড়ে যাওয়ায় ট্রেনের যাত্রীদের অসুবিধা। তাই দেবুদা অনুপকে বলেন

— বেশি বেড়ো না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা, গীতা থামলেও অনুপ থামে না, দর্শকরাও খুব হৈ হৈ করে অনুপের নানা কিসিমের ডায়লগ উপভোগ করছে। সেদিন আমিও থিয়েটারে গেছি, দেবুদা বলেন, একবার চলোতো স্টেজের পাশে, অনুপ যা করছে থামানো যাচ্ছে না। আজ দেখছি ওকে।

উপরের ঘর থেকে দুজনে স্টেজে নেমে আসি, দেবুদা একটা লাঠি দেখে কুড়িয়ে নিয়ে উইংসের এদিক থেকে অনুপকে দেখায়। অনুপ দেখে লাঠিধারী দেবুদা আর আমাকে। আগুনে যেন ঘি পড়ে, অনুপ আবার নতুন করে বাই ডায়ালগ শুরু করে—হৈ হৈ করছে দর্শকরা। দেবুদাও লাঠি দেখায়, নেচে কুঁদে আসর মাৎ করে অনুপ ওদিকের উইংস দিয়ে বের হতে যাবে, ওদিকে দরজা নাই, দর্শকও জানে। গীতা দে সাবধান করে—ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? অনুপের চরিত্রটা চোরের, সে বলে তোর দরজার আশপাশে দুই টিকটিকিকে দেখছি, একজন আবার লাঠি হাতে, যদি পেঁদায় তাই ওদের ফাঁকি দিয়ে এদিকের পাঁচিল টপকে পালাবো।

সুন্দরভাবে ম্যানেজ করে আমাদের এড়িয়ে ওদিকের উইংস দিয়ে বীরদর্পে বের হয়ে গেল দর্শকদের হাততালি কুড়িয়ে। স্টেজ ঘুরে ওদিকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হাসছে আর বলে—আর কখনও হবে না দেবুদা।

নাটকের অন্তরালে এমনি অনেক বিচিত্র নাটকই হত।

পঞ্চাশ রাত্রি পূর্ণ হলো। সলিলবাবু শিল্পী কলাকুশলীদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করলেন। অনুপ সুজনরা পরিবেশন করলো। মনে পড়ে গলদা চিংড়ির সাইজ, অনুপ বলে—চিল্কার মাল, চালাও দাদা।

শতরাত্রি পূর্ণ হলে মঞ্চে সেদিন পুরস্কার দেওয়া হতো সব শিল্পী, কলাকুশলী নেপথ্য কর্মীদের। পুরস্কারগুলোও মূল্যবান হত। সলিলবাবু লোকের প্রাপ্যটুকু যথাসময়ে তুলে দিতেন তাদের হাতে।

তখন মহাত্মা গান্ধী রোডে কলেজস্ট্রিটের কাছে ছিল 'নাট্যভারতী' নামে আর একটি মঞ্চ। সেখানেও অনেক ভালো নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তারাশঙ্কর বাবুর দুই পুরুষ ওখানে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। লেখকদের ওই অভিনয় রজনী হিসাবে সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হতো। শোনা যায় কোন এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক নাটকের দক্ষিণাব জন্য বলেছিলেন মালিককে।

—প্রতি অভিনয় রজনীতে একজন শিপ্‌টার কত করে পান?

মালিক বলেছিলেন—দশ-পনেরো টাকা পায় তারা প্রতি শোতে।

—তাই দেবেন।

যাইহোক সলিলবাবু আমাকে প্রতি শোর জন্য একটা রয়্যালটি দিতেন আর

মাসের শেষেই তার হিসাব করে রাখতেন। আমি দু'তিন সপ্তাহ না এলে তিনিই ফোন করে বলতেন—টাকাটা পড়ে আছে। দয়া করে আমাকে ঋণমুক্ত করে যান। এমনি সজ্জন ছিলেন তিনি।

এসবের কিছুদিন আগে আমার একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে উল্টোরথ পত্রিকায়। সলিলবাবুর মতই পত্রিকা জগতেও একটি সুজন বন্ধুকে পেয়েছিলাম। তিনি উল্টোরথ পত্রিকার প্রসাদ সিংহ।

প্রসাদবাবু ছিলেন ডাফ স্ট্রিটের সিংহ পরিবারের সন্তান। বনেদি বংশ। প্রসাদের দাদা ছিলেন তখনকার বেঙ্গল পেপার মিলের বেনিয়ান। ওর এক ভাই বিধান সরণীতে বুক এম্পোরিয়াম নামে একটি প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন।

এখান থেকেই প্রথম প্রকাশিত হয়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের প্রখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ। বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাস, আমার বইও এরা প্রকাশ করেন।

এদের ছোটভাই প্রসাদ তখন রাজাবাজারের ওদিক থেকে একটি সাহিত্যপত্র বের করতো। প্রসাদের সঙ্গে থাকত তার এক বন্ধু গিরীন সিংহ।

দুজনে একসঙ্গেই থাকতো। ওই সাহিত্যপত্রে আমরাও লিখতাম, কিন্তু সেই পত্রিকা চলেনি। প্রসাদ তখন তরুণ। আমাদের বয়সীই।

ও আর গিরীন দু'জনে বুক এম্পোরিয়ামে বসে পরিকল্পনা নিল নতুন পত্রিকা বের করার। প্রসাদ বলে—সাহিত্য করে সুবিধা হলো না—তোমরা মদত দাও। এখন পয়সাকড়ি দিতে পারবো না। তবে কথা দিচ্ছি, এ পত্রিকা যদি দাঁড়ায় তোমাদের প্রাপ্য সব মিটিয়ে দোব।

এতদিন সাহিত্যপত্র ছিল সাহিত্য নিয়েই। ওদিকে রূপাঞ্জলি, রূপমঞ্চ চলছে, তাতে সিনেমা থিয়েটারই প্রধান। প্রসাদ এবং উল্টোরথ পত্রিকায় প্রসাদ সাহিত্য আর সিনেমা দুটোকে ব্লেন্ড করে নতুন ধারা আনলো।

ওর জেদ সব সাহিত্যিকের লেখাই এতে ছাপবো। তখন বেশ কিছু প্রবীণ সাহিত্যিক হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সিনেমা পত্রিকায় লেখা দিতে কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করতেন, তাই এই রূপাঞ্জলি, রূপমঞ্চ প্রবীণ সাহিত্যিকদের লেখা থেকে বঞ্চিত হোত।

প্রসাদ এবার সাহিত্যিকদের বাড়ি বাড়ি হানা দিতে শুরু করলো লেখা দিতে হবে। তার জন্য যা প্রণামী তাঁরা চান দিতেও প্রস্তুত। তরুণ সাহিত্যিকদের এর আগেই প্রসাদ দলে টেনেছে, চাই প্রবীণদের। কোন সাহিত্যিককে চেক দিয়ে বলে—অঙ্কটা আপনি বসিয়ে নিন। লেখা দিতেই হবে।

অনেকেই লিখতে শুরু করলেন 'উল্টোরথে'। এক প্রবীণ সাহিত্যিক লেখা দেবেন না। প্রসাদ, গিরীনও নাছোড়বান্দা। দু'জনে শীতকালে জওহর কোট গায়ে দিয়ে ঘুরত। শিবরাম চক্রবর্তী বলতেন এদের—মেষ লোমাচ্ছাদিত সিংহযুগল। তিনিও

লিখছেন, প্রবীণ এক সাহিত্যিক লেখা দিতে চান না। লেখা না দিন, তিনি যোগব্যায়াম করতেন। ওরা দুটিতে সেই শীর্ণকায় নামী দামি ব্যক্তিটির আন্ডারওয়ার পরা অনাবৃত ক্ষীণ দেহের বেশ কয়েকটি যোগব্যায়ামরত ছবি তুলে তাই ছাপলেন। তারাশঙ্করবাবু তো বিব্রত। এহেন দুই বিপদজ্জনক তরুণকে শান্ত করতেই তিনি এদের পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন।

তখনও বাংলা সিনেমা ছিল সাহিত্যনির্ভর। এই উল্টোরথ পত্রিকায় প্রসাদ ছোটগল্প তো ছাপতোই, এছাড়া সেই বাংলা সাহিত্যে নভেলেট লেখার প্রচলন করে বলা যেতে পারে।

তখন পত্র-পত্রিকার এমন ঢালাও পূজা সংখ্যার প্রচলন সবে শুরু হয়েছে, আনন্দবাজার আগে শুধু দোল সংখ্যায় বিশেষ একটা বড় সংকলন করত।

ক্রমশ পূজা সংখ্যার প্রচলন হলো। তখন ওইসব সংখ্যায় একটি করেই উপন্যাস ছাপা হতো। অবশ্য সেটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসই। প্রসাদ শুরু করলো নামী লেখকদের দিয়ে ছোট আকারের উপন্যাস লেখাতে, বাস্তবে তা বড় গল্পের চেয়ে কিছু বড়। তাতে নিটোল একটা কাহিনী, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এসবও ফুটে উঠত।

আর একটি বড় উপন্যাসের বদলে চার পাঁচজন নামী লেখকের উপন্যাস পেয়ে পাঠকরাও লুফে নিলো এই নবরূপকে। সিনেমার খবর ছবি, বোম্বাই চিত্রজগতের ছবি, খবরও থাকত। তারজন্য বোম্বাই এ বিশেষ প্রতিনিধিও রাখলো। তারাও নরম গরম খবর দিতে শুরু করলো।

সবমিলিয়ে 'উল্টোরথ' ক্রমশ বাংলায় অন্যতম সর্বাধিক প্রচারিত জনপ্রিয় পত্রিকাতে পরিণত হলো এই নতুন মিক্সচারের জন্যই। সাহিত্য, সিনেমার মেল বন্ধন ঘটিয়েছিল এই পত্রিকা, প্রসাদবাবুরা এই সঙ্গে সিনেমা জগৎ নামে সিনেমার প্রাধান্য তৎসহ সাহিত্য মিশিয়ে আর একটি পত্রিকাও বের করলো।

বিবেকানন্দ রোডে নিজেদের প্রেস, অফিস সব গড়ে উঠলো। এগিয়ে এলো বেশ কিছু তরুণ রিপোর্টার, কর্মী, ফটোগ্রাফার। বড় বড় পত্রপত্রিকায়, দৈনিকে তারা ফটোগ্রাফারও হয়েছিল। চিত্রসাংবাদিক রবি বসুও এলো প্রসাদের কাছে। আজকের প্রচারবিদ শ্রীপঞ্চাননের হাতে ঘড়ি এখানেই।

এই দুই পত্রিকা থেকে সেদিন তারাশঙ্কর, সুবোধ ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, বিশ্বনাথ রায় এবং আমার বহু উপন্যাস ছায়াছবিতে গেছে। আমার মেঘেঢাকা তারা, কুমারীমন, মুক্তিস্নান, অমানুষ, উত্তর মেলেনি প্রভৃতি ছবির মূল উপন্যাস এইসব পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

তখন আমি বেলেঘাটাতে থাকি। একটা লম্বা বাড়ির একদিকে বাড়িওয়ালা আর অন্যদিকে পাঁচ ছয় খানা ঘরে ভাড়াটিয়ারা। আমি বারোঘর এক উঠান না হলেও ছয় ঘর এক উঠানের বাসিন্দা ছিলাম। দেওয়াল পাকা মাথায় টিনের ছাদ। গরমকালে বেশ আরামেই থাকতাম। রাতে টানা বারান্দাতেও অনেকে আশ্রয় নিতাম।

তখন দেশ বিভাগ হয়ে গেছে। ওপার বাংলা থেকে লাখ লাখ মানুষ সপরিবারে ছিন্নমূল হয়ে আসছে এদিকে। সারা শহর উপছে তারা শহরতলীর দিকে চলেছে আশ্রয়ের সন্ধানে।

দেশ বিভাগের পর ছিন্নমূল মানুষের ভিড় নেমেছে।

শহরতলীর জলা বাঁশবন, হোগলাবন সাফ করে তাঁবু গেড়ে ওরা দলে দলে নতুন আশ্রয় গড়ার কথা ভাবছে। দেশ মাটি ছেড়ে খড়কুটোর মতো বানের জলে ভেসে আসার বেদনা তাদের চোখেমুখে।

আমি স্বভাবতই যাযাবর ছিলাম। কোলিয়ারীর জীবনকে জানার জন্য আমিও কর্তাদের ধরে বন্ড দিয়ে দু'হাজার ফিট নীচে নেমেছি। মালকাটাদের সঙ্গে ঘুরেছি ওই মৃত্যু সুড়ঙ্গে। দেখেছি চিনাকুড়ি কোলিয়ারির ঐতিহাসিক বিস্ফোরণের রাত্রে সেই জগৎকে।

সেই অভিজ্ঞতা দিয়েই লিখেছিলাম 'কেউ ফেরে নাই'। হাজারিবাগের জঙ্গ লপাহাড়ে মাইকা মাইনস এ গেছি। পাহাড়ময় যেন ইন্দুরের গর্ত চলে গেছে। মই লাগানো সেই গর্তে। মুখে ঢোকে চূর্ণ বিচূর্ণ অভ্রকণা, সেই ভাবেই ঘুরেছি মাইনসে দিনের পরদিন। তারপর লিখেছি 'অভ্রনীল রোদ'। বনে বনে আদিবাসীদের বসতিতে থেকেছি। দেখেছি তাদের জীবনকে তারপর লিখেছিলাম 'শাল পিয়ালের বন'।

এই সর্বনাশা দেশভাগকে আমি মেনে নিতে পারিনি। আমি নিজে বিশুদ্ধ বাঁকড়ী, অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলার মানুষ। উদ্বাস্তু হবার প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু পায়ের তলের মাটি হারানোর বেদনা আমার ছিল। জন্মস্থান, পৈতৃক বাড়ি বাঁকুড়ায়। আমি মূলত মানুষ হয়েছিলাম বাবার চাকরীস্থল মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত এক গ্রামে। আমি সেই জায়গাকেই আমার জায়গা বলে জেনেছিলাম। লেখাপড়া, বন্ধুবান্ধব সব সেখানেই। একটানা চোদ্দবছর কেটেছিল সেই মাটিতে। তারপর হঠাৎ বাবার প্রমোশন হয়ে সদরে যেতে হবে, সেদিন হঠাৎ আমার পায়ের তলের মাটি সরে গেল। এতদিনের চেনা মাটিতে আর আমার কোন ঠাঁই নাই। বন্ধু বান্ধব, সেই স্বপ্নের জগৎ সব হারিয়ে গেল অদৃশ্য কোন কলমের আঁচড়ে। আমাকে চলে আসতে হলো। সেই মাটি থেকে আমি যেন উপড়ে পড়া গাছের মত বাতিল হয়ে গেলাম। সেই দিনের বেদনা আমার মনে ছিল,আজ ওই উদ্বাস্তুদের বেদনাটা তাই আমাকেও স্পর্শ করেছিল।

আমি ট্রানশিট ক্যাম্প, একোমোডেশান ক্যাম্প যেখানে হাজার হাজার ছিন্নমূল পরিবার এসে রয়েছে, সেখানেও গেছি, দেখেছি মানুষের বাঁচার নতুন সংগ্রাম। সেই ছিন্নমূল জীবনের নতুন সংগ্রামকে দেখবার জন্য দণ্ডকারণ্যের গভীর বনে পাহাড়ে, মালখান গিরি, উমরকোট, মধ্যপ্রদেশের বস্তার, জগদলপুরের অরণ্যের নয়াবসতে ঘুরছি। আমার সাহিত্যে সেই সংগ্রামের কথাও এসেছে।

তার সূচনা হয়েছিল এই চেনামুখ লেখার সময় থেকেই। আমি যে বাড়িতে থাকতাম সেখানেই দেখেছি এক পরিবারকে। বাবা বৃদ্ধ। মেয়েই সংসার চালায় কোন

রকমে চাকরি, টুইশানি করে। এক ভাই সে সরোদ নিয়েই পাগল। দিনরাত সরোদ বাজায় আর বাড়িতে গঞ্জনা খায়।

তখন কলকাতায় বড় বড় মিউজিক কনফারেন্স হতো রাত ভোর। ওই বেনুও যেত। শীতের রাত। টিকিট কেনার পয়সা নেই। বাইরে ফুটপাথে কাগজ পেতে বসে ওই হিমে গানবাজনা শুনে ভোররাতে বাড়ি ফিরেও কাউকে জাগাবার সাহস তার হত না। বাইরের রকে বসে চাদর মুড়ি দিয়ে দরজা হেলান দিয়ে ঘুমুত। আমিই সকালে দরজা খুলতে দেখি ঘুমন্ত বেনু গড়িয়ে পড়লো ভিতরে। ধড়মড় করে জেগে ওঠে সে।

সেই বাড়ির মেয়েকে মা লেখাপড়া শেখালো। একদিন সেও চলে গেল নিজের সংসারে। সেদিন সেই মাকে বলতে শুনেছি—মেয়ে কি আমাদের কথা ভাবলো? সে তো চলে গেল তার নিজের সংসারে, কি লাভ হলো আমার।

একদিন মা বাবা চাইত মেয়ের ঘর বর হোক। আজ মা চায় তাদের বাঁচাবার জন্য মেয়েও তার আশা স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিক। সেই সময় নিউ ব্যারাকপুর সদ্য গড়ে উঠেছে। তখনও বাড়িঘর দু'একটা হচ্ছে, বাকি ঝুপড়ি, তাঁবু।

সেই উদ্বাস্তু কলোনিতে যেতাম। ক্রমশ সেই নতুন জীবন যুদ্ধের পটভূমিকায় একটি পরিবারের একটি মেয়ের জীবন সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখলাম একটি উপন্যাস 'চেনামুখ'।

ভালো লেখা হলেই সেটা থাকত উল্টোরথের জন্য। বড় কলেবরের লেখা অন্য পত্রিকাতে ঠিক জুৎসই হত না। আর প্রসাদ সিংহ সাহিত্যিকদের ভালো পয়সাই দিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র মশায় বলতেন—উল্টোরথ হাটের তোলা কুড়িয়ে মন্দিরে পুজো দেয়।

তারা পয়সা তোলে সিনেমার লেখা ছবি দেখিয়ে—কিন্তু সাহিত্যিকদের বেঁচে থাকার, লেখার কাজ কবার রসদ দেয়। প্রসাদই পত্রিকার সম্পাদনা লেখা এসব দেখে, গিরীনবাবু দেখে বিজ্ঞাপন, মার্কেটিং, তখন গিরীনও নতুন গাড়ি কিনে ড্রাইভিং শিখেছে, বন্ধুদের সে গাড়িতে তুলবেই, আমরাও গিরীনকে দেখলে প্রসাদের কাছে আশ্রয় নিতাম।

প্রসাদ লেখা হাতে পেলে প্রথমদিক খানিকটা, মধ্যে খানিক শেষের দিকটা পড়ে গোঁফের ফাঁকে একটু হাসির রেশ তুলে বলত ঠিক আছে।

ও লেখা দেখে, শুনে যেন গন্ধ পেত। কখনও বলত—ত্যামন জমেনি মনে হচ্ছে।

আবার কখনও বলত—ঠিক আছে' জমেছে মনে হচ্ছে।

আর ওর একথাটা যে সত্যি তা লেখা ছাপা হলে বুঝতাম। কি করে ও একথা বলতো তা জানিনা।

চেনামুখ ছাপা হবার দিন কুড়িবার ও বললো।

—এই যে, ঋত্বিক ঘটক তোমাকে খুঁজছেন।

তখন চিত্রজগতে ঋত্বিক ঘটক একটি পরিচিত নাম। এর আগে অযান্ত্রিক, বাড়ি থেকে পালিয়ে, এ ছবি করেছেন। প্রসাদবাবু বলে—তোমার চেনামুখ পড়ে ওর ভালো লেগেছে, উনি ছবি করতে চান। শোনো, ফিলিম লাইন, নগদ যা পাও হাত পেতে নিও। তারপর তাদের ছাগল ল্যাজে কাটুক, মুড়োয় কাটুকগে।

এর আগে ছবিতে দু'একটা গল্প গেছে, একটাতে তো নামই ছিল না। অন্যটা এমন ল্যাজা মুড়োয় কাটলো যে পর্দায় আমার গল্প বলে চিনতেই পারিনি। এ আবার কি হবে কে জানে?

তবে ঋত্বিকবাবুর অযান্ত্রিক দেখেছি। ছবি তখন চলেনি। কিন্তু আমার মনকে স্পর্শ করেছিল। মনে হয়েছিল যাদের দেখেছি এ তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অত্যন্ত সাহসী, বেপরোয়া আর হৃদয়বান। না হলে একটা বাতিল যন্ত্রের বেদনায় মানুষের মনকেও আপ্লুত করাতে পারতেন না। ওর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি ফিল্ম জগতে।

তখন ঋত্বিকবাবু শংকরের কত অজানাকে নিয়ে ছবি করেছেন। ছবি বিশ্বাস ছিলেন সেই যুগের দিকপাল অভিনেতা। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। তিনিই করছেন ব্যারিষ্টার মিঃ রাওয়ের চরিত্র।

ঋত্বিকবাবু কোনরকমে টাকা পয়সার যোগাড় করে ছবি করছেন, বেলা দশটায় সুটিং, সকলে হাজির, ছবিবাবু সেটে আসেন বেলা বারোটায়, দু'ঘণ্টা রোজ সময় নষ্ট হয়।

সেদিন ও এসেছেন দেরি করে। ঋত্বিকবাবু সিগ্রেট খেতেন না, বিড়ি ফুঁকতেন ঘন ঘন। একটা দোতালার বারান্দা থেকে বারওয়েল সাহেব ডায়ালগ বলতে বলতে নেমে ফ্রেম আউট হবেন।

ঋত্বিক ছবিবাবুকে ডায়ালগটা বলিয়ে রিহার্সেল করালেন, ছবিবাবু মনিটার করে বলেন—ক্যামন হয়েছে? ফ্লোরে স্তব্ধতা নেমেছে, ছবিবাবুর উপর কথা বলার কেউ নাই, কিন্তু ঋত্বিকবাবু বলেন—কিৎসু হয়নি।

ছবিবাবুর ফর্সা রং তামাটে হয়ে ওঠে, খুব সংযত কণ্ঠে বলেন।

—তাহলে আপনি করে দেখিয়ে দিন।

ঋত্বিকবাবুর পরনে প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি। মুখের বিড়িটা ফেলে এবার ছফিট দেহ নিয়ে দোতালায় উঠে বারান্দা থেকে ডায়ালগটা বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফ্রেম আউট হলেন। ছবিবাবুর মত অভিনেতা স্তব্ধ হয়ে দেখলেন। তারপর তিনিও সেই ভাবেই নিজস্ব স্টাইলে অভিনয় করলেন। তারপর থেকে ছবিবাবু আর ঋত্বিকবাবুর সেটে কখনও দেরি করে আসতেন না। গুণী মানুষ ছবিবাবু নিজে তাই গুণীর কদর দিতে জানতেন।

এহেন দাপুটে লোক ছিলেন ঋত্বিকবাবু। তাই বলি,

—ওতো দুর্বাসা ঋষি হে!

প্রসাদবাবু বলেন—আগুন থাকলে তার তেজ থাকবে না, তা কি হয়?

এর কিছুদিন পরই ঋত্বিকবাবুর এক সহকারী এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, কথা হলো পরদিন বৈকালে আমি ঋত্বিকবাবুর ওখানে যাবো, সেখানেই এই ব্যাপারে কথা হবে, তিনি আমার 'চেনামুখ' নিয়ে ছবি করতে চান।

ঋত্বিকবাবু তখন থাকতেন গিরিশ মুখার্জি রোডে। স্যার আশুতোষের বাড়ির পিছনের অংশের একতলায় ছোট একটা ফ্ল্যাট, ঢুকেই ডানদিকে বসার মত ঘর।

সেখানেই প্রথম দেখলাম দীর্ঘ গৌরবর্ণ এক যুবককে।

সেদিনই কথা হয়ে গেল। ঋত্বিকের একটা কথা এখনও মনে পড়ে। সে বলেছিল,

—একটা ভালো গল্প থেকে ঠিক ভালো ছবি হলে তা বহুদিন বেঁচে থাকে। আজ 'মেঘে ঢাকা তারা, চল্লিশ বৎসর ধরে বেঁচে আছে।

ঋত্বিকবাবু ছিলেন দরাজ দিল লোক, মন খুলে হাসতে পারতেন। ছোট্ট বসার ঘর, কিন্তু হৃদয়টা অনেক বড়। হাঁক পাড়েন

—অজিত, একটু চা অর্গানাইজ কর।

ঋত্বিকবাবু সস্ত্রীক ওই বাড়িতে থাকেন, আর তার সহকারীদের ওখানে অবারিত দ্বার। ঋত্বিক, ওর স্ত্রী সুরমা (লক্ষ্মী) দুজনেই ছিলেন আই-পি-টি এর সঙ্গে যুক্ত। নাটক করতেন, নিজেও বেশকিছু ভালো ছোট গল্প লিখেছেন।

আমি জীবনে কিছু বড় মাপের মানুষকে দেখেছি, তাদের প্রকৃতিতে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। পণ্ডিত রবিশঙ্করের কাছে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, কাছ থেকে দেখেছি প্রখ্যাত অভিনেতা অশোককুমারকে। তাদের বলতে শুনেছি

—নিজে সম্মান পেতে গেলে অপরকে সম্মান দিতে হয়।

রবিশঙ্কর, অশোককুমারদের দেখেছি এ পক্ষ নমস্কার জানাবার আগেই ওরাই এ পক্ষের সাধারণ মানুষকে নমস্কার জানাত।

ঋত্বিকের মধ্যেও সেই জিনিসটাই দেখেছিলাম।

সম্মান দিতেন তিনিই আগে, তার সম্বন্ধে বাজারে অনেক কথাই প্রচলিত, কিন্তু দেখেছি তার অনেকটাই অতিরঞ্জিত।

তবে হ্যাঁ, তিনি ছিলেন আপোষহীন শিল্পী - মতে না মিললে প্রতিবাদ করার সাহসের অভাব তার হত না।

সেই সময় 'চেনামুখ' নামে একটা ছবি হচ্ছিল, তাই 'চেনামুখ' নামে অন্যছবি করা যাবে না। সেই কারণে অন্য নামকরণ করতে হবে। নামকরণ করলাম 'মেঘে ঢাকা তারা'।

ঋত্বিকবাবুর চিত্রনাট্যের কাজ শুরু হয়েছে, আমিও 'চেনামুখ' উপন্যাসকে নতুন করে লিখে উপন্যাস প্রকাশের জন্য দিলাম প্রকাশককে, নাম দিলাম 'মেঘে ঢাকা তারা'। এই নামেই উপন্যাস এর ছাপার কাজও শুরু হলো।

ঋত্বিকবাবু বলেন—অথর, গল্প উপন্যাস তো লিখেছো, চিত্রনাট্যটা লেখা শেখো ভালো করে, আখেরে কাজ দেবে।

এর আগে 'পথের দাবী', সীমান্তনীতে কিছু চিত্রনাট্য লেখার কাজ করেছি, হেমেনবাবুর সঙ্গেও বসেছিলাম কতরার এর বাংলা চিত্রনাট্য লেখার সময় সেগুলো ছিল ভাসা ভাসা।

এবার ঋত্বিকের সঙ্গেও বসলাম, দেখলাম ঋত্বিকবাবুর দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা, আরও বিশ্লেষণ ধর্মী। তিনি ডিটেলের কাজেও নজর দিতেন। উপন্যাসের ভাষা আলাদা।

তেমনি সেলুলয়েডেরও একটা নিজস্ব ভাষা আছে, তার প্রকাশ ক্ষমতা অনেক বেশি। তার আঙ্গিক আরও শক্তিশালী। ফিল্মে নীরবতার মধ্যেও, একটা চাহনির মধ্যেই অনেক কথা বলা যায়।

মনে হয়, এ যেন অনেক কথা যাও যে বলি, কোন কথা না বলি।

ঋত্বিকবাবুর চিত্রনাট্যে তাই আর গভীর মননের পরিস্ফুট। তার ব্যাকরণও স্বতন্ত্র। সারা নাটকে যেমন কয়েকটি অঙ্ক থাকে। প্রতিটি দৃশ্য কিছু বলবেই, শেষ হবে একটি ক্ষুদ্র পরিণতিতে, কয়েকটি দৃশ্য মিলে একটি অঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কে নাটক আরও উঠবে সম্মিলিত দৃশ্যগুলির মান সমবেত অবদানে, তৃতীয় অঙ্কে হবে শেষ পরিণতি, সেইখানেই হবে ক্লাইমেক্স।

ঋত্বিকবাবুও সমস্ত কাহিনীটাকে কয়েকটি সিকোয়েন্সে ভাগ করে নিতেন, অর্থাৎ যেন নাটকের এক একটি অঙ্ক। আর সিনগুলো হত এক একটি দৃশ্য। এই ছক করে নিয়ে দৃশ্যগুলোকে সাজানো হত সমবেত অবদানে একটি অঙ্কর পরিণতির দিকে, এমনি দু তিনটি অঙ্কের মধ্য দিয়ে নাটক এগিয়ে যেতো শেষ পরিণতির দিকে।

অফিসের পর সন্ধ্যায় চলে যেতাম ভবানীপুরে ঋত্বিকের বাড়িতে। সন্ধ্যার আড্ডা চুকিয়ে আটটার পর কাজে বসতাম। ঋত্বিকবাবু এই সিকোয়েন্স, সিন ব্রেক ডাউনগুলো ইংরেজিতে বলে যেতেন, আমি সেগুলো লিখে নিয়ে, বাড়িতে এসে সেইমত দৃশ্য-সংলাপ, ঘটনা সংস্থাপনে ভরাট করে ওকে দিতাম, উনি সেগুলো থেকে আবার নিজের মত করে লিখতেন বা সাজিয়ে নিতেন।

সেই খসড়ার কিছু কাগজ আমার কাছেও ছিল, কিন্তু ভাবিনি যে আজ সেগুলো থাকলে একটা নতুন তত্ত্ব, তথ্যকে আবিস্কার করা যেতো, সব কোথায় হারিয়ে গেছে।

তখন ঋত্বিকবাবুকে দেখেছি তরতাজা টগবগে একটি তরুণ। ঠাঠা করে হাসতে পারে। ইংরেজিতে পোস্ট গ্রাজুয়েট করেছেন, সাহিত্য ইতিহাস নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেন।

ওদের বাড়ি রাজশাহীর কোন গ্রামাঞ্চলে। বাবা ছিলেন ব্রিটিশ আমলের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খুবই সংস্কৃতিবান পরিবার ওদের। বড় দাদা প্রখ্যাত কবি, লেখক যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক) অন্য ভাই বিখ্যাত চিত্রগ্রাহক—বড়দার মেয়েই আজকের মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর স্বামী প্রখ্যাত নট-নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। এক ভাইপো প্রখ্যাত চিত্র

সাংবাদিক অবু ঘটক। ঋত্বিক-বাবুদেরও দেশ ভিটে মাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। বাবার তখন চাকরি নেই। দেখছেন ছিন্নমুল এক উৎপাটিত বনস্পতিকে। দেশবিভাগকে কোনদিনই তিনি মেনে নিতে পারেননি। এর জন্য তদানীন্তন কংগ্রেসকেও ক্ষমা করতে পারেননি। তার প্রতিবাদী চরিত্র এতবড় জাতীয় বিপর্যয়কে মেনে নিতে পারেনি। তাই দেশবিভাগের পটভূমিকায় এই সংগ্রামী জীবনের কাহিনীকে তিনি পথ বেছে নিয়েছিলেন তার ছবির জন্য।

ওই ছোট্ট ঘরে তখন বাংলার বহু নামী দামী মানুষের আনাগোনা ছিল। আসতেন কবি বিষ্ণু দে, সরোদবাদক ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ (উনি ওস্তাদ আলাউদ্দীনের ভাই এর ছেলে, শিষ্য), ডঃ বোধায়ন চট্টোপাধ্যায়, এখানে দেখলাম আবার মৃণাল সেনকে, আসতেন জ্ঞানেশ মুখুয্যে, রামকিঙ্করের ছাত্র রবি চাটুয্যে, আরও অনেককে। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতি ক্ষেত্রের অনেক ব্যক্তিত্বকে দেখেছি ওই ছোট ঘরে বসে আড্ডা জমাতে, তাপস সেনও আসতেন প্রায়।

ঋত্বিকের সান্নিধ্যে এসে আমি এক নতুন সমাজের সঙ্গে পরিচিত হলাম। রাত ৮ টা অবধি আড্ডার পর কাজে বসতাম, কাজ চলত বারোটা একটা অবধি। ওর একটা পুরোনো সিট্রয়ে গাড়ি ছিল, তার হর্ন লাগত না, রাস্তায় বেরুলে ওর গাড়ির মিস ফায়ারের ফট্ ফট্ এমন শব্দ বের হতো তাতেই হর্নের কাজ হত। ওটাকে আমরা বলতাম ঋত্বিকের অযান্ত্রিক, ওর ড্রাইভার সেই রাতে ভবানীপুর থেকে রেলেঘাটাতে পৌঁছে দিত।

'মেঘে ঢাকা তারা'র চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ হলো। নীতার ভূমিকায় নেওয়া হল সুপ্রিয়া দেবীকে (তখন সুপ্রিয়া চৌধুরী) সবে দু' একটা ছবিতে এসেছে , বার্মামুলুকে থাকত। বেশ স্মার্ট মেয়ে সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্যিক বনফুলের শ্যালিকা। তখন আম্রপালী ছবিতে অভিনয় করেছে, সুপ্রিয়াও এর মধ্যে উল্টোরথে ওই উপন্যাসটা পড়েছে। আর ক্যামেরা ম্যান, পরিচালক দীনেন গুপ্তও পড়েছেন। ওদের কথামতই ঋত্বিকবাবু উপন্যাস পড়ে পছন্দ করেন, সুপ্রিয়া নায়িকা, আর বড় ভাই শংকরের জন্য নির্বাচিত করা হলো অনিল চাটুয্যেকে, অনিল তখন উল্টোরথ, সিনেমাজগতেও সাংবাদিকতা করে। তরতাজা, সুদর্শন, দরাজদিল একটি তরুণ, সাংবাদিকতার পাশাপাশি তাজ প্রডাকশন্সের সহকারী পরিচালনার কাজও করে। অভিনেতা হবার বাসনা তখনও ছিল না তেমন ওর।

ঋত্বিক ওকেই আনলো শংকরের চরিত্রে, আর মাস্টার মশায়ের চরিত্রে নিলেন বিজন ভট্টাচার্যকে, জ্ঞানেশও রইল।

পুজোর আগেই সুটিং হবে শিলং-এ। নীতার স্যানাটোরিয়ামের দৃশ্য, শংকরের সঙ্গে দৃশ্যগুলো। অর্থাৎ ছবির শুরুতে নেওয়া হবে প্রথম দিকের নয়, ছবির শেষের দিকের ক্লাইমেক্সের দৃশ্যগুলো।

হঠাৎ শিলং যাবার দিন পাঁচ ছয় আগে ঋত্বিকের সহকারী পীযূষ গাঙ্গুলী, পুণু

দাশগুপ্ত (পরে সত্যজিৎবাবুর প্রধান সহকারী) আমার বাসায় হাজির হয়ে জানায় আপনাকে ও শিলং যেতে হবে। ঋত্বিকবাবু বললেন, কালই আপনাদের টিকিট হয়ে গেছে।

অবাক হই, পুজোর সময় তখন প্রতিবারই দেশের বাড়ি বাঁকুড়ার গ্রামে যাই, মনটা তখন সেখানে যাবার জন্য তৈরি, সব প্রোগ্রাম বাতিল করে শিলং যেতে হবে। কিন্তু উপায় নাই, ঋত্বিক বলে, —আরে শিলংটাও বেড়ানো হবে। চলুন তো!

তখনও ফারাক্কা ব্রিজ হয়নি। তখন শিলং ট্রেনে দুদিনের পথ। আমি অজিত লাহিড়ী, আর শৈলেনের সঙ্গে যাত্রা করলাম আগেই। ওরা আসছেন পরে সদলবলে।

শিয়ালদহ থেকে রাতের ট্রেনে বের হয়ে ভোরে নামলাম সাহেবগঞ্জে সেখান থেকে সক্রিগলি ঘাটে লঞ্চে পদ্মা পার হয়ে, এলাম মণিহারী ঘাটে।

পদ্মার উপর বিস্তীর্ণ আমবাগান, ঝুপড়ির হোটেল, আর বালুর উপর অস্থায়ী খড়ের চালার স্টেশন—বালুর উপর লাইনে দাঁড়িয়ে আছে গৌহাটি যাবার গাড়ি, ওখানেই গঙ্গায় স্নান সেরে ইলিশ মাছ ভাত খেয়ে ট্রেনে সওয়ারী হলাম তখন বেলা তিনটে হবে, ট্রেন ছাড়লো।

ওই মণিহারী গ্রামেই বনফুলের জন্মস্থান, ওর এক ভাই এখনও ওখানে থাকেন। কাছেই কাটিহার স্টেশন। এখন অবশ্য শিয়ালদহ থেকেই কাটিহার মণিহারী অবধি ট্রেন হয়েছে 'হাটে বাজারে' এক্সপ্রেস। সেদিন ওই অঞ্চল ছিল এখান থেকে দুর্গমই।

মিটার গেজের ট্রেন শিলিগুড়ি-আলিপুর দুয়ার, আর বঙ্গাইগাঁ—বড় পেটা—সরু পেটা পার হয়ে ট্রেন এসে পৌছাল ব্রহ্মপুত্র তীরে গৌহাটির আড়পারে। তখনও ব্রহ্মপুত্রের ব্রিজ হয়নি। বড় ডবল ডেকার স্টিমারে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে ট্যাক্সিতে এলাম গৌহাটি শিলং বাসস্ট্যান্ডে। তখন বৈকাল গড়ানোর দিকে।

এর মধ্যে পথে দুই রাত্রি একটা দিন কেটে গেছে। স্নান খাওয়াও তেমন হয়নি। বিকালেই গৌহাটি থেকে বাস ছাড়লো শিলং-এর দিকে।

কিছুটা সমতলে আসার পরই আসাম ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে ডান দিকের পাহাড় শ্রেণীর দিকে এগিয়ে চলেছি, সন্ধ্যা নামছে, ঘনবন—পাহাড় শুরু হলো। পূজার আগেই—তখন কমলালেবুর ফুল এসেছে গাছে ভিজে বাতাসে সেই ফুলের সুবাস জাগে। বুনোকলার জঙ্গল আর বাঁশবন ঢাকা পাহাড়, ক্রমশ সন্ধ্যা নামে।

তখন মাঝপথে একটা পাহাড়ী গ্রামে নীচের সব বাস গাড়ি এসে থামলো, ওদিকে উপরের সব গাড়িও। কারণ উপরের দিকে পাহাড়ী রাস্তায় একটা গাড়িই যেতে পারে। তাই উপরের সব গাড়ি এখানে থামলে, তখন নীচের গাড়িগুলোকে উপরে উঠতে দেয়। তাই 'গেট' এর ব্যবস্থা।

পরে দেখেছি উপরের রাস্তাও চওড়া হয়ে গেছে, ফলে সেই বাধা আর এখন নেই। রাত্রি আটটা নাগাদ শিলং পৌছলাম।

শিলং-এ ঋত্বিকের শ্বশুরমশায়ের রিলবং অঞ্চলে ছিল পাশাপাশি দুখানা বাড়ি,

সিমেন্টের মেঝে, কাজের ঘর। নীচে একটা ঝোরা বয়ে চলেছে ঝরঝর শব্দে, ওই বাড়িতেই উঠলাম আমরা।

তার পরের দিনই পৌঁছালো ঋত্বিকবাবুরা সদলবলে, সঙ্গে প্রডিউসারও রয়েছেন।

শিলং-এ তখন ঠাণ্ডা রয়েছে, বৃষ্টিও যখন তখন হচ্ছে, ভিজে আবহাওয়া, কুয়াশা জমে থাকে শিলং পিকে—পাইন বনে, যেন মেঘের রাজ্য, তাই বোধহয় এখন ওই প্রদেশের নাম মেঘালয়।

সেদিন সন্ধ্যায় বড় বসার ঘরে সারা ইউনিটের সকলেই রয়েছে। সুপ্রিয়া, অনিল, লক্ষ্মী বৌঠান, ক্যামেরাম্যান ছিল দীনেন গুপ্ত, কিন্তু ওর বাবা মারা যাবার জন্য আউটডোরেও যেতে পারেনি, গেছে দিলীপরঞ্জন মুখুয্যে, অজিত লাহিড়ী, (পরে পরিচালক, চলচ্চিত্র শ্রমিক নেতা) প্রধান সহকারী সমীরণ দত্ত (পরে ইনি পুনা ফিল্ম ইনস্টিট্যুউটে অধ্যাপকের পদে যোগ দেন, পরবর্তীকালে ফিল্মস্ ডিভিশনের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন) প্রযোজক অন্য সকলেই রয়েছেন। ঋত্বিক বাবু সেই সন্ধ্যায় 'মেঘে ঢাকা তারা'র সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য সকলকে শোনালেন।

তারপরই শুরু হল আসল ব্যপারটা যার সম্বন্ধে আমি অবহিত ছিলাম না।

এবার কলাকুশলী, ঋত্বিকের সহকারী মায় প্রযোজক নিজে বলেন নীতার মত একজন সংগ্রামী মেয়েকে মেরে ফেলা যাবে না, দর্শকরা এটা মেনে নেবে না। নীতাকে সংসারে সুখী করতেই হবে। এ ছবি ট্রাজেডি হতে পারবে না। একে কমেডি করতেই হবে। নীতাকে বাঁচাতে হবে, বিজয়িনীর মত সংসারে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শুনে আমি তো হতবাক।

নীতা মরতে পারে, কিন্তু আমি শেষ পর্যায়ে দেখিয়েছিলাম নীতার মত আর এক মেয়েকেই, যাকে শংকরও হঠাৎ নীতা বলেই ভাবে। জীবনের উপল বন্ধুর পথে তারা ছেঁড়া স্যান্ডেল টেনে চলে—তবু জীবনযুদ্ধে হার মানে না। নীতারা বেঁচে থাকে—সংগ্রাম করে চলে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম দর্শন ওদের মাথায় ঢোকে না, ওরা দাবী জানায় নীতাকেই বাঁচাতে হবে। উপস্থিত শিল্পী কলাকুশলীদের মধ্যে ভোট নেওয়ার সিদ্ধান্তই হলো। ভোটে দেখা গেল যতদূর মনে পড়ে সুপ্রিয়া, লক্ষ্মী বৌঠান, আমি, অনিল চাটুয্যে আর স্টিল ক্যামেরাম্যান মেজদা সান্ন্যাল ভোট দিলাম এই ভাবে শেষ করার পক্ষে। ঋত্বিকবাবু ভোট দানে বিরত থাকলেন। বাকি সব ভোটই গেল নীতাকে বাঁচাবার স্বপক্ষে আর তারাই দলে ভারী, অর্থাৎ ভোটে গৃহীত হলো নীতাকে বাঁচাতেই হবে।

আমি তো অবাক, কি করে তা হবে, তার সেটা কেমন হবে কিছু মাথায় আসছে না। ফিলিম যে এমন বস্তু তা জানা ছিল না। রাতে খাবার পর ঘরে এলাম, আমি আর অনিল থাকতাম এক ঘরে। ঋত্বিকবাবু এসে অনিলকে বলে—তুই একটু ওদিকের ঘরে যা। ওকে বিদায় করে দরজা বন্ধ করে ঋত্বিক বাবু বলেন

—শুনলেন তো সব, ব্যাপারটা কলকাতাতেই ঘটেছিল, তখন আমল দিইনি, কিন্তু প্রযোজক নিজে এসেছে, তাই আপনাকে টেনে এনেছি, এখন ওদের কথামত একটা সম্ভাব্য মিলনাত্মক কিছু লিখুন, নীতাকে বাঁচিয়ে সংসারে আনুন।

আমিও বলি—সেটা কেমন হবে?

ঋত্বিক বলে—যাচ্ছেতাই হবে।

জেনে শুনে ওই ভাবে ছবির শেষ করবেন?

ঋত্বিক বলে—না। আপনার লাস্ট সট ওই যে নীতারা মরে না। তার মত নীতারা জীবনযুদ্ধে প্রতি নিয়তই সংগ্রাম করছে ওই লাষ্ট সটের জন্যই আমি এই ছবি করবো। তাই থাকবে ছবিতে, কিন্তু এখন সেটা গোঁ ধরে থাকলে ছবিই হয়তো করবে না। তাই আপনাকে এনেছি। কমেডি এন্ড ভেবে কিছু লিখুন, আমি সেটাও স্যুট করবো এদের জন্য, আর আমাদের যা শেষ আছে সেটাও স্যুট করবো।

তারপরে ওদের দেখালে তখন এরাই বুঝবে এ ছবির মিলনাত্মক শেষ হতে পারে না। এখন সেটা এদের মাথায় ঢুকবে না। তাই একটা ওই মিলন টিলন যা হয় লিখুন।

ওরা শুটিং শুরু করলেন পর দিন থেকেই, আমি রিলবং-এর বাড়িতে বসে 'মেঘে ঢাকা তারা'র আর একপথে শেষ করার দৃশ্যগুলো ভাবছি আর লিখছি। তিন চারদিন মাথা ঠুকে বেশ একটা জমাটি মিলনাত্মক শেষ লিখলাম, নীতা বেঁচে ফিরে এলো বাড়িতে বিজয়িনীর মত। কি লিখেছিলাম তা আজ মনে নাই।

তবে এক সন্ধ্যায় প্রযোজক—কলাকুশলীদের শোনাতে তারাও খুশি। বলে,—ব্যস! এইটাই চেয়েছিলাম।

এক উৎসাহী কলাকুশলী বলে—ভবাদা (ঋত্বিকের ডাক নাম) অযান্ত্রিক, বাড়ি থেকে পালিয়ে, দুটো ফ্লপ ছবির পর দেখবে এইটাই হিট করবে। শেষটা যা হয়েছে না — একেবারে ফ্যান্টাসটিক।

ঋত্বিকবাবু মুচকে হাসেন মাত্র।

শিলং জায়গাটা সত্যিই অপূর্ব, সবুজ পাইন বন ঢাকা পাহাড়, ঝর্ণা। সেদিন সতী ফলস্ এ আমাদের শুটিং চলছে, পাহাড়ের গা বেয়ে অনেক নীচে নেমে দুটো পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঝর্ণাটা লাফিয়ে পড়ছে সেই নীচে শুটিং।

চারিদিকে উচু পাহাড়—পাইনবন একেবারে ফানেলের মত উঠে গেছে। আমরা রয়েছি বৃত্তাকার ঘেরা উঁচু পাহাড়ের নীচে, ঋত্বিক চারিদিক দেখে বলে ক্যামেরা ম্যানকে দিলীপ একটা থ্রি হানড্রেড সিক্সটি ডিগ্রী শট নিয়ে নে পাহাড়গুলোর এই নীচে থেকে।

মানুষের এক এক চোখের দৃষ্টি এক সমকোণ—অর্থাৎ নব্বুই ডিগ্রী, দুটোর দৃষ্টি, দুই সমকোণ, অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রী, এই সটটা নিতে হবে তিনশো ষাট ডিগ্রীতে। অর্থাৎ ক্যামেরাটা পুরো একটা বৃত্তাকারে চক্কর দিয়ে নীচে থেকে ওই পাহাড় বনের

একটা চক্রাকারে সট নিতে হবে।

কি দরকারে লাগতে পারে তা ঋত্বিকই জানেন, তবু তার কথামত তেমনি বৃত্তাকারে একটা শটও নেওয়া হলো। শুটিং জোনে নানা অসুবিধার মধ্যেই শট নিতে হয়। যখন তখন বৃষ্টি নামে। ফিল্ম ক্যামেরা বর্ষাতির নিচে বুকে ধরে পাহাড় ঠেলে উঠতে হয়।

ঋত্বিকবাবুর শেষের দিকে একটা নেশা তাকে চেপে ধরেছিল। কিন্তু মেঘে ঢাকা তারার সময় অনুমান ৫৮ সাল হবে, তখন কিন্তু মোটেই মদ খেতেন না। বিড়ির নেশাটা ছিল, সিগ্রেটে তার পোষাতো না, কেউ দিলেও খেতেন না। বিড়িই টানতেন।

খুবই রসিক ব্যক্তি, আমাকে বলেন অথচ খাসিয়াদের মুলুকে যাচ্ছো, খাসি ভাষায় দু'একটা শুভেচ্ছা বিনিময়ের কথা তো শিখে নেবে।

—তা সত্যি!

ঋত্বিক শেখালেন—কাঁকিয়াত ঢং! অর্থাৎ নমস্কার।

আমিও শিখছি ওদের ভাষা। ঋত্বিকের শ্বশুরের জায়গা, ওই ভাষা ও নিশ্চয়ই কিছু জানে। তারপর বলেন—ওরা বলবে ঢং! অর্থাৎ নমস্কার। তারপর বলবেন—ঢং তো সিতাং পো! অর্থাৎ আর সব কুশল তো!

আমিও খাসি ভাষার বেশ কিছু শিখে গেলাম ঋত্বিকের কাছে, শিলং এর ইয়াডিলিজ লেক বেশ সুন্দর সাজানো জায়গা। ওর কাছেই হোটেল পাইনউড, হোটেল পিক তখন বাঙ্গালির হোটেল আর পাশেই 'মারলো' বলে একটা রেস্তোরাঁ ছিল। পাইনউডে উঠেছিল সুপ্রিয়া দেবীরা। মাঝে মাঝে ওখানে যেতাম।

সেদিন রাস্তার ধারে সিগ্রেটের দোকানে এক বয়স্কা মহিলার কাছে সিগ্রেট কিনে খাসি ভাষার পুঁজি দিয়ে বলে ফেলি—কাঁকিয়াত ঢং?

মহিলাও বলেন—ঢং।

সবমিলে যাচ্ছে, তাই ফের শেষ সম্বল খাসি ভাষাটাই শোনাই।।

—ঢং তো সিতাং পো।

ভদ্রমহিলা এবার ওদিকের একটা জেরিক্যান থেকে গ্লাশে ঢালে সফেন তাজা পানীয়, তীব্র গন্ধ। সেটা কাউন্টারে রেখে বলে টু রুপিস! ফ্রেস কাঁকিয়াত।

ব্যাপার দেখে আমি তো 'থ'। কাঁকিয়াত যে ওদের প্রচলিত কড়া বদ গন্ধ ওয়ালা দেশী মদ, তা জানাছিল না।

ঋত্বিকবাবু আমাকে নিয়ে এমনি রসিকতা করবেন তাও ভাবিনি। মহিলা বলে চলেছে—টু রুপিস!

দুটো টাকা আক্কেল সেলামী দিয়ে গ্লাশের মাল গ্লাশ সমেত ফেলেই কোনরকমে পালিয়ে বাঁচি! খাসি ভাষা শিক্ষার জন্য এমন বিপদে পড়তে হবে জানা ছিল না।

কথাটা এসে ঋত্বিকবাবুকে বলতে তিনি সেই স্বভাবসিদ্ধ ঠা ঠা হাসিতে ফেটে পড়ে বলেন—সেকি! ওব্যাটা তাহলে এভাষা জানে না! আরও দু একটা খাসি ভাষা

শিখে রাখো অথর।

—আর শিখে দরকার নাই। আবার কি উল্টো পাল্টা শিখে বিপদে পড়বো।

শিলং শহরে ওই দ্রব্যের চল খুবই বেশি। পথের ধারে যত্রতত্র মেলে কাটা সুপারী আর চুন দেওয়া পানের পাতা। গুয়াপান মুখে দিলে ঠাণ্ডাতেও কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। এর সঙ্গে কাঁকিয়াত ওদের মনে হলো সকলেরই পানীয়। ওদের ভাষায়—কাঁকিয়াত ঢং মানে—কাঁকিয়াত আছে? ঢং মানে—আছে?

আর সিতাং পো মানে এক পোয়া। অর্থাৎ কাঁকিয়াত আছে তো এক পোয়া দাও।

ঋত্বিক আমাকে অবশ্য ওদের ভাষার আদ্যক্ষরই শিখিয়েছিলেন।

সেদিন এক সন্ধ্যায় পাইনউড হোটেল থেকে রিলবং-এ ফিরছি, বৃষ্টির রাত, পাহাড়ী পথে ট্যাক্সিওয়ালা তীরবেগে ছুটছে বিপজ্জনক বাঁকগুলোও তিনি বেগে নিচ্ছে। কোনমতে এসে রিলবং-এ পৌঁছালাম। পরদিন সকালেই চেরাপুঞ্জি যেতে হবে। ওই ট্যাক্সিওয়ালা বলতে সে রাজি হলো, জানালাম কাল সকাল সাতটাতে এই খানে এই বাড়িতেই চলে আসবে।

সেও জানায়—ঠিক হ্যায় সাব।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ঢালু পথে আমাদের বাংলোর দিকে চলেছি এ সাব—সাবজী,

ওর ডাকে ফিরে গেলাম, কে জানে ভাড়া দিতে কোন কম বেশি হয়েছে বোধ হয়। যেতে সে বলে—মিটার টো উঠা দিজিয়ে সাব। ওর দিকে চেয়ে দেখে অবাক হই। কাঁকিয়াতের প্রভাবে ওর চোখ নির্মীলিত, হাততুলে বাইরে মিটারটা ওঠাবার সামর্থ্যও নেই।

অনিল বলে—একি! এই যমদূতের গাড়িতে চেপে এসেছিলাম ওই পথে? গাড়ি চালাচ্ছিস কি করে?

সত্যই বিচিত্র কাণ্ডই, মিটার তুলে দিতে সে বলে

—কাল সুবে সাতবাজে আ যায়েগা, গুড নাইট সাব।

পরদিন সাতটা বেজে গেল তার দেখা নাই, চেরাপুঞ্জি যাবার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছি, আটটার সময় অন্য গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলাম। ফিরে শুনলাম সেই ট্যাক্সিওয়ালা আর আসেনি।

দু তিন দিন পর একদিন সকাল দশটা নাগাদ তাকে দেখলাম মোরেলো রেস্তোরার বাইরে গাড়ি রেখে একটা লাইটপোষ্টে হেলান দিয়ে গুয়াপান চিবুচ্ছে। ওখানের কোন লাইটপোষ্টই ফাঁকা নাই, ওই গুয়াপানের বাড়তি চুণ মুছে মুছে যেন চুণকাম করা হয়েছে। ওকে দেখে বলি—কি সাহেব, সেদিন তোমাকে রিলবংএ আসতে বলেছিলাম সকাল সাতটায় - এলেনা, শেষ অবধি অন্য গাড়ি নিয়ে গেলাম তোমার পাত্তাই নাই।

সব শুনে বলে সে—হাম্—কো বোলা সাব? কব?

—পরশুই।

—কয় বাজে?

—কেন সন্ধ্যা আটটায়, এখান থেকে রিলবং-এ নিয়ে গেলে।

তখনি, সন্ধ্যা আটটা নাগাদ।

ট্যাক্সিওয়ালা শুনে বিজ্ঞের হাসি হেসে বলে

—সাব, ইয়াদ রাখিয়ে সাম সাতবাজে কা বাদ পুরা শিলং টাউন আউট হো যাতা হ্যায়।

অর্থাৎ ওই কাঁকিয়াতের মহিমা।

শিলংএ দর্শনীয় অনেক জায়গাই আছে, অনেক ফলস্—বাগান, তার মধ্যে শিলং পিক অন্যতম। ওখানে অনেক ছবির শুটিং হত তখন, কলকাতা, বোম্বাই এর অনেক ছবির শুটিং হয়েছে শিলং তার আশপাশে, কিন্তু পরবর্তীকালে সেখানে বেশ কিছু গোলমালের জন্য এদিক থেকে কোন ইউনিট আর শুটিং করতে যায় না। ফলে আমরা অপূর্ব এক সবুজ অরণ্য, পর্বত, লেক, ঝরনার, প্রাকৃতিক পরিবেশ ছবির জগতে হারিয়ে ফেলেছি।

শিলং পিক দূরন্ত শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার। পাহাড়ের নীচেই শহর। ঘুর পথে পিকে যেতে হয় গাড়িতে, পাহাড়ের পথে দেখা যায় একটা ছোট নালার মত ঝোরার জল পাহাড়ের উপরের দিকে ঠেলে উঠে অধিত্যকায় বয়ে চলেছে। জলপ্রবাহটা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ঠেলে উঠছে উপরের দিকে, একটু অবাক লাগে, পরে দেখা গেল নিয়ম ভাঙেনি। শিলং পিকের উঁচু টপ থেকে ঝোরাটার জল যে গতিতে নীচে নেমে আসছে, পিছনের জলস্রোতের ঠেলায় সেই প্রবাহ উপরের দিকে বয়ে গিয়ে অধিত্যকায় উঠছে। তবে প্রথম দেখলে বেশ অবাকই লাগে। পথের ধারে একটা খাসিয়া মহিলার দোকানে ব্রেকফাস্ট করা হলো। কাঠের বাড়ি—পিছনে ঢালু পাহাড় গিয়ে মিশেছে গভীর অরণ্যে, কিছু মুর্গি, গরু-বাছুরও রয়েছে। তখনই ওখানে জারসী, হলস্টেন জাতীয় দুধেল গরু দেখেছিলাম। পথে যেতে বিধান রায়ের বাগান ঘেরা বাড়িও চোখে পড়েছিল।

ওখানে মেয়েরাও দেখলাম পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম পরিশ্রম করে না। সংসারের সব কাজ করেও দোকান চালায়। পালং শাক দিয়ে সবুজ মুর্গির কারি আর টোস্ট ওই দিয়েই প্রাতঃরাশ সেরে শিলং পিকে গিয়ে উঠলাম।

মাঝে খানিকটা ঘাসে ঢাকা সবুজ উপত্যকা, মাঝে মাঝে ঘন পাইন বন, শরৎকাল, নীল আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের আস্তরণ ছড়ানো, ওই পিক থেকে দেখা যায়, দূরে সিলেট যাবার রাস্তাটা পাহাড়-উপত্যকার বুকে কালো ফিতের মত চলে গেছে, সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে ভেড়ার পাল চরাচ্ছে খাসিয়া ছেলেরা।

ওই পাহাড়ের একটা পাথরে বসে নীতার দুই হাঁটুতে মুখ রেখে নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে একক একটি নির্বাসিত মানুষের প্রতীক হিসাবে একটা শট ছিল এ ছবির

সম্পদ, মেজদা সান্ন্যাল ছিলেন এক শিল্পী ফটোগ্রাফার। তিনিও এই পরিবেশে নীতার কিছু ছবি তুলেছিলেন যাকে শিল্পকর্মের মহৎ নিদর্শনই বলা যায়।

পরবর্তীকালে এই শিলং পিকে আরও একটা ছবির শুটিং এর সময় মজার ঘটনাই ঘটেছিল। সেটা শক্তি সামন্তের 'কাটি পতঙ্গ' এর শুটিং এর সময়।

মাস খানেক আগে গিয়ে সেখানে শক্তিবাবু রাজেশ খান্নাকে নিয়ে 'কাটি-পতঙ্গের' কিছু শুটিং করে এসেছেন। একটা ঘোড়ায় চেপে রাজেশের কিছু শুটিং ছিল। পরে মাস দুয়েক পর আবার গেছেন শিলং-এ বাকি পর্বের শুটিং শেষ করতে।

ঘোড়াটাকেও আনা হয়েছে, রাজেশ খান্নাকে তাতে চড়িয়ে শুটিং করা হচ্ছে, তারপর বৃষ্টি নামে ; ওখানে হঠাৎ বৃষ্টি আসে আবার চলে যায়।

কিন্তু বৃষ্টির পর শুটিং করতে গিয়ে দেখা গেল ঘোড়ার সাদা রং বৃষ্টির জলে ছাবড়া ছাবড়া হয়ে ধুয়ে গিয়ে নীচের বাদামী রং বের হয়ে পড়েছে ঠাই ঠাই।

দেখে তো অবাক, প্রডাকশন ম্যানেজার মনোজ অধিকারীকে ধর, মনোজ ধরা পড়ে জানায়—যে লোকটার সাদা ঘোড়া নেওয়া হয়েছিল আগে, সেটা মরে গেছে। তারই জোড়া একটা বাদামী ঘোড়া ছিল একই মাপের—তাকেই চুনকাম করে এনেছিলাম, কাজতো ঠিকই চলছিল—ধরাও যায়নি, যেতও না। হঠাৎ বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে চুনকাম কি করে জানব? ঠিক আছে আবার চুনকাম করিয়ে দিচ্ছি।

মেকআপম্যানকে ধরে আবার ঘোড়ার মেকআপ করিয়ে শটও নেওয়া হয়েছিল। এই ঘোড়ার মেকআপের ব্যাপারটা অবশ্য দর্শকদের কাছে ধরা পড়েনি, কারণ এটা ছিল বোম্বাইওয়ালা মেকআপম্যানের কারিগরি।

শিলং এর আশেপাশে ওখানের টি বি স্যানাটোরিয়ামে শুটিং চলছে। পূজা ঘনিয়ে আসছে, শিলংএ তখন পুলিশবাজার-লাইমুঘরা-রিলবিং-এ নানা জায়গাতে দুর্গাপূজা হত।

রিলবং অঞ্চলে বহু সিলেটের বাঙালির বসবাস, ঋত্বিকের শ্বশুরমশায় ছিলেন সিলেটের লোক। আসাম সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী, নিজেও বৈষ্ণব শাস্ত্রের সুপণ্ডিত, বিশিষ্ট সজ্জন, আমাকে খুবই স্নেহ করতেন, সারা ইউনিট বসে পাহাড়ে সুটিং করাত দিনের বেলায়। লাঞ্চ করত যেখানে যা পেত—কোন দিন ভালো হোটেলের প্যাকেট লাঞ্চ তো কোনদিন পথের ধারে খাসিয়া বস্তির দোকানের ওই পালংমুরগী পরটা —যা হয়।

আমাকে বাড়িতে ঋত্বিকবাবুর শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে খেতে হত, তাঁর বৈষ্ণব সাহিত্যের সংগ্রহ, তার আলোচনা আমি নোট করতাম, পরে সেসব আমাকে 'গৌড়জনবধূ' উত্তর চৈতন্যযুগের সামাজিক পটভূমিকায় চৈতন্যদেবের অবদান নিয়ে লেখা ওই উপন্যাস রচনার কাজে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

রিলবংএ বাঙালিদের দুর্গাপূজার একটা অঙ্গ ছিল ঘরের মা বৌদের আগমনী, দুর্গা বন্দনার গান, পূজা প্যান্ডেলেই সেই সমবেত গান হত।

—আয় গো উমা কোলে করি।

উমাকে তারা ঘরের মেয়ে বলেই কল্পনা করে গাইতেন মাতৃ স্নেহের গান, ঋত্বিকও শুনতেন ওই গান। ওই গানগুলো থেকেই মনে হয়েছিল নিপীড়িত নীতা ঘরের মেয়ে দুর্গাই, মেয়েকে দুর্গারূপে মা দেখতেন। কিন্তু ওই মাতৃস্নেহও নিষ্ঠুর বাস্তবে প্রকাশ পায়নি, অন্তরে-গুমরে মরেছে। ওই লোক সঙ্গীতের মুখড়াটাই ঋত্বিক বারবার নীতার থিম সঙ্গীতে ব্যবহার করে ব্যর্থ মাতৃ হৃদয়ের আর্তনাদকেই মুখর করে তুলেছিল কি বেদনায়। 'মেঘে ঢাকা তারায়' এর প্রয়োগ তিনি নিপুণভাবে করেছিলেন। একটি চরিত্রে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল এর জন্যই।

শিলং শহরেই প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার ভাই থাকতেন। ভূপেন বাবুর সঙ্গে তখন কলকাতায় প্রায়ই দেখা হত। শিল্পী দেবব্রত মুখুয্যের সঙ্গে ওর টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটেও যেতাম। তাই খবর পেয়ে ভূপেনবাবুর ভাইও আসতেন রিলবং-এর বাসায়, তার বাড়িতে গেছি।

পূজার সপ্তমী, অষ্টমী চলছে, ওদের শুটিং তখন সামান্য বাকি, আমাকে দেশের বাড়িতে ফিরতে হবে। নবমীর দিন ভোরে বের হলাম, বেলা এগারোটায় গৌহাটি শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে নির্জন পাহাড়ের কোলে বড় ঝাড় এয়ারপোর্ট সেখান থেকে এগারোটায় প্লেন ছাড়লে তিনটে নাগাদ দমদম পৌঁছে ট্যাক্সিতে হাওড়া গিয়ে কোলফিল্ড এক্সপ্রেস ধরতে পারলে রাত্রি নটা নাগাদ দেশের বাড়িতে পৌঁছবো নবমীর রাত্রে।

সেই মত বের হলাম গৌহাটির পান বাজারে তখন এয়ারলাইন্সের অফিস, কাছেই দুর্গাপূজা হচ্ছে, এয়ারলাইন্সের গাড়িতেই এয়ারপোর্টে এলাম, আকাশে তখন হালকা মেঘস্তর ঘনীভূত হচ্ছে, শুরু হল ঝোড়ো হাওয়া মেঘ এলো ঘনিয়ে, বৃষ্টিও নামল।

তখন ওই বিভাগে ডাকোটা প্লেনই চলতো। ঝড়ের দাপটে প্লেনটা যাতে গড়িয়ে না যায় তাই নীচের কনক্রিট পিলারের সঙ্গে আংটায় বাধা আছে। ঝড় বৃষ্টিও চলেছে, ঘোষণা করা হল প্লেন একটার আগে ছাড়বে না, দুপুরের লাঞ্চ যাত্রীদের এখানেই ক্যান্টিনেই দেওয়া হবে।

ডাকোটা প্লেনে যাত্রী বেশি ধরে না। ছোট ডাকোটা প্লেন, ত্রিশ বত্রিশ জন মত যাত্রী কে দুপুরের খাবারও দিল তারা তারপর বেলা দেড়টা নাগাদ ছাড়লো প্লেন, তখন আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে, মেঘ ভাঙ্গা রোদও পড়েছে সবুজ প্রান্তরে পাহাড়ের গায়ে।

প্লেনটা আগরতলায় একবার স্টপেজ দিয়ে সোজা দমদমে আসবে। গারো পাহাড়ের উপর দিয়ে আসছে প্লেনটা, এই প্লেনগুলো খুব উঁচু দিয়ে যেতে পারে না, ছয় সাত হাজার ফিট উপর দিয়েই যেত, তাই নীচের সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যেতো, নদী-পাহাড়-অরণ্যসীমা তারপরই মেঘে ঢেকে গেল সব, সাদা মেঘের পুঞ্জ।

এখনকার বোয়িং প্লেন উর্ধ্বাকাশে তিরিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে যাতায়াত

করে। সাধারণত ঝড়ের মেঘ, বর্ষার মেঘ ছয় সাত হাজার ফিটের মধ্যেই থাকে। তাই ডাকোটা প্লেনে ঝাকানি, ঝটকা বেশি লাগে। কিন্তু বোয়িং ৭৩৭, বোয়িং ৭৩৪, ৭৪৫ এগুলোর ভেতরে এয়ার প্রেসার কনট্রোল থাকে, আর ওই উচ্চতায় এই সব মেঘের উৎপাত অনেক কম। তাই এসব প্লেনে যাত্রা অনেক আরামদায়ক।

আমাদের প্লেন ঝটকা খেতে খেতে এগোচ্ছে, পাইলট জানালেন আগরতলার আবহাওয়া খুবই খারাপ, ওখানে প্লেন নামতে পারবে না। আমরা সোজা দমদম চলেছি।

আগরতলার যাত্রীদের মাথায় হাত, আমরা খুশি। আমি তো ঘড়ি দেখছি, এখনও যদি দমদমে নামতে পারি কোন মতে চেষ্টা করলে কোন এক্সপ্রেস ট্রেনে আটটা নাগাদ দুর্গাপুরে পৌঁছতে পারব। সেখান থেকে কোনমতে বাড়ি যাবোই যত রাত হোক।

প্লেন দমদমের দিকে চলেছে। নৈহাটির কাছাকাছি এসেছি মনে হচ্ছে, রেল লাইন দেখা যাচ্ছে, ঘরবাড়িও, তারপর হঠাৎ মেঘে সব ঢেকে গেল। লালবাতি জ্বলে ওঠে সিট বেল্ট বাধুন।

শুরু হলো প্লেনের সঙ্গে মেঘের যুদ্ধ, কখন প্লেনটা ঠেলে উপরের দিকে ওঠে মেঘের বেড়া জাল থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করছে, মেঘের যেন শেষ নেই, আবার নামছে সটান নীচের দিকে।

মেঘের চাবুক যেন সাপটাচ্ছে প্লেনের গায়ে, বেশ কিছুক্ষণ ঝাপটি ঝাপটি খেয়ে প্লেনটা এবার রণে ভঙ্গ দিয়ে সটান উত্তর মুখে দৌড়লো দমদমের নিশানা ছেড়ে।

এয়ার হোস্টেস বলে —আমরা দমদমেও নামতে পারলাম না, চলেছি শিলিগুড়ির কাছে বাগডোগড়ার দিকে, সেখানেই নামবো।

বলি— সেখানেও যদি মেঘের দাপট থাকে তাহলে?

হেসে অভয় দেয় সে—ভয় নাই, আমাদের যা পেট্রল আছে, তাতে বামরৌলি অবদি যেতে পারবো।

রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে প্লেন। এদিকে আকাশ পরিষ্কার, অন্ধকার নেমেছে, নীচে কোন জনপদের আলোও দেখা যায়। ওরা শান্তিতে পূজার উৎসব উপভোগ করছে আর আমরা তারা খেয়ে আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছি নিরাপদ মাটির সন্ধানে।

তখন বাগডোগরা এয়ারপোর্ট ঠিকমত তৈরি হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উত্তর বাংলায় আলুয়াবাড়ি, বাগডোগরা, জলপাইগুড়ির কাছে পাঙ্খা কুচবিহার-এ কিছু এয়ার স্ট্রিপ তৈরি হয়েছিল।

বাগডোগরা ছিল নির্জন প্রান্তরে, ওদিকে চা-বাগান, তরাই এর গভীর অরণ্য, প্রান্তরে লম্বা লম্বা ঘাস—তার মাঝে একটি রানওয়ে আর এর একটা হলঘর, টয়লেট এই নিয়েই সব।

আমাদের প্লেন ওই নির্জন প্রান্তরে নামলো। তার আগে দেখি আরও গোটা চারেক প্লেন যাত্রী সহ এসে নেমেছে তাড়া খেয়ে, পরে আরও একটা ডাকোটা

নামলো এখানে। সেও তাড়া খাওয়া প্লেন, ছোট হলে তখনও পাঁচটা প্লেনের শ'দেড়েক যাত্রী বিমান কর্মচারী, এয়ার্ হোসট্রেস্ ক'জনও রয়েছে।

শরতের মাঝামাঝি ওখানে ঠাণ্ডাও রয়েছে। প্লেন থেকে কম্বলও দিল। আর যে গাড়িটা ছিল সেটা পাঠানো হলো শিলিগুড়ি শহরে প্রায় শ'দুয়েক লোককে রাতের খাবার কিছু দিতে হবে তো। এখানে এই প্রান্তরে কিছুই মেলে না। বলে দেওয়া হল টারমিনাল বিলডিং এর বাইরে কেউ যাবেন না। রাতে হিংস্র জন্তু জানোয়ারও আসে এদিকে।

আবার একটা প্লেন কে দেখা গেল আকাশে, এখানে আর ঠাঁই নাই।

তাকে পাঠানো হলো পশ্চিম বাংলায় আসানসোলের কাছে নিগা তয়ারষ্ট্রিপে নামার নির্দেশ দিয়ে। মনে হলো আমাদের প্লেনকে যদি এখানে না পাঠিয়ে নিগাতে পাঠাত কাল সকালেই বাড়ি যেতাম, তা'হবার নয়।

নবমীর রাত্রিবাস করতে হবে এই প্রান্তরে, খাবার এসেছে। খিদে লেগেছিল। খাবার বলতে ভাত আর ডিমের কারী।

রাত ভোর হলো। জেগে উঠলো হিমালয়ের বিশাল রূপ। তবু প্লেন ছাড়ছে না। দমদম থেকে ইঞ্জিনিয়ার এসে প্রতিটি প্লেন চেক করে দেখে তবে ছাড়বে। কারণ সব প্লেনই ঝড়ে পড়েছিল। সব ঠিক আছে কিনা তাই দেখা দরকার। যাহোক আটটা নাগাদ দমদম থেকে একটা প্লেন গেল। চেকিং করে এক একটা প্লেন ছাড়া হচ্ছে।

আমাদের প্লেন ছাড়বে। যাত্রীদের উঠতে বলা হয়েছে। যাচ্ছি, পিছনে কার ডাক শুনে বিরক্ত হয়ে চাইলাম, কাল ভোরে শিলং থেকে বের হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছি। ঝড়ের কবল থেকে কোনমতে বেঁচে ফিরছি। আবার পিছুডাক শুনে বিরক্ত হয়ে চাইলাম, একটি তরুণ বলে

—দাদা, দমদম এয়ারপোর্টে নেমে দেখবেন কালীঘাট থেকে কন্যাপক্ষের লোক এসেছে। ওদের বলবেন কাল বিয়েতে যেতে পারিনি। বাগডোগরাতে আটকে আছি, পরের প্লেনেই আসছি, ওদের বলে দেবেন পাত্র আসছে।

হাসিও পায় পাত্র বেচারাকে দেখে। তিনিও গৌহাটি থেকে আসছেন। গত সন্ধ্যায় ছিল বিয়ের লগ্ন। শ্রীমান্ লগ্নভ্রষ্ট হয়ে পড়ে আছে রাতভোর এই প্রান্তরে। বলি,—ঠিক আছে, ওদের বলে দেব।

এবার নিরাপদেই নামলাম দমদমে। কন্যাপক্ষও ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে। তাদের সুখবর দিয়ে ছুটলাম ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়ার দিকে। বাড়ির সকলে দেশে, কলকাতার বাড়ি, বন্ধ, দুদিন স্নান খাওয়া নাই। বেলা তিনটে নাগাদ বিজয়াদশমীর দিন বাড়ি পৌঁছালাম, চেহারা তখন ঝোড়ো কাকের মত, গালে দাড়ি গজিয়ে গেছে।

ওরা শুটিং করে ফিরেছে। পুজোর পর এবার গান রেকর্ডিং করে নিতে হবে। মেঘে ঢাকা তারার সঙ্গীত পরিচালক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তিনি তখন দিল্লির সঙ্গীত নাটক একাডেমীতে, আসতে পারছেন না।

ঋত্বিক বলে—নিজেকেই করতে হবে।

ঋত্বিক এর মধ্যে সরোদ কিনে বাহাদুর খাঁয়ের কাছে তালিম নিচ্ছে। নিজেও বাজাচ্ছে প্রতিদিন। ও যখন যেটা ধরত সেটাকেই নিয়ে পড়ে থাকত। এখন সরোদ নিয়ে পড়েছে।

কিন্তু ওর গানের ব্যাপারে একটা অত্যন্ত সুরগ্রাহী মন ছিল। নিজেও রেকর্ডপ্লেয়ারে ক্লাসিক্যাল গান শুনতো তন্ময় হয়ে। বলত—ওই সুর মনের সৃজনধর্মিতাকে বাড়ায়। মনে নতুন বিচিত্র অনেক অনুভূতির প্রকাশ আনে।

তখন আমি বেলেঘাটাতে থাকি। তখন কলকাতায় বড় বড় ক্লাসিক্যাল গানের অনুষ্ঠান হত। সদারং সঙ্গীত সম্মেলন, এল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স। ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স, শহরতলীতেও দু'একটা সঙ্গীত সম্মেলন হত। উত্তর কলিকাতা মিউজিক কনফারেন্স, পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রভৃতি বেশ কিছু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন হত।

আমি, দেবু (শিল্পী দেবব্রত) ওই পূর্ব কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। চার রাত্রি ধরে এই অনুষ্ঠান হত। নবমিলন ক্লাব আর মোহনদার প্রচেষ্টাতেই এটা হত। সেই অনুষ্ঠানে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাই অংশ নিতেন। কলকাতার তারাপদ ভট্টাচার্য, এ কানন, বাইরের পণ্ডিত ওঙ্কার নাথ ঠাকুর বিনায়করাও পটবর্দ্ধন ওস্তাদ আমীর খান, বড়ে গোলাম আলি, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, হীরাবাঈ বরোদবকর, গাঙ্গুবাই হাঙ্গল, ওস্তাদ আলি আকবর খা, পণ্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ আল্লারাখা, পণ্ডিত কিষেণ মহারাজ, শান্তাপ্রসাদ, মহাপুরুষ মিশ্র আরও অনেকেই এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। আমি ছিলাম প্রোগ্রাম সেক্রেটারি। ওই শিল্পীদের সঙ্গে আমাকেই যোগাযোগ করতে হত। ফলে এদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল। আমি বাঁকুড়ার মানুষ। তখন বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুরী ঘরওয়ানার গানের প্রচলন ছিল গ্রামাঞ্চলে। তখন জীবন সংগ্রাম এত তীব্রতর হয়ে ওঠেনি, মানুষের চাহিদাও এত বড় বাড়েনি।

ফলে গ্রামের মানুষ শান্তিতেই ছিল। বাঁকুড়ার জ্ঞান গোস্বামী, বিষ্ণুপুরের আরও অনেক বড় গাইয়ে ছিলেন, গ্রামেও সঙ্গীতের চর্চা ছিল, অবসর সময়ে তখন রাজনীতির দাঁও প্যাঁচ না মেরে অনেকেই পাখোয়াজে ময়দা লাগিয়ে বসে যেতো ধ্রুপদ সঙ্গীত গাইতে। সঙ্গীতজ্ঞদের সম্মানও ছিল।

কোন বিয়ে বাড়িতে পাত্রপক্ষ, কন্যাপক্ষও স্থানীয় গাইয়েদের সম্মান দিয়ে ডেকে এনে আসর বসাতেন বিয়ের রাতে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাল্লাপাল্লিই শুরু হত।

সেই পরিবেশে মানুষ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনার কান ছিল, কিছু বোঝার চেষ্টাও করতাম। তারপর কলকাতায় এই সঙ্গীতশিল্পীদের সান্নিধ্যে এসে কিছুটা ধারণা জন্মেছিল।

এ. কাননের সঙ্গে বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল। একটা আড্ডাতেও আমরা জমায়েত হতাম ভবানীপুরে। ভীমসেন যোশী প্রথম আসছেন কলকাতায় তখনও তাকে নিয়ে

গেলাম আমাদের কনফারেন্সে। অনুমান ৫৭ সাল, প্রণামী দিয়েছিলাম মাত্র তিনশো টাকা। পণ্ডিতজী তাতেই খুশি। টাকার লোভ তাঁর ছিল না। তারপর থেকে ভীমসেন যোশীও আমাদের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে একদিন রবীন্দ্রদিবস আর একদিন নাটক করা হত। রবীন্দ্রদিবসে জর্জ দেবব্রত বিশ্বাস, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতি অংশ নিতেন। নাটকও করতেন শিশির ভাদুড়ী মশায়, শম্ভু মিত্রের দল, উৎপলবাবুর দল, কখনও বিজনবাবুর দল, শিশির ভাদুড়ী মশায়ের থিয়েটার তখন বন্ধ, তবু তার সম্প্রদায় নিয়ে সেবার 'মধুসূদন' করানো হচ্ছে।

বয়স হয়ে গেছে। চোখেও কম দেখেন। তবু দেখেছি মঞ্চে উঠলে সেই জরাভরি কাটিয়ে নতুন এক সত্ত্বা তার মধ্যে জেগে উঠত। থিয়েটারের রিকুইজিশানে দু'একটা বিলেতী মদের খালি বোতল লাগবে। আমাদের কোন উৎসাহী সভ্য বলে ওঠে—খালি স্কচের বোতল যোগাড় হয়ে যাবে।

শিশিরবাবু হাসতে হাসতে বলেন—তাহলে এখানেও রসিকজনের অভাব নেই দেখছি। বুঝলে যখন এর দাম ছিল সাত টাকা তখন এই ভদ্রসন্তান মদ্যপান শুরু করেছিলেন, পরে যখন সত্তর টাকা উঠলো তখন তিনি মদ্যপান করা ছেড়ে দিলেন।

সে সময় শিশিরবাবু থাকতেন আজকের সিঁথির মোড়ে সার্কাস ময়দানের উত্তর প্রান্তে একটা জরাজীর্ণ দোতলা বাড়িতে। সেখানেও প্রায় যেতাম। একটি তেজস্বী ব্রাহ্মণ, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তেমনি আত্মস্মান বোধ, করো তাবেদরী করতে পারতেন না। স্পষ্টবাদী ব্যক্তি, তার প্রতিভার যোগ্যমুল্য তিনি পাননি।

শোনা যায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় মশায় স্বাধীনতা লাভের পর শিশির বাবুকে দিয়ে একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ খোলার কথা ভেবে ওকে আলোচনায় ডেকেছিলেন।

দু'ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা হয়েছিল ডাক্তারীর বিষয় নিয়েই, আর শিশিরবাবুর সেই সারগর্ভ আলোচনা শুনেছিলেন বিধানবাবু মুগ্ধ হয়ে। শিশিরবাবুর রঙ্গমঞ্চের ব্যাপারে যে কোন কারণেই হোক সম্মতি দেননি।

পরে রবীন্দ্রভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়, শিশিরবাবু তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তার কঠিন ব্যক্তিত্বের জন্যই তিনি দুঃখ বরণ করেছিলেন। তবু মাথা নীচু করেননি।

মাঝে মাঝে তিনি আসতেন পাঁচ নম্বর বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিটে, দেবুর প্রকাশনা অফিসে। পুরো নাম দেবকুমার বসু। তরুণ, আমাদের শিল্পী দেবু মুখুয্যের চ্যালা। তাই আমরা ওকে বলতাম ছোট দেবু।

বই প্রকাশ, বই এর ব্যবসার চেয়ে সাংস্কৃতির ক্ষেত্রের একনিষ্ঠ কর্মী বলেই বেশি পরিচিত। সারা বাংলার উদীয়মান কবি সাহিত্যিকদের একান্ত বন্ধু, তাদের বই-ই প্রকাশ করে।

এই পাঁচ নম্বর বাড়িটা কলেজ স্কোয়ারের পূর্বদিকে, ঐ তহাসিক বাড়ি, ওখানেই ছিল শ্রীঅরবিন্দের পত্রিকার অফিস। পণ্ডিচেরী যাবার আগে ওই বাড়িতেই তিনি

বসতেন। সেই বাড়ির একতলার ঘরে আসতেন শিশিরবাবু। বহু তরুণ প্রতিভাবান শিল্পীদের সমাবেশ হতো। ওখানে দেখতাম করুণা মুখোপাধ্যায়কে (পরে পথের পাঁচালীর হরিহরের স্ত্রী) দেখেছি আজকের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে উনি শিশিরবাবুর কাছে আসতেন, অভিনয়, আবৃত্তি নিয়ে আলোচনা হত।

সৌমিত্রবাবু কবিতা লেখা শুরু করেছেন, আর তাই বই পাড়ার আড্ডায় আসতেন। আসতেন শিশির ভাদুড়ী মশায়ের কাছে অভিনয়ের পাঠ নিতে। সৌমিত্রবাবুর অভিনয়ে তাই শিশিরবাবুর কিছু প্রভাব দেখা যায়। তাই তিনি একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

যা বলছিলাম, বেলেঘাটার সাংস্কৃতিক উৎসবের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন হেম নস্কর মশাই। আজকের জমিদার তারা। হেমবাবু তখন বন মন্ত্রী।

কিন্তু পাড়াতে তিনি আমাদের কাছে পরম স্নেহশীল কাকাবাবু। বনেদী পরিবার, বিশাল বসার ঘর, ঢালাও অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা। চা-তৎসহ চারচৌকা সাইজের ছোট আকারের মিষ্টি পান।

সকলের জন্য অবারিত দ্বার। মন্ত্রিত্বের প্রটোকল বলে কিছুই তিনি জানতেন না। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল পাশের বস্তির কেষ্ট। বাল্যবন্ধুত্ব বয়সকালেও ছিল অক্ষুণ্ণ।

আমাদের সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনিই। মন্ত্রী হিসাবে কিছু সাহায্যের কথা বললে স্বচ্ছ স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে বলতেন

—মন্ত্রী! তাহলে শোন, কচ্ছপ জানিস? বেলা দশটায় আমরা মন্ত্রীরা রাইটার্সে যাই। বিধানবাবু আমাদের ধরে চিৎ করে দেন। কচ্ছপকে চিৎ করে দিলে আর তার করার কিছুই নাই। চিৎ হয়ে পড়ে শুধু হাত পা নাড়ে, আবার পাঁচটার সময় আমাদের উপুড় করে দেন,আমরা গুটি গুটি বাড়ি ফিরে আসি। আমাদের এছাড়া আর করার কিছুই নাই।

তবু তার কথাতেই এখান ওখানের কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা সাহায্য পেতাম সেদিনের জনসাধরণও এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্য করতেন।

তারপর রাজনীতির দাদারা—তস্য মস্তান বাহিনী যখন মাথা তুললো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের ব্যয়টা সব তারাই লুটে নিলেন। এসব অনুষ্ঠানও সব বন্ধ হয়ে গেল কলকাতার বুকে। শুরু হলো মিটিং মিছিল, আন্দোলন, সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশকেই সমাজের বুক থেকে মিলিয়ে গেল, তাকে তাড়ানো হলো।

কিন্তু বাতাসে যেমন শূন্যতা থাকে না। ঝড়ের বেগে বাতাস আসে সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করতে। তেমনি বাংলা, তথা ভারতীয় সংস্কৃতির এই শূন্যতাকে পূর্ণ করতে চলে এলো আজকের উগ্র বিদেশীদের বিকৃত সংস্কৃতি। তাকে পরের প্রজন্ম বুকে টেনে নিয়েছে। সেদিনের সেই সাংস্কৃতিক বাতাবরণ আজ বিকৃতিতে ভরে গেছে। দুটো যুগকে দেখে এটাই মনে হয়েছে।

শিশির ভাদুড়ী মশায়ের নাটকের একটা বিশাল সংখ্যার দর্শক ছিল। অনেকদিন

মধুসূদন করছেন। সেদিন আমাদের প্যান্ডেলের সব সিট পূর্ণ, বহু লোক টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ, বিশাল প্যান্ডেলও পূর্ণ কানায় কানায় তার অভিনয় দেখতে।

হেম নস্কর মশায় তার সহচর কেষ্টকেও নিয়ে এসেছেন। তিনিই কর্মকর্তা। গ্রীণ রুম শিশিরবাবু মেক আপ করছেন, আমরা কয়েকজন রয়েছি, হেমবাবু কুণ্ঠাভরে ঢুকে নমস্কার করে অধীন—কেমন আছেন ভাদুড়ি মশাই, সব কুশল তো! চলি।

শিশিরবাবু হেমবাবুকে দেখে বলে উঠেন

—আরে পালাচ্ছেন কেন হেম বাবু? বসুন—

—বুঝলে চিরকাল অধমর্ণই উত্তমর্ণকে দেখে পালায়। আর হেমবাবুর ব্যাপার দেখেছো! উত্তমর্ণই অধমর্ণকে দেখে পালাচ্ছেন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না। হেমবাবু বলেন।

—কি বলছেন ছেলেদের সামনে। থাক—ওসব কথা!

—থাকবে কেন? এরা শুনুক। তারপর শিশিরবাবুই রসহ্যটা পরিষ্কার করেন বুঝলে, এই অধম ওর মধুপুরের বাড়িতে বায়ুপরিবর্তনের জন্য ছ'মাসের জন্য ভাড়া নিয়েছিল। মাসিক ছ'শো টাকা ভাড়ার কথা বলে। আজ অবধি কিন্তু আমি এক পয়সাও ভাড়া বাবদ দিইনি। অধমর্ণ ওকেই সমীহ করবে, তা নয় উনিই অধমর্ণকে দেখে পালাচ্ছেন।

নাটক চলছে।

প্রথম সারিতে বসে হেমবাবু, আমাদের ডেকে বসান।

—তোদের এই এক রাত্রের আলো, বিজ্ঞাপন, ভলেন্টীয়ারদের খাবার, চা এসবের কত খরচ পড়ে? ঠিক করে বলবি কিন্তু!

আমরা মোটামুটি একটা হিসাব করে জানালাম—প্রায় হাজার বারোশো টাকা পড়বে।

হেমবাবু বলেন—আজ গেটসেল তো ফুল, পুলিশ এসে ভিড় হটিয়েছে। গেট সেল মোট কত হয়েছে?

—প্রায় হাজার চারেক টাকা হয়েছে।

হেমবাবু এবার পাঞ্জাবীর নীচের ফতুয়ার পকেট থেকে গুনে গুনে হাজার টাকা বের করে আমাদের হাতে দিয়ে বলেন।

—তোদের আজকের খরচার টাকা আমি দিলাম। তোরা শিশির বাবুকে নাটকের জন্য যা দিয়েছিস। তাছাড়া আজকের গেট সেলের পুরো টাকাটা ওকে দিয়ে দে প্রণামী হিসাবে। উনি এখন খুব অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন।

আমরা জানি দরকার হলে পরেও কাকাবাবুর কাছ থেকে টাকা মিলবে। তাছাড়া ওর শিশিরবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখে আমরাও মুগ্ধ। বলি,

—তাই হবে, পুরো টাকাটাই ওকে দিচ্ছি।

বাধা দেন হেমবাবু—খবরদার, আমি থাকতে একদম ওসব করবি না। উনি

তাহলে আমারই ছেরাদ্দ করে দেবেন। একেবারে দুর্বাসা মুনি। আমি চলে যাই, পরে ওসব দিবি।

অভিনয়ের পর শিশির বাবুকে কমিটির পক্ষ থেকে প্রণাম করে টাকাটা দিতেই উনি প্রশ্ন করেন—হেমবাবু কোথায়?

জানাই—ওর শরীরটা ভালো নেই, আগেই চলে গেছেন।

আমাদের সমবেত অনুরোধেই কুণ্ঠার সঙ্গে বলেন—ঋষি, এরা কি দিতে চাইছে নাও।

শিশিরবাবু টাকা নিতেন না। তার পকেটেও টাকা দেখিনি। থাকত কয়েকটা চুরুট আর দেশলাই।

আমাদের শ্রদ্ধার প্রণামী উনি ফিরিয়ে দিতে পারেননি। কিন্তু বোম্বাই থেকে পৃথ্বীরাজকাপুর (রাজকাপুরের বাবা) তার পৃথ্বী থিয়েটার নিয়ে কলকাতায় অভিনয় করতে এসে দর্শকদের কাছ থেকে শিশিরবাবুকে দেবার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে নিজে দিতে এসেছিলেন সিঁথির ওই বাড়িতে।

শিশিরবাবু তখন খুবই অর্থাভাবে রয়েছেন। তার কানে উঠেছিল পৃথ্বীরাজ কাপুরের এই অর্থসংগ্রহের কথা। সেই টাকা যখন দিতে এসেছিলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, শিশিরবাবু সেই অর্থ গ্রহণ করেননি, তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

'মেঘে ঢাকা তারা'র সঙ্গীত গ্রহণের ব্যাপারটা ঋত্বিককেই করতে হবে। আমিই নিয়ে গেলাম একে এ. কাননের কাছে। কানন তখন রাসবিহারী এভিন্যুতে থাকে। ঋত্বিকবাবু একে সঙ্গীতের ব্যাপারটায় কি কি তার দরকার বুঝিয়ে বললেন। একটা ছেলে সরগাম শেখা থেকে ক'বছরে নিপুণ শিল্পীতে পরিণত হবে এই ক্রমটা চাই। আর কি কি রাগ রাগিণী কোথায় কতটুকু থাকবে তাও জানিয়ে ভোরের রাগ রাগিণী কিছু কিছু গাইতে বল্লেন। ভৈরো, বৈরাগী ভৈরী, মৌনপুরী নানা সুরই গাইছে কানন, ঋত্বিকবাবু তার কিছু কিছু জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে, কানন তার নোট রাখে।

আর বীভৎস রাগ হিসাবে রাখলেন 'মারোয়া' জীবনের করুণতম মুহূর্তে—যেখানে বোনের প্রেমপত্র বলে ধরতে গিয়ে আবিষ্কার করে তার টিবি রোগ—সেখানে ওই 'মারোয়ার' প্রয়োগ করেছেন ঋত্বিকবাবু। এছাড়া প্রধান সঙ্গীত ছিল 'হংসধ্বনি'তে—'লাগিলগন'।

এর পর রয়েছে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' তখন জর্জদার উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত খুবই জনপ্রিয়। জর্জদা আমাদের কাছের মানুষ। এর আগে ফিল্মে কণ্ঠ দেননি। তাঁকে দিয়েই গাওয়াতে হবে।

ঋত্বিক বলে—আমি যাব না প্রথমে, আপনি গিয়ে কথা বলুন। ঋত্বিক গাড়িতে বসে রইল। আমিই গেলাম ওর দোতালার ঘরে।

—আসো! জর্জদা খাস বরিশালী ভাষাতেই কথা বলতেন। নিজে বিয়ে থা করেননি। গান নিয়েই থাকেন। অবশ্য এল-আই-সিতে চাকরি একটা করতেনও। ওকে

ওই গানটা গাওয়ার জন্য বলতে জর্জদা বলেন,

—ছাদ্দের গান আমি গামু না।

ওই গানটা কোন শ্রাদ্ধ বাসরে গাওয়া হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে ওই গানটির একটি ব্যাখ্যা করেছিলেন—যার মূল তত্ত্ব এই যে সর্বনাশের মধ্য দিয়েই সেই পরম দেবতার আবির্ভাব ঘটে। আমি সেই কথা বলতে জর্জদা বলেন।

—তুমি কইয়া যাও, আর আমি ঘরের মাইয়াগোর মত শুইনা যাই। জানাই—এ আমার ব্যাখ্যা নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই গানের এই ব্যাখ্যা করেছেন তার 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে।

তখন জর্জদা বলেন—দেখাইতে পারবা? যদি সেই ব্যাখ্যা উনি কইরা থাকেন তয় আমি এই গান গামু।

ঠিক আছে। কালই দেখাবো বই এনে।

ফিরে এলাম গাড়িতে। ঋত্বিক সব খুলে বলে—তাহলে কাল আসা যাক।

এবার সেই বইটা জর্জদাকে দিতে জর্জদা দেখে বলেন,

—ঠিক আছে, গামু। তয় হেই ভবা কোথায়? তোমাগোর ডিরেক্টার!

দেখাই—ওই যে রাস্তায় গাড়িতে বসে আছে।

—ডাক অরে!

কথাবার্তা হয়ে গেল। গানটার প্রথম দিকে জর্জদাই শুরু করবেন—পরের অন্তরা থেকে গলা দেবে গীতা ঘটক। সেও ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়।

গান রেকর্ডিং হচ্ছে নিউ থিয়েটার্স এর স্কোরিং এ রাত্রি বেলায়। এর আগে ঋত্বিকবাবু টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও স্কোরিং-এ একরাতে 'অযান্ত্রিকের' রেকর্ডিং করতে গিয়ে এক কান্ড বাধিয়েছিলেন। অযান্ত্রিকের মিউজিক ডিরেক্টার ছিলেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ।

রাতে রেকর্ডিং হবে। নিস্তব্ধ পরিবেশ। সরোদ নিয়ে বসেছেন খাঁসাহেব। ঝালা বাজাচ্ছেন। ঋত্বিকবাবু সরোদের খুবই ভক্ত। এই বাদ্যযন্ত্রটা নিজেও বাজাতেন তার ছবিতে সরোদের প্রয়োগ বেশিই করেছেন। মুগ্ধশ্রোতার মত ঋত্বিক বাবু বলেন—ওস্তাদ জী ঝালা কতরকম?

আঠারো রকম তো বটেই, ওগুলো বেশি প্রচলিত। এছাড়াও আছে শুনবেন?

ব্যাস! মুগ্ধ শ্রোতাদের নিয়ে এবার খাঁসাহেব সরোদের বাজনা শুরু করলেন। আঠারো রকম ঝালা বাজানো হলো—দেখা গেল কোনদিকে রাত শেষ হয়ে গেছে। ছয় সাতঘণ্টা কেটে গেছে। রেকর্ডিং আর করার কথা কারো মনে পড়েনি। ঝালা বাজিয়েই রাত কাবার করেছেন ওরা।

এবার তা হলে চলবে না। মিউজিক ডিরেক্টার জ্যোতিরীন্দ্রবাবু নাই। ঋত্বিকই টেক করছে। গাইছে কানন, সঙ্গে তবলায় রয়েছে মহাপুরুষ মিশ্র। ওর পিসগুলো সুন্দর ভাবে রেকর্ডিং করা হলো। জর্জদা ততক্ষণে এসে গেছেন—গীতা ঘটকও।

জর্জদা গাইতে বসলেন, ওই সুরের আসরে এ কাননও বসে গেল স্বরমণ্ডল নিয়ে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহাপুরুষও বসে গেল। এক সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ক্লাসিক—রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের সমবেত প্রচেষ্টায় মিউজিক রেকর্ডিং হয়ে গেল ঋত্বিকের সঙ্গীত পরিচালনায়। পরে এসেছিলেন জ্যোতিরীন্দ্রবাবু, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করার সময় এই আসরে আর মান পড়ে আর এক লোকশিল্পীও ছিলেন বোধ হয় সিলেটের বামন চৌধুরী। তিনি গেয়েছিলেন,

—কান্দিয়া আকুল হইলাম ভবনদীর তীরে

মম, তরে কেবা পার করে"

এর সঙ্গে বিখ্যাত তবলিয়া মহাপুরুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তবলায় বসেছিল। এই তালমেল—শিল্পীদের পরস্পর সহযোগিতার একটি সুন্দর পরিবেশ আজকাল গড়ে ওঠে না। এখন সবাই রাজা। কেউ কারোও সহযোগিতার দরকার বোধ করে না। এমনি হৃদয়হীন পেশাদারিত্বের জন্যই গানও প্রাণময় হয়ে ওঠে না। সব থেকেও যেন একটা কিছু নাই—যার জন্য প্রায় গানই ফেসে যায়।

মেঘেঢাকা তারার শুটিং পর্ব শেষ হলো। শুরু হলো সম্পাদনার কাজ। নিদারুণ অর্থাভাব চলছে। মেঘে ঢাকা তারার জন্য আমার চুক্তিপত্রে ছিল দু'হাজার টাকা দেবার কথা। মাত্র বারোশ টাকা পেয়েছি। অন্যদিকেও কোনরকম কাজ চলছে, আটকালো শেষের দিকে।

কাহিনীর ক্লাইমেক্স সিন জমছে না। আরও দু'তিন দিন শিলং বা কোন পাইনবন পাহাড় যেখানে আছে নিদেন পক্ষে 'নেতারহাটে' শুটিং করতে পারলে ভালো হয়। সেই পয়সাও নাই।

ছবিতে ডাবিং অর্থাৎ শিল্পীদের আলাদা ভাবে ডায়ালগ বলিয়ে সেই সাউণ্ড ছবিতে লাগালে ছবি ভালো হবে। কিন্তু সে পয়সাও নাই।

চিন্তিত ঋত্বিক।

সেদিন রাতের বেলায় নিউ থিয়েটার্স এর দোতলার এডিটিং রুমে গেছি। ঋত্বিক প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে মাথার চুলগুলো টানছে আর বিড়ি ফুঁকছে। জানাই—কতদূর? ছবির এডিটিং হলো?

ঋত্বিক বলে ওঠে—ছাই হবে। শেষই জমছে না। শুটিং করার পয়সাও নাই, সব ডাব্বা পুড়িয়ে ছাই করে ছিটিয়ে দিতে না হয়?

বলে উঠি—পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্নাসী

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,

অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

আমি ওর কথার পৃষ্ঠে কবিগুরুর ওই লাইন কটা বলেছি কিন্তু দেখি হঠাৎ ঋত্বিক

যেন ঝলসে ওঠে। কি যেন একটা বিদ্যুৎ বয়ে যায় ওঁর চোখে, হঠাৎ বলে ওঠে।

—রমেশ, থ্রি হানড্রেড সিক্সটি ডিগ্রী একটা শট আছে শিলং এর সেটা বের কর, দ্যাখ সেটা কোথায় আছে।

সতী ফলস্ এর নীচে ফানেল এর মত জায়গাতে সেই শট দেওয়া হয়েছিল, তারপর সেটার কথা হঠাৎ এবার মনে পড়েছে ঋত্বিকের, রমেশ যোশী তো এ ক্যান, সে ক্যান হাতড়ে শেষ অবধি বের করলেন সেই শট্‌টার নিগেটিভ।

হাতে পেয়ে সেটাকে মুভি ওয়ালায় লাগিয়ে ছোট্ট প্রজেকটারে সেই পাহাড়ের নীচে থেকে ঊর্ধ্বাকাশ আর ঘূর্ণায়মান পাহাড় বনভূমিকে দেখছেন। তারপর তার সহকারী পুনু দাশগুপ্তকে বলেন।

পুনু কাল বেলা একটায়, একঘণ্টার জন্য স্কোরিং বুক করছি, তাই কাল দুপুরে যেখান থেকে পারিস বেনুকে নিয়ে আয় আধঘণ্টার জন্য। (সুপ্রিয়া দেবীর ডাকনাম বেনু) তারপর দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা।

আমাকেও বলেন—অথর, কাল দুপুরে এসো, হলে একটা সাংঘাতিক কিছুই হবে। না হলে অলগন্ ফট্।

কি করবে ভাবতেও পারি না। তবু গেলাম পরদিন এন-টি ওয়াল স্টুডিওতে। দেখি রেকর্ডিং ফ্লোরে একটা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়াদেবী, একজনের হাতে মাটির ছেলেদের খেলনা এক তারের একটা ছোট্ট বেহালার মত, তাতে কঞ্চির ছড় টেনে একটানা একটা সুরই বের করা যায়। সেই খেলনা থেকে কে ক্যাঁ ক্যাঁ করে সেই সুর তুলছে, আর মাইকের পাশে পুনু দাশগুপ্ত তার হাতে একটা ঝাউগাছের পত্রবহুল ছোট ডাল, সে ওই ডালে ফুঁ দিয়ে হাওয়ার শব্দ তুলছে।

ব্যাপারটা বুঝতেও পারি না। ঋত্বিক বলে সুপ্রিয়াকে। —তুমি সা রে গা মা পা ধা নি —ক্রমশ এই ভাবে সুরটা চড়িয়ে চড়িয়ে চিৎকার করে যাও—দাদা আমি বাঁচতে চাই, দাদা আমি বাঁচতে চাই—

ওই ভাবে সুপ্রিয়ার ওই ব্যাকুল আর্তনাদ, পিছনে ঝড়ো হাওয়ার শব্দ আর পাহাড়ীদের সুরের মত একটানা একতারের খেলনার এই আওয়াজ মিলিয়ে টেক করা হলো।

সেই সাউন্ড প্রিন্ট ডেভেলাপ করিয়ে এবার সেই তিনশো ষাট ডিগ্রীর ঘূর্ণায়মান পাহাড়বনের শটের সঙ্গে জুড়তে সেই বনপাহাড় আকাশ আর এই শব্দ যেন এক গগনভেদী ব্যাকুল আর্তনাদে পরিণত হলো যা মেঘে ঢাকা তারা ছবিকে একটি সার্থক মাত্রা এনে দিয়েছিল। আর সেই জাদু দেখিয়েছেন ঋত্বিক চার পয়সার খেলনা আর ঝাউয়ের ডাল দিয়ে।

এ ওই দুর্দান্ত এক মননশীল শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

মেঘে ঢাকা তারা মুক্তি পেলো। আর এই ছবিই ঋত্বিককে এনে দিয়েছিল সাফল্য-খ্যাতি। আজও এ ছবি ভারতীয় ফিল্মের একটি স্মরণীয় ছবি।

এই ছবির জন্য সম্পূর্ণ প্রাপ্য আমি পাইনি। কিন্তু তার জন্য আমার কোন

অভিযোগ নেই। এছবি কেন ঋত্বিকের কাছে আমি পেয়েছিলাম অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ভালোবাসা আর চিত্রনাট্য লেখার অভিজ্ঞতা।

বাংলায় আড্ডার অনেক অবদান আছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির নির্ভেজাল আড্ডা গড়ে উঠেছিল ঋত্বিককে কেন্দ্র করে। বহু মনীষী, পণ্ডিত আসছেন, সেখানে আমিও অনেক কিছু পেয়েছি।

মাঝে মাঝে বিপদে পড়েনি তাও নয়। মজাদার ঘটনা খাটিয়ে সকলেই তা উপভোগ করা হত। একদিন সন্ধ্যায় মেঘে ঢাকা তারার প্রজেকশন হবে নিউ থিয়েটার্স।

আগেই বলেছি ঋত্বিকবাবু সে সময় নিয়মিত মদ্যপান আদৌ করতেন না। শিলং-এ থাকাকালীন ছোট্ট এক বোতল হুইস্কি কেনা হয়েছিল মাত্র। আর সেটা ছিল আমার জিম্মাতেই. সেই বোতল প্রায় অটুটই ছিল।

ইউনিটের সকলেই জানত আমিও এই রসে বঞ্চিত।

প্রজেকশনের দিন সন্ধ্যায় আমি, ডঃ বোধায়ন চট্টোপাধ্যায় গেছি ঋত্বিকের বাড়িতে। ওখান থেকে ওর গাড়িতেই স্টুডিওতে যাবো।

সেদিন ঋত্বিক এক বোতল বিয়ার বের করে বলে, —একটু গলা ভিজিয়ে নিই।

বিয়ারটা বোধহয় নষ্ট হয়ে গেছল, ছিপিটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বোতল থেকে তীব্র বেগে বিশ্রী পচা গন্ধওয়ালা তরল পদার্থটা তীর বেগে বের হয়ে শিলিং অবধি ধেয়ে গেল—তখনও তীর বেগে ওই পচা দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বের হয়ে, ঋত্বিকও ভাবতে পারেনি এই কাণ্ড ঘটবে, সে সামলাতে না পেরে বোতলটা নীচু করতেই পিচকারী থেকে বের হবার মত বেগে সেই পচা মাল বোধায়নবাবু আর আমাকেই এসে লাগলো। পাঞ্জাবী, মুখ, সর্বাঙ্গ ভিজে তো গেলই, আর ফুটে উঠলো বিশ্রী পচা অ্যালকোহলের তীব্র বদগন্ধ। আমারা দুজনে তখন বিয়ার স্নান।

গরমের দিন, আদ্দির পাঞ্জাবীটা শুকুলো কিন্তু যত শুকোয় তত বিশ্রী বিটকেল গন্ধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। ওই অবস্থাতেই এসেছি স্টুডিওতে। ঋত্বিকই গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনে রয়েছে সঙ্গী বৌঠান। তিনিও আমাদের দুজনের দিকে বেশ কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। আমরা মাল না খেয়েই তখন মাতাল প্রতিপন্ন হয়ে গেছি।

বেপরোয়া ঋত্বিক, সে গাড়ি চালাচ্ছে তেমনি ভঙ্গীতে। টালিগঞ্জ ব্রিজ পার হয়ে দুটো বিপরীতমুখী ট্রামের মাঝখান দিয়ে কি করে বেঁচে বের হয়ে এলাম জানি না। যে কোন মুহূর্তে গাড়িটা চুরমার হয়ে সবকজনই শেষ হয়ে যেতাম।

রাস্তার লোকজন হৈ চৈ করছে। ঋত্বিকের এতটুকু ভয় ডর নেই। ঠা ঠা করে হাসছে। জীবনের স্টিয়ারিংটাই সে এমনি বেপরোয়া ভাবেই ধরেছিল। গাড়ির স্টিয়ারিং তার কাছে তো খেলনাই। পথের লোকজন সুগন্ধময় আমাদের দুই মূর্তির দেহসুবাসে মুগ্ধ হয়ে বলে—গাড়িতেই নয় পেটেও পেট্রল ঢেলেছে রে!

কোনমতে স্টুডিওতে এসে ঢুকলাম। আমরা বুঝেছি যে এই বিশ্রী গন্ধের জন্যই

সরে থাকতে হবে। তাই ওদিকে আবছা অন্ধকারে আম তলায় দাঁড়িয়ে আছি সকলের কাছ থেকে দূরে। সুযোগমত প্রজেকশন হলে ঢুকে যাবো। দেখি ওদিকে অনিল চাটুয্যে, সুপ্রিয়া, নিরঞ্জন রায়, অজিত লাহিড়ী, পীযূষ গাঙ্গুলীরাও রয়েছে ঋত্বিক তাদের কি বলছে। তারপর দেখি অনিল একপাক আমার চারপাশে ঘুরে গেল—এসো সুপ্রিয়াও দেখে শুনে বোধহয় শুঁকেও গেল।

বুঝতে পারি ওরা এক নতুন রসিককে আবিষ্কার করে বেশ মজাই পেয়েছে। কি করে কাদের বোঝাই যে আমি আসামী নই, সাজানো হয়েছে।

পীযূষবাবু বলে বিজ্ঞের মত।

—এতে দোষের কি আছে?

আর ঋত্বিক বেশ মজা দেখছে। বোধায়নবাবু নিরীহ ভালোমানুষ। তিনি তো হতবাক। সেদিন বিনা দোষে দুই আসামীকে নিয়ে বেশ নাটকই করলো।

বেলেঘাটার মোহন গাঙ্গুলী মশায়ের সুন্দরবনে ছিল কাঠের ব্যবসা। সুন্দরবনের কোন আবাদ অঞ্চল তুষখালি, রাশপুরায় ছিল তার বেসক্যাম্প। সেখানে থাকত বাওয়ালী, কাঠকাটার লোকজন, প্রচুর বড় -মাঝারি সাইজের মাল বওয়ার নৌকা, ডিঙ্গি।

ওই সব নৌকায় খাবার জল, খাবার, রসদপত্র সব নিয়ে যাবার পারমিট নিয়ে বনে গাছ কেটে আনতেন। কলকাতার করাতকলে সেই সব কাঠ দিয়ে চায়ের পেটি, অন্যসব জিনিসও বানানো হত।

মোহনদা বলতেন—সুন্দর বন বেড়াতে যাবে? ক্লাবের অনেকেই বলতে তিনি। তখন সুন্দরবন, আবাদ অঞ্চলে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এখন কলকাতা থেকে সোজা ধামাখালি, বাসন্তীর কাছ অবধি বাসও যাতায়াত করছে। তখন এসব রাস্তার অস্তিত্বই ছিল না।

সুন্দরবনে গেছলাম তখন এখান থেকে হাসনাবাদ-এর বাসে গিয়ে —ইটিঙা ঘাট থেকে লঞ্চে। ঘণ্টা পাঁচেক যাবার পর পৌঁছলাম তুষখালিতে। সেখান থেকে নৌকায় তিনদিন তিনরাত্রি পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছিলাম মেন ল্যাণ্ডের সুন্দরবন ছাড়িয়ে বঙ্গোপসাগরের বুকে সুন্দরবনের শেষ দ্বীপ কোদা আইল্যাণ্ডে। সেখানে নৌকায় কাঠুরিয়াদের সঙ্গে বাস করেছিলাম সতেরো দিন তাদের জীবন যাত্রার শরিকা হয়ে।

তারপরও সুন্দরবন, ওই আবাদ অঞ্চলে গেছি মোহনদার ক্যাম্পে। নৌকায় ঘুরেছি দূর বনসীমান্তের আবাদ—সাতজেলে, বাঘনা দত্তর এক অঞ্চলে।

সুন্দরবনের পটভূমিকায় লিখেছিলাম নয়াবসত, নোনাগাং—কুমারীমন আরও অনেক উপন্যাস ছোটগল্প, ভারতবর্ষ পত্রিকাতে ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনীও লিখেছিলাম।

মেঘে ঢাকা তারা সাফল্য লাভ করার পর ঋত্বিকের সহকারী পীযূষ গাঙ্গুলী আর অজিত লাহিড়ী দু'জনে আমার 'কুমারী মন' উপন্যাস এর চিত্ররূপ দিতে মনস্থ

করলো। সুন্দরবনের অরণ্য, আবাদ অঞ্চল নিয়ে সেই কাহিনী। মানুষ অরণ্যকে গ্রাস করতে চায়। প্রকৃতিও এই ভারসাম্য নষ্ট হতে দিতে চায় না। চায় না বুনো পুরন্দর সাঁই। সেইই যেন এই অরণ্য প্রকৃতির প্রতীক।

চিত্রনাট্য লিখতে বসলেন ঋত্বিকবাবু। আমিও তার সঙ্গে হাত লাগাতাম, সেই রাত্রি গভীর অবধি লেখার কাজ চলে, বাড়ি ফিরি তখন ধাপার দিক থেকে কপির গাড়ি কলকাতার বাজারে আসছে।

ওরা সুন্দরবনে শুটিং করতে যাবে। এ ছবিতে ও রয়েছে অনিল, দিলীপ মুখুজ্যে, কণিকা মজুমদার, জ্ঞানেশবাবু, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতি। দূর দুর্গম আবাদে মোহনদার ভরসাতেই ওদের পাঠালাম। লঞ্চে চলেছে ওরা, আমি সেবার যেতে পারিনি।

গেছি মহিষাদল রাজ কলেজের সাহিত্যসভায়। সেই রাতে শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। ওরা তখন লঞ্চে। সেই ঝড়ের মধ্যে লঞ্চও বেহাল অবস্থা। রাতভর বনের মধ্যে লঞ্চে পড়ে আছে পুরো ইউনিট, ঝড়ের দাপটে ভাসতে ভাসতে বাংলাদেশের সীমান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। তারপর কোনমতে ফিরে আসে।

ওই গহন দুর্গম অরণ্যে ওরা 'কুমারী মন' এর শুটিং করেছিল। অনিলকে দেখা যাবে শ্বাপদসঙ্কুল বনের মধ্যে একটা বুকভোর নোনা খাল পার হচ্ছে রাইফেল ঘাড়ে তুলে।

গাছের উপর থেকে ক্যামেরা রেখে কাজ করেছে। বাঘের আবাস স্থল বনঘালির ধলে। যাদের দুঃসাহসিকতায় বনদপ্তর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। যে কোনও মহূর্তে চরম দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে তাদের ভ্রূক্ষেপ নাই।

শেষ অবধি বনদপ্তরই তাদের জোর করে বন রাজ্য থেকে বের করে এনে কাছাকাছি আবাদ অঞ্চলে শুটিং করায়।

ওই ছবিতে ঋত্বিক নিজে করেছিলেন পুরন্দর সাঁই এর রোল, ওই চরিত্রটা খুবই কঠিন, কিন্তু ঋত্বিকের অভিনয় ক্ষমতা যে কতখানি ছিল তা এই ছবি দেখলেই বোঝা যায়।

ঋত্বিকবাবু চিত্রনাট্য করেছিলেন অসাধারণ। কিন্তু শেষ পর্বে যে কোন কারণেই হোক ওরা সেই চিত্রনাট্য ঠিকমত রাখতে পারেনি। তাই শেষ পর্বে ছবিটা ঋত্বিকবাবুর মনঃপূত হয়নি। তবু ওই ইউনিটের সাহস-নিষ্ঠা ওই বিচিত্র পটভূমিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। এত ঝুঁকি নিয়ে ইতিপূর্বে কোন বাংলা ছবি হয়নি।

এর মধ্যে আমার 'মুক্তিস্নান' উপন্যাস বের হয়েছে।

তখন বাংলা ছবির জগতে বেশ কিছু সৎ প্রযোজক ছিলেন। কার্তিক বর্মন তাদের অন্যতম। ভদ্রলোকের ওষুধের ব্যবসা। মাঝে মাঝে ছবি করেন। 'নতুন জীবন', 'বালুচরী' প্রভৃতি ছবি করেছেন তিনি, তার পর আমার 'মুক্তিস্নান' এর চিত্রস্বত্ব কিনলেন।

এর আগে আমার একটি বড় গল্প 'বাচোয়া'র চিত্রস্বত্ব নিয়েছিলেন রাজেন

তরফদার। রাজেন তরফদার তার আগে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' করে প্রভূত সুনাম কুড়িয়েছেন। 'অন্তরীক্ষ' নামেও একটা ছবি করেছেন। মূলত তিনি ছিলেন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। কোন বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। সত্যজিৎবাবু ও তেমনি মূলত বিজ্ঞাপনের জগৎ থেকেই ছবিতে এসেছিলেন।

রাজেনবাবুর ছবিটা ছিল এক লাইফ ইন্সিওরেন্স এজেন্টের জীবন কাহিনী। তার নাম দিয়েছিলাম নবজীবন। সেই হিসাবে উপন্যাসের নাম করেছিলাম 'জীবন কাহিনী'। এজেন্টের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিকাশ রায়, সঙ্গে ছিলেন অনুপ কুমার, সন্ধ্যা রায়, ভানু বাড়ুজ্যে, আরও অনেকে।

রাজেনবাবু ছিলেন খুঁতখুঁতে ধরনের মানুষ, একবার একটা শট নিয়ে পছন্দ না হলে আবার শট নিতেন। ছবিকে নিখুঁত করতে চেষ্টা করতেন। ফলে তাঁর শুটিং ডেট বেড়ে যেতো। তবে উচ্চমানের ছবি করার চেষ্টা করতেন।

কিন্তু ঋত্বিকের মত লেখককে জড়িয়ে রেখে তার কাছ থেকে সবথেকে ভালো জিনিসটা বের করার মত মানসিকতার অভাব দেখেছি তাঁর। চিত্রনাট্যে মূল কাহিনীর সুরটা আমার মতে ঠিক ধরা পড়েনি। ছবিটা তিনি তার মতে শেষ করেছিলেন।

আমি এই কাহিনীর মূল সূত্র আহরণ করেছিলাম চার্লি চ্যাপলিনের থেকে। মানুষ মরতে চায় না—সে বাঁচার জন্য শেষ অবধি লড়াই করে। আর সেটা বলেছিলাম স্যাটায়ারের মাধ্যমেই মানবিকতার সঙ্গে বিকাশবাবু চরিত্রের মূল সুরটাকে নিখুঁতভাবে রূপায়িত করেছিলেন অনুজ-সন্ধ্যা রায়ের। ফলে এ ছবিটাও উতরেছিল আর সে বছরের বি-এফ-জে পুরস্কারও পেয়েছিল।

অবশ্য আমার সম্মান দক্ষিণার অর্ধেকও আমি পাইনি রাজেনবাবুর কাছে থেকে। প্রযোজক জানিয়েছিলেন যে আমার পুরো টাকা তিনি রাজেনবাবুকে দিয়েছেন। সম্মান দক্ষিণাতো দূরের কথা—লেখকের প্রাপ্য সম্মানটুকুও দিতে তিনি সম্মত ছিলেন না।

তারপর অবশ্য আর আমি রাজেনবাবুর সঙ্গে কোন কাজ করিনি।

ঋত্বিকের সঙ্গ ছাড়তে পারিনি। তার প্রতিভা—তার পাণ্ডিত্য, সাহিত্য, ইতিহাসে তার জ্ঞান, তার ব্যক্তিত্ব বন্ধুপ্রীতি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেখানে টাকার সম্পর্কটাকে কোনদিনই প্রাধান্য দিইনি।

'মেঘে ঢাকা তারা' র সাফল্য সেদিন কেন জানি না ঋত্বিকের ভাগ্যকে বদলে দিতে পারেনি। পরের ছবির জন্য প্রযোজক তেমন আসেনি। সন্ধ্যায় আড্ডা জমত ওর বাড়িতে। কোনদিন অবন ঠাকুরের রাজকাহিনী কোনদিন বিভূতিবাবুর আরণ্যক থেকে পড়তেন ঋত্বিক। ওর পাঠ করার মধ্যে থাকত একটা নাটকীয়তা যা ভাষাকে ছবিতে রূপান্তরিত করত। সেই সঙ্গে চলেছে সরোদচর্চা। বাহাদুর খাঁর কাছে তখন শিখছে সে।

আমার 'শেষ নাগ' উপন্যাস যেটা স্টারে 'শেষাগ্নি' নামে অভিনীত হয়েছিল, সেই উপন্যাস পড়ে বলত ঋত্বিক—যদি কোনদিন ভালো কোন প্রযোজক পাই,

'শেষনাগ' এর ছবি করবো। এও একটা যুগ যন্ত্রণার প্রতীক। একটা ক্লাসিক ছবি হবে।

আর ওর বাসনা ছিল 'আরণ্যক'-কে ছবি করার। তাই নিয়ে অনেক স্বপ্নও দেখত ঋত্বিক।

ঋত্বিকবাবু গণনাট্য সংঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এবার তার ছবির বিষয়বস্তু হবে স্বতন্ত্র। গণনাট্যের আন্দোলন সেদিনের তারুণ্যের কিছু সৃষ্টি করার উন্মাদনাকে কেন্দ্র করেই 'কোমল গান্ধার' ছবির কাজ শুরু করলেন।

ওই আড্ডায় যাই। তবে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ি, চাকরি, লেখালেখি তো চলতেই।

এই সময় কার্তিক বর্মন নিলেন 'মুক্তিস্নান' এর চিত্রস্বত্ব। কার্তিক বাবু নামী প্রযোজক. স্পষ্টবাদী মানুষ। আর এককথা তাঁর। এর আগেও ছবি প্রযোজনা করেছেন।

ফিল্ম লাইনে কিছু শিল্পীর নানা বায়না ছিল। শিল্পীরা ভাবেন ছবি একমাত্র তাদের জন্যই চলে কিছুটা শুটিং এগিয়ে গেলে তখন আর ছবি থেকে বাদ দেওয়াও কঠিন, তখন কাদের নানা বায়না শুরু হয় অমুক হোটেলের চপ, অমুক রেস্তোরাঁ ফিসফ্রাই, আপেল, অমুক কোম্পানির তৈরি মেকআপ চাই নানা বায়না। তারপর এসেই শোনান তিনটেতে ছাড়তে হবে। থিয়েটারের দিন তো ছাড়তেই হবে। কার্তিকবাবুর সঙ্গে তাদের বাধত এই খাণেই। কার্তিকবাবু যাকে যে টাকা দিতে স্বীকৃত হতেন, তাকে সেই সেই তারিখে সেই টাকা না চাইতে নিজের থেকেই দিতেন।

তিনি বলতেন—ষোল আনা দেব, চোদ্দ আনা কাজ তো নেবই। এত বায়নাই বা শুনবো কেন?

অজিত গাঙ্গুলী ছিলেন মুক্তিস্নানের পরিচালক। কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। মূলত নাটকের লোক ছিলেন তিনি। বেশ কিছু জনপ্রিয় নাটকও লিখেছিলেন। তারপর সিনেমায় আসেন। তার অনেক ছবিই হিট করেছিল। 'শ্রীমান হংসরাজ' তার অন্যতম। মুক্তিস্নানও হিট করেছিল এর মুখ্য ভূমিকায় ছিল অনিল। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ছায়াছবির জগতে বিভিন্ন ছবিতে অনেক কিছু জিনিসপত্র, দামি পুরোনো জমিদার বাড়ির সেটের পুরোনো পালঙ্ক, দেরাজ-ঝাড়বাতি, ফুরসী নানা কিছু লাগে সেই যুগের পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলার জন্য।

তাই ফিল্মে এসব যোগান দেবার জন্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ছিল। তাদের ছিল ছোট খাটো জাদুঘরই। আর যোগানদাররাও ছিলেন বিচিত্র ধরনের মানুষ।

ছবিতে যারা জনতার মধ্যে থাকে সেই ক্রাউড সাপ্লাই করত অনেকে। প্রতি জনের মাথাপিছু যে টাকা দেওয়া হত সেই সাপ্লায়ার তার থেকে কমিশন কেটে বাকি টাকা তাদের দেয়। তারা সব নীরব অভিনেতা। আবার সরব অভিনেতাদের রেট কিছু বেশি। ছবিতে ডায়ালগ বললে তার রেট বেশি। নীরব শিল্পীর তখন পঁচিশ টাকা রেট

হলে—একটা ডায়ালস বলা শিল্পীর রেট হতো পঞ্চাশ টাকা।

সেই সাপ্লায়ার ছবিতে একটা বিড়াল সাপ্লাই করেছিল। বিড়ালের ভূমিকা ছিল নীরবই। নায়কের বাবার খাবারের থালার পাশে বসে থাকবে মাত্র।

ছবিতে বিড়ালটা খাবার দেখে মিউ মিউ করে ওঠে। পরিচালক সেই সট নিলেন। এবার বিড়াল সাপ্লায়ার বিল করে পঞ্চাশ টাকাই। পরিচালক বলে—বিড়ালের জন্য পঁচিশ টাকা চাইলে, এখন পঞ্চাশ টাকা চাইছ কেন? সাপ্লায়ার বলে—দাদা, এতো ডায়ালগ বলেছে। তিনচার বার মিউ মিউ করলো শটে টকিং আর্টিস্টের রেট তো দেবেন।

তখন আউটডোরের অনেক কাজই স্টুডিওর সেটেই করা হত। তখনকার ছবির অনেক গানের সেটেও দেখা যেত কৃত্রিম ঝরনা। বন, গ্রামের পথ-টথ, গাছ-গাছালি দিয়ে সাজানো হত। তার জন্য সফেদা গাছের ডালই ছিল উপযুক্ত। পাতাগুলো ঈষৎ পুরু আর ঘনসবুজ হওয়ার দরুণ আলোর উত্তাপে মলিন শুকনো হতে দেরী লাগত। ওইসব ডালপালা-কলাগাছ, খেজুর গাছ যোগান দেবার লোক থাকত। তারা কার বাগানের সফেদাও অন্য ডালপালা কেটে এনে ভালো দামেই যোগান দিত।

এখন বেশকিছু আউটডোরে কাজ হয়, বিশেষ করে গান। তাই ওদের বাণিজ্য কিছুটা কমে গেছে।

ওই সাপ্লায়ারদের স্টকে নানা মালপত্র থাকে। তান্ত্রিকের সেট হবে। রক্তবস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা—হাড়, মাথার খুলি, গাঁজার কলকে, মদের খালি বোতল, ছবিতে পুলিশের ব্যবহৃত কাঠের রাইফেল কি নেই!

এমনি এক সাপ্লায়ার কোন ছবিতে মালপত্র সাপ্লাই করেছে, ছবির কাজ শেষ। প্রযোজককে ছবি মুক্তি পাবার আগে সকলের দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিতে হয়। প্রজোযক এই সাপ্লায়ারের টাকাটাই দেননি। প্রযোজক ভদ্রলোক মা কালীর ভক্ত, তন্ত্রে মন্ত্রেও বিশ্বাস করেন, তবে অন্যের টাকা দেবার বেলায় সবকিছু ভুলে যান।

সাপ্লায়ারও তার টাকা পায়নি। ছবি রিলিজ হচ্ছে কলকাতার নামী হলের বাইরে বড় বড় হোর্ডিং। ব্যানার দিয়ে সাজানো হয়েছে। তখন সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি দেখতে লোক ভিড় করত। দর্শকদের ভিড়ও হয়েছে বাইরে। প্রযোজক, পরিচালক সকলেই দুরু দুরু বুকে প্রতীক্ষারত। দর্শকরা কি ভাবে নেবে ছবিটা কে জানে?

এমনি সময় দেখা যায় এক রক্তাম্বর পরা জটাজুট সমন্বিত রুদ্রাক্ষের মালা পরা কাপালিককে, হাতে মড়ার খুলি, হাড়। ব্যাম শংকর! হর হর মহাদেও!

সকলেই অবাক এখানে কাপালিককে দেখে। হাতে মড়ার হাড়। প্রযোজক পরিচালক তাকে চিনেছে, সেই সাপ্লায়ার। ওই বেশে এসে হুঙ্কার ছাড়ে—দেব এই হলের গায়ে টাঙানো ব্যানারে এই চামারের হাড় ঠেকিয়ে, ছবি প্রথম দিনেই মায়ের ভোগে চলে যাবে।

দিলাম, দিলাম ছুঁইয়ে এই হাড়। আমার টাকা দিস্‌নি। দিচ্ছি তোর দফা গয়া

করে।

প্রযোজকও ঘাবড়ে যায়। কে জানে সত্যিই যদি সর্বনাশ হয়ে যায় কয়েক লাখ টাকা তার জলে চলে যাবে। তাই বলে,

—থাম, থাম বাবা। সব্বোনাশ করিস না। তোর সব টাকা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।

ছবি চলেছিল কিনা জানা যায়নি। তবে সেই সাপ্লায়ার মড়ার হাড়ের ভেল্‌কি দেখিয়ে তার টাকা সব আদায় করেছিল।

ছায়াছবির জগতে আলোর ঝলমলানি, টাকার আমদানি, বিলাস ব্যসনের মাঝেও অনেকের জীবনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন থেকে তমসার মধ্যে নির্বাসনও দেখেছি।

তখন এক তরুণ নায়কের খুবই রমরমা। উত্তমকুমার তখনও স্বমহিমায় বিরাজমান হননি। সেই নায়কের ছবিও ভালোই চলত। ক্রমশ তিনি এক ভদ্রমহিলার প্রেমে পড়লেন। ভদ্রমহিলা ছবিতে টুকটাক অভিনয় করতেন। রূপ-গুণ যত না থাক—তার হিসেবী বুদ্ধি ছিল বেশী দিতে হল।

সমানে সমানে প্রেম হলে ঠিকই থাকে হিসাবটা। জল উপর থেকে নীচের দিকেই বেশী জোরে প্রবাহিত হয়। তেমনি এই নায়কের সাধারণ মহিলার সঙ্গে প্রেমের খেসারৎ নায়ককেই বেশি!

ফলে কাজের ক্ষতিও হতে শুরু করলো। সেই মহিলার দাবি মিটাতে তাকে বেশি ছবিতে কাজ নিতে হলো। তারপর সেই মহিলা ভদ্রলোকের সর্বস্ব নিজস্ব করে নিয়ে নীরবে সরে পড়লো অন্য কোন টাকাওয়ালার সঙ্গে।

সেই নায়কের তখন দুর্দিন—ছবির পর ছবি ফ্লপ। একদিন তার পিছনেই প্রযোজক, পরিচালকরা ঘুরত, এখন তাকে দেখেই তারা পালায়। ছবির কাজ নাই।

বাধ্য হয়ে নতুন করে ভাগ্য অন্বেষণের জন্য তিনি বোম্বাই পাড়ি দিলেন। তখন এখানের চিত্রজগৎ থেকে অনেকেই বৃহত্তম বাজারের সন্ধানে বোম্বাই-এ পাড়ি দিচ্ছেন।

এখানে হিন্দী ছবির প্রডাকশন বন্ধ হয়ে গেছে। নিউ থিয়েটার্স-এর ভগ্নদশা। পৃথ্বিরাজ কাপুর চলে গেছেন বোম্বাই-এ। রাজকাপুর উঠেছেন সেখানে। হিন্দি ছবির পীঠস্থান তখন বোম্বাই-এ। বিমল রায় মশায়ও চলে গেছেন বোম্বাই-এ। সলিল চৌধুরী, হেমন্ত কুমাররা বোম্বাই-এ। তাদের সঙ্গে বেশ কিছু কলাকুশলীও চলে গেছে সেখানে।

বোম্বের চিত্রজগতে প্রথম থেকেই বোম্বে টকিজের হিমাংশু রায়, দেবিকারানী, শশধর মুখার্জী, অশোক কুমার প্রভৃতি প্রবাসী বাঙালিদের আধিপত্য ছিল। ক্রমশ উঠছেন শক্তি সামন্ত, প্রমোদ চক্রবর্তী, অনিল চৌধুরী, কুনাল গুহ, শচীন ভৌমিক আরও অনেকে। এদিক থেকে নিউথিয়েটার্স গ্রুপের বিজয় চট্টোপাধ্যায়, ফণী মজুমদার, আর্ট ডিরেক্টার সৌরীন সেন, পরিচালক নীতিনবাবু, ঋত্বিকও গেছেন। বিশ্বজিৎ তখন বোম্বাই এর জনপ্রিয় নায়ক। গেছেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ও বোম্বাই চিত্রজগতে তখন বাঙালি নায়ক-নায়িকা কলাকুশলী, সঙ্গীত পরিচালক, পরিচালকদের

বেশ নাম। শচীন দেববর্মন তখন বোম্বাই চিত্র জগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। রয়েছেন অনিল বিশ্বাসও।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগের শুরু বিয়াল্লিশ থেকে। তখন তমলুক, সুতাহাটা, মহিষাদলকে ঘিরে স্বাধীন এক ভূখণ্ড গড়ে উঠেছিল। সেই বিয়াল্লিশের পর অজয় মুখার্জীদের নেতৃত্বে স্বাধীনতার স্বাদ আগেই পেয়েছিল সেখানের মানুষ। এর জন্য নেতাদের কষ্ট, ত্যাগ যা করতে হয়েছিল তা অকল্পনীয়। সাধারণ মানুষও সেই দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিল।

তখন এই অঞ্চলে ছিল মাইলের পর মাইল বিস্তৃত দুর্গম খড়ি বন, লম্বা ঘাস— যা পানবরুজের বেড়ার কাজে লাগে। সেই ঘন খড়িবনের মধ্যে বিষাক্ত সাপের জগতে ওরা দিনের পর দিন বাস করেছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই অধ্যায় নিয়ে তেমন কোন লেখাও হয়নি, ছবিও হয়নি। আঞ্চলিক আন্দোলনের নামেই তা সীমিত হয়ে আছে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে।

স্বাধীনতা দেশবিভাগের পর কিছুটা স্থিতি এসেছে। ছবির জগতে অনেকেই চলে গেছেন। এসেছে নতুন প্রতিভা। নতুন নায়ক, নায়িকা, পরিচালকের দল। প্রযোজক পরিবেশক-এর অফিসেও ভিড়। উত্তমবাবু তখন বেশকিছু ছবিতে অভিনয় করে বাংলা ছবিতে একটা মাত্রা এনে দিয়েছেন। শক্তিমান অভিনেতা, ভদ্রলোক। বাংলাছবির সামগ্রিক উন্নতির কথা ভাবেন।

বাংলা ছবির জগতে তখন বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান নায়ক, প্রচুর থিয়েটারের, বিশ্বের সহঅভিনেতা, কমিক অভিনেতা রয়েছেন। নায়িকারও অভাব নেই।

এমনি দিনে নকশাল আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল, ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সিনেমা জগতেও তার আঁচ গিয়ে লাগলো। ফলে ছবির বাজারেও একটা মন্দা ভাব দেখা দিল।

এই সময় উত্তমবাবুও চলে গেলেন কিছুদিনের জন্য বোম্বাই-এ।

এর মধ্যে বিমল রায় বোম্বেতে দো বিঘা জমিন করে পায়ের তলে শক্ত জমি পেয়ে গেছেন। নিজের প্রডাকশন করেছেন, তারই এক সহকারী মণি ভট্টাচার্য শিলচরের ছেলে, তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার কয়লাখনির উপর লেখা উপন্যাস —'কেউ ফেরে নাই'-এর হিন্দি চিত্রস্বত্ব কিনলেন।

যতদূর মনে পড়ে ওরা একই সঙ্গে সমরেশ বসুর 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' আর আমার 'কেউ ফেরে নাই',-এর হিন্দি চিত্রস্বত্ব কিনলেন।

হেমন্তবাবু নিজের প্রডাকশনে তখন ছবি করছেন। হেমন্তবাবু এলেন কলকাতায় তিনি মেঘে ঢাকা তারার হিন্দি চিত্রস্বত্ব কিনতে চান।

ঋত্বিকবাবুর সঙ্গে চুক্তি ছিল দশবৎসরের জন্য। দশবৎসর পর স্বত্ব আমার কাছে ফিরে আসবে।

কিন্তু ঋত্বিকবাবু নিজেই এক শর্ত লিখে দিয়েছিলেন যে স্বীকৃত টাকা যদি পুরো

না দেওয়া হয়, তাহলে তিনি স্বত্ববান হবেন না, সব স্বত্ব গ্রন্থকারের কাছেই ফিরে যাবে, এবং যে টাকা দেওয়া হয়েছে তাও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। সব স্বত্ব নির্দায় অবস্থায় গ্রন্থকারকেই বর্তাবে।

তিনি আমাকে পুরো টাকা দিতে পারেননি। কিন্তু ছবি রিলিজের সময়ও টাকা বাকি থাকার জন্য মুক্তি পেতেও বাধা দিইনি। এবার হেমন্তবাবু ঋত্বিকবাবুর কাছে যেতে ঋত্বিকই জানায়, সেই ব্যাপারটা। ঋত্বিকবাবুই বলেন, অমর, আমি তো টাকা দিতে পারিনি, এবার যা পাও নিয়ে নাও, হেমন্তবাবু আমার সঙ্গে চুক্তিপত্র করলেন। তবে চিত্রনাট্যের ব্যাপারে ঋত্বিকবাবুকেও কিছু টাকা দিয়েছিলেন। আমি তখন হিন্দি ছবির ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। 'মেঘে ঢাকা তারা' হিন্দিতে হবে, সারা ভারতবর্ষের মানুষ দেখবে সেই আশাতেই হেমন্তবাবুকে চিত্রস্বত্ব দিলাম আর তার জন্য হেমন্তবাবু দিয়েছিলেন তখন এক হাজার টাকা।

তখন একটু আশ্রয় তৈরি করছি, টাকার খুবই দরকার, সিমেন্ট কেনার পয়সা নাই। ওই টাকার দামও তখন আমার কাছে অনেক, তাই ওই টাকাতেই দিয়েছিলাম, হিন্দি ছবির বাজারে গল্পের জন্য কি পাওয়া উচিত তা জানতাম না। জানলেও হেমন্তবাবুর সঙ্গে দরদাম করতাম না।

উত্তমবাবু তখন বোম্বাই-এ।

শক্তি সামন্ত তখন বোম্বাই-এ একটি পরিচিত নাম। বাঁকুড়া কলেজের ছাত্র তখন তার হাওড়া ব্রিজ, কাশ্মীরকি কলি, কাটিপতঙ্গ এসব সব খুব নাম করেছে। 'আরাধনা'র খ্যাতি তখন তুঙ্গে, কলকাতায় এলে যোগাযোগ হত, তখন কিছু উপন্যাস ওকে দিয়েছিলাম।

এর মধ্যে আমার নয়াবসত উপন্যাস জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এখানে তরুণবাবুকে গল্পটা শুনিয়েছিলাম। তরুণবাবু বাংলার প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক, নিজে কাহিনীকার, সফল চিত্রনাট্যকার। সুন্দর ভাবমুহূর্ত গুলোকে ফুটিয়ে তোলেন। সুরসিক আর মননশীলতার সঙ্গে হৃদয়ের যোগে তার শিল্পকর্ম সার্থকতা পেয়েছিল। ছবির ফ্রেমিং যেমন সুন্দর করেন, বিষয়বস্তুও নির্বাচন করেন খুবই ভেবে চিন্তে। তার বহু ছবি বাংলা কেন ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তরুণবাবু একটা কথা বলেছিলেন ওই কাহিনী শুনে—যে পুলিশেরও সামাজিক কৃত্য আছে সেটাকেই তুলে ধরুন। আমি তার সেই কথা ভুলিনি। ছবিতে এক পুলিশ অফিসারের সার্থক চরিত্র সৃষ্টির মূলে তার কথাটাও স্মরণে রেখেছিলাম।

নানা কারণে ওই ছবি করা তাঁর হয়ে ওঠেনি।

পরে দীনেন গুপ্ত ওই ছবিটা করার কথা ভাবেন, প্রাথমিক কথাও চলছে, এমন সময় বোম্বে থেকে শক্তি সামন্ত জানালেন তিনি 'নয়াবসত' সম্বন্ধে আগ্রহী। হিন্দি বাংলায় ওই ছবি করতে চান।

উত্তমবাবু তখন বোম্বাই-এ রয়েছেন তার বন্ধু দেবেশ ঘোষের ওখানে। দেবেশবাবু শক্তিবাবুর বন্ধু। উত্তমবাবুকেও শক্তিবাবু চিনতেন, তার গুণমুগ্ধ শক্তি সামন্ত।

উত্তমবাবু বোম্বাই-এ থাকাকালীন শক্তিবাবু 'নয়াবসত' উপন্যাসটা পড়েন, তাঁর ভালো লাগে, আর উত্তমবাবুকেও পড়তে দেন বইটা। উত্তমবাবুরও ভালো লাগে।

উত্তমবাবু মনেপ্রাণে বাঙালি ছিলেন।

বোম্বাই চিত্রজগতে এর আগে একটা ছবি করতে গেছলেন। 'ছোটি সে মুলাকাত'। ওই ছবিতে তিনি নায়কও ছিলেন। কিন্তু সেই ছবি নানা কারণে চলেনি, তাতে উত্তমবাবুর প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হয়ে গেছলো, তাকেই বলতে শুনেছি।

—বাড়তি আলো জ্বললে নিভিয়ে দিতাম, পয়সা বাঁচাতে পোস্ত চচ্চড়িও খেয়েছি।

সেই ছবির পর হিন্দি সম্বন্ধে তাঁর একটা অনীহা এসে গেছল। তিনিই চেয়েছিলেন শক্তিসামন্তের মত প্রডিউসার, পরিচালক যদি বাংলা ছবি করেন ভালো বাংলা ছবিই হবে। শক্তিবাবুকে বাংলাছবির জগতে আনতে তিনিই চেষ্টা করেছিলেন।

আমার সঙ্গে শক্তিবাবুর নয়াবসতের চুক্তিপত্র হয়ে গেল।

প্রাথমিক চিত্রনাট্যের খসড়ায় কাজ আমি শুরু করলাম। শক্তিবাবু এর আগে 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখেছিলেন। তিনি অভিভূত হয়েছিলেন ছবি দেখে। তাকে ওটা হিন্দিতে করার কথা বলতে তিনি একটা চিঠি লিখেছিলেন—তাতে ঋত্বিকের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছিল, তিনি জানিয়েছিলেন ওই পর্যায়ে না পৌঁছতে পারলে ওর হিন্দিরূপ দেওয়া সম্ভব নয়। ওই সাবজেক্ট ঠিক তার জন্য নয়! পরে এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা যাবে।

নয়াবসতের বাংলা চিত্রনাট্য প্রথম করতে হবে। ওই পটভূমিকা, চরিত্রগুলো আমার চেনা। তাই আমাকেই ওটা করতে হবে। সেইমত কাজ শুরু করলাম। কলকাতায় প্রাথমিক কাজ শেষ করে বোম্বাই যেতে হবে।

ঋত্বিকের তখন কোমল গান্ধার, সুবর্ণরেখা মুক্তি পেয়েছে, কোমলা গান্ধার পর্যন্ত তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, পরেও যেতাম। কিন্তু কবছরের মধ্যেই সেই তেজী, টগবগে প্রাণচঞ্চল মানুষটির মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখেছি ঋত্বিকবাবুর 'মেঘে ঢাকা তারা' সেবার মুক্তি পেলো। কিন্তু প্রেস মিডিয়া তাকে তেমন স্বীকৃতি দেয়নি। বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন বৎসরের বাংলা ছবির জন্য পুরস্কার দেয়। আমার জীবন কাহিনী সে পুরস্কার পেয়েছিলো যতদূর মনে পড়ে 'মেঘে ঢাকা তারা'-কে তাঁরা তেমন কোনও স্বীকৃতি দেননি, আর কে কী পরামর্শ দিয়েছিল ঋত্বিককে জানি না, কী কারণে সেবার রাষ্ট্রপতির পুরস্কারের জন্য বাংলা থেকে কোন ছবি পাঠানো হয়নি। ফলে 'মেঘে ঢাকা তারা' প্রেসের—বা সরকারের কোন সম্মানই পায়নি।

কোমল গান্ধার ছবিকেও প্রেসের তৎকালীন চিত্রসাংবাদিকরা কোন স্বীকৃতিই দেয়নি, মেঘে ঢাকা তারা বাণিজ্যিক সাফল্য পেলেও কোমল গান্ধার তা পায়নি। মিডিয়া সেদিন ঋত্বিকবাবুকে অবহেলাই করেছিল, আর ঋত্বিকবাবুর মনে একটা ব্যর্থতার জ্বালা তাকে কুরে কুরে খেত, সেই জ্বালাকে ভোলার জন্যই তিনি নিজেকে অন্ধকারের দিকেই নিয়ে চললেন।

কোমল গান্ধার করার পরও কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন ভালো ছবি করতে। এই সময় ছায়াবাণীর অসিতবাবুও চেয়েছিলেন ঋত্বিকবাবু ভালো ছবি করুন। ঋত্বিককে বলেছিলাম আরণ্যক করতে, অসিতবাবুও আগ্রহী হলেন।

তখন বিভূতিবাবু নেই, বৌঠান ছেলে তারাদাসকে নিয়ে রয়েছেন বারাকপুর শহরে নিজের বাড়ি আরণ্যকে। আমি ঋত্বিকবাবু আর অসিতবাবুকে নিয়ে যাবো বারাকপুরে ওই ছবির অনুমতির জন্য।

শীতের শেষ দিক। ঋত্বিক তার শালটা ড্রাইভারকে দিয়েছে গাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য। পিছনে আমরা তিনজন গিয়ে গাড়িতে উঠবো।

গিয়ে দেখি এক কাণ্ড ঘটে গেছে, ড্রাইভার জানত না যে সাহেব শালের মোড়কে এক বোতল বিয়ার নিয়ে চলেছে। শালের বেষ্টনী থেকে হাত ফসকে সেই বোতলটা পড়েছে রাস্তাতেই—আর লোকজনও জুটে গেছে সেই রসের সৌরভে।

ঋত্বিক তো খাপ্পা। আমি বলে উঠি।

—শুভযাত্রা। দেখেন না নতুন জাহাজ জলে যাত্রার শুভমুহূর্তে স্যাম্পেনের বোতল ফাটায়।

ঋত্বিক বলে—তাদেব সেলারে কত বোতল মজুত থাকে জানো অথর? তারা পারে, আমার তো সবে ধন নীলমণি, এখন কি হবে?

বারাকপুরে এসে কথাবার্তা হলো, বৌঠানও খুশি হন। যোগ্য লোকের হাতেই 'আরণ্যক'-এর চিত্ররূপ পাবে। ঋত্বিকও খুশি মনের মত একটা ছবি করতে পারবে।

কিন্তু কেন জানি না—শেষ অবধি ঋত্বিকবাবুর 'আরণ্যক' করা হলো না। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের কাছেই শুনেছিলাম ভাগলপুরের কোন জমিদারী এস্টেটের নায়েব হয়ে তিনি কুশীনদীর ধারে কাটারিয়া অঞ্চলের অরণ্যমহলে ছিলেন। সেই অরণ্য ক্রমশ মানুষের বসতিতে পরিণত হলো। অরণ্য প্রকৃতির নিধনই ঘটেছিল, ঘটেছিল আরণ্যক জীবনের পরিসমাপ্তি।

সেই আখ্যান—সেখানের মানুষদের নিয়েই লিখেছিলেন তাঁর অমর গ্রন্থ আরণ্যক। বিভূতিবাবু অরণ্যকে ভালবাসতেন, অবকাশ পেলেই বনরাজ্যে চলে যেতেন। তার ঘাটশিলায় থাকাকালীন চাইবাসার ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার শ্রী যোগেন সিং-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। যোগেনবাবুও ছিলেন সাহিত্যিক, এখানের হিন্দি পত্রিকা 'বিশাল ভারতে' লিখতেন।

. যোগেনবাবুর সঙ্গেই বিভূতিবাবু সারাঙ্গা, চক্রধরপুর, মনোহরপুর অঞ্চলের গভীর অরণ্যে ঘুরেছেন। সারাঙ্গাকে বলা হত সাতশো পাহাড়ের দেশ। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শালজঙ্গল। পরে এই অরণ্যে বিভূতিবাবুর পথরেখা ধরে আমিও ঘুরেছি। থলকোবাদ, কুমডি, বড়ানাগরা, ছোটনাগরা অঞ্চলে কারো, কোয়েল, কয়না, নদীর তীর, ভূমির অরণ্যে ঘুরেছি আরণ্যকের সন্ধান করে।

সেখানের সর্বজন প্রিয় শিকারি, আদিবাসীদের বন্ধু বিষ্টু দত্ত ও বেলেঘাটার ছেলে, সেখানকার আদিবাসীরা তাকে বলে মারাং শিকারি—কেউ বলে বিষ্টু মুণ্ডা।

মুণ্ডারী ভাষায় অনর্গল কথা বলেন সারাঙ্গার সেইই ছিল আমার গার্জেন।

'আরণ্যকের' চিত্রস্বত্ব কিনেছিল ঋত্বিকের সহকারী অজিত লাহিড়ী, সেও তখন পরিচালক হয়ে গেছে। আর আরণ্যকের পটভূমিকা বেছেছিল সারাঙ্গাকেই। ইউনিট নিয়েছিলেন থলকোবাদ বনবাংলোয়।

অজিতবাবু সেখানে ইউনিট নিয়ে শুটিং করতে গিয়ে ফরেস্ট বাংলোতে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কি গোলমাল বাধিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। ক্রুদ্ধ আদিবাসীদের হাত থেকেই বিষ্টু দত্তই সেই রাত্রে হঠাৎ গিয়ে গোলমাল মিটিয়ে শান্ত করেন।

'আরণ্যক' ছবি ফ্লপ করেছিল। অজিতবাবু আর ঋত্বিকের মধ্যে ছিল চিন্তাধারার আসমান-জমিন ফারাক। 'আরণ্যকের' রূপায়ণ তাই অজিতবাবুর দ্বারা সম্ভব হয়নি। সেই অরণ্যভূমিকে তার মহান গুরুগম্ভীর রূপকে ধরতেই পারেননি অজিতবাবু।

আরণ্যকের ওপর আমার দুর্বলতা ছিল। সেই পটভূমিকাতে আমি বহুবার গেছি, কিন্তু ছবিতে তার প্রকাশ পায়নি। পরে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত আরণ্যক নিয়ে একটা হিন্দি সিরিয়াল করেছিলেন। কিন্তু আরণ্যকের অরণ্যকেই পেলাম না। যমুনাকুণ্ডির যা রূপ দেখালেন তাঁর মত নামী পরিচালক দেখে মনে হয় ঝাড়গ্রামের আশেপাশের দশ-বারো ফিট শাল চারার ঝুপি জঙ্গল আর একটা ডোবা মাত্র, অরণ্যই নাই।

আর অরণ্যের মধ্যে কাছারিবাড়ির আশপাশ দেখে মনে হয় যেন এখানের কোন ঘন আমবাগান, সুপারিগাছ শালবনের দেশের মানুষ আমি। শাল, মহুয়া জঙ্গলে সুপারি গাছ হয় না। ঘন অরণ্যের আমগাছ হয়—তবে সে গাছ এতটুকু আলো হাওয়া পাওয়ার জন্য আকাশে ঠেলে ওঠে দেবদারু গাছের মত। তার রূপও আলাদা। অরণ্য ছাড়া আরণ্যক দেখে তাই হতাশই হয়েছি।

এখনও আমি বিশ্বাস করি ঋত্বিকবাবু আরণ্যক যদি করতে পারতেন তাহলে সেটা হত ভারতীয় চলচিত্রের একটা সেরা ছবি। এর মধ্যে উল্টোরথ সিনেমাজগৎ তখন রমরম করে চলছে। এদের ওই সাহিত্য, সিনেমার মিকশ্চার তখন খুবই জনপ্রিয়। পূজা সংখ্যায় বাংলার সব নামীদামি লেখকরাই লেখেন। আমার 'নয়াবসত'ও 'উল্টোরথেই' বের হয়েছিল। পরে উপন্যাসা কারে প্রকাশিত হয় বর্ধিত কলেবরে।

ওই উদ্বাস্তু সমস্যাকে ভুলিনি। তখন দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের বসতি করা হচ্ছে। গহন অরণ্যকে কেটে পড়ছে মানুষ নতুন উপনিবেশ। আমেরিকায় প্রথম দিকে এমন দুর্গম গহন অরণ্যে গেছে ইউরোপ থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু। তারা বন কেটে বসত গড়েছে। সেই জীবন সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে মহৎ সাহিত্য। ন্যুট হ্যামসনের গ্রোথ অফ দি সয়েল, দি ইমিগ্রান্টস্, জন টেনেবেকের গ্রেস্ অব র‍্যাথ" এগুলো পড়ে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম আমাদের উদ্বাস্তুদের এই আরণ্যক পটভূমিকায় জীবন সংগ্রামকে দেখতে, জানতে।

তাই বের হয়ে পড়লাম দণ্ডকারণ্যের গহনে। আবার কিছুদিন আগে সাহিত্যিক নারায়ণ সান্ন্যাল মশাই ছিলেন দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টর ইঞ্জিনিয়ার। তিনিও ওই পটভূমিকায়

লিখেছেন বকুলতলা পি-এল ক্যাম্প, তখন উদ্বাস্তুরা সবে ক্যাম্পে যাচ্ছে।

আমি গেলাম পরে, তখন ওরা গ্রামবসত গড়ে অরণ্যভূমিকে ফলবতী করে নিজেদের পায়ের তলে মাটি পাবার চেষ্টা করছে। একমাসাধিক কাল থেকে দণ্ডকারণ্যের তিনটে সেকটারে ঘুরেছি। অবশ্য সেটা সম্ভব হয়েছিল তৎকালীন ডি-ডি-এর চেয়ারম্যান ডঃ নবগোপাল দাশ মশায়ের সৌজন্যে সেই সংগ্রামী জীবন নিয়ে বেশ কিছু লিখেছিলাম। আমার সাহিত্যকর্মে মানুষের সেই সংগ্রামের কাহিনীও ঠাঁই পেয়েছে বার বার।

এবার বোম্বাই যাবার পালা। প্রাথমিক চিত্রনাট্য পাঠিয়ে দিয়েছি। শক্তিবাবু এবার যেতে লিখেছিলেন। ওর এখানের ছবির পরিবেশক ছিলেন দাগা পিকচার্স-এর মালিক শিউবক্স দাগা।

দাগাজীই জানালেন—আপনার প্লেনের টিকিট পাঠাচ্ছি, পরশু সকালের ফ্লাইট-এ যেতে হবে বোম্বাই।

এতদিন কলকাতার পরিবেশে সাহিত্যচর্চা করার চেষ্টা করেছি। সেইসঙ্গে এখানের সিনেমা জগতেও ঢুকে পড়েছি। পুরোপুরি না হলেও কিছুটা বটেই। এখানকার সিনেমা জগতে তখন একটা সুন্দর কাজের পরিবেশ ছিল।

বেশ কয়েকজন প্রযোজক পর পর ছবি করছেন। তাদের নিজস্ব ইউনিট রয়েছে। এছাড়া নিয়মিত ছবি করছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী, অগ্রগামী তরুণ মজুমদার, কনক মুখুয্যে, সুখেন দাস, সলিল দত্ত, চিত্ত বসু, অসীম সরকার, কার্তিক বর্মন, বেঙ্কটেশ ফিল্মস, দাগা পিকচার্স, আরও অনেকে।

এবার এই জগৎ থেকে যেতে হচ্ছে বোম্বাইয়ের চিত্রজগতে। তবু আর একটা জগৎকে দেখা হবে। সেখানে আরও বড় পরিধি। সর্ব ভারতীয় স্তরের লেখকরা সেখানে কাজ করেন। সেখানেও পা রাখতে হবে।

সকালের ফ্লাইট। সেবার 'মেঘে ঢাকা তারার' সময় ফেরার সময় প্লেনে যা ঘটেছিল আবার তেমন যদি কিছু হয়, কিছু করার নাই। ট্রেন, বাসে তবু থামলে নেমে পড়লে মাটিতে পা পাবো। আকাশে তো তার উপায় নেই। মাটি পেতে আর হবে না।

তখন স্কাই মাস্টার প্লেন-এর বদলে বোম্বে রুটে বোয়িং চালু হয়েছে। তবে ন্যাভরো প্লেন কিছু আছে। সেগুলো চলে দিল্লির রুটে। আর প্রপেলার আছে কিন্তু বোয়িং চলে টারবো জেটে, এগুলো এয়ার প্রেসারাইজ ড্যাকাটায় উঠলে কানে তালা লাগে। সে এক বিরক্তিকর ব্যাপার। মাটিতে নেমেও পনেরো বিশ মিনিট লাগে কান স্বাভাবিক হতে, আমাকে কানে তুলো গুঁজে বসে থাকেন।

এসব প্লেনে ওসব ব্যাপার নেই। সময়ও কম লাগে। অনুমান আড়াই পৌনে তিন ঘণ্টার ফ্লাইট। বোম্বাই-এর আগে গেছি নিছক বোম্বাই দর্শন করতে ট্যুরিস্টের মেজাজ নিয়ে। কোন ভাবনা ছিল না, এবার যেতে হচ্ছে সেই জগতে লড়াই করে পা রাখার জন্য।

দমদম এয়ারপোর্ট-এর তুলনায় বোম্বাই-এর সান্তাক্রুজ (এখন নাম করা হয়েছে ছত্রপতি শিবাজী এয়ারপোর্ট) এয়ারপোর্ট অনেক কর্মব্যস্ত। আয়তনে কলকাতার রানওয়ে পরিধি সান্তাক্রুজের চেয়ে বড় হলেও—বোম্বাই ভারত থেকে পশ্চিম দুনিয়ার বহির্দ্বার। তাই সেকালে নানা দেশের প্লেন ভিড় করে থাকে, ডোমেষ্টিক ফ্লাইটও অনেক বেশি। তাই রানওয়ে খুবই কর্মব্যস্ত।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালা নেমে গেছে আরব সমুদ্রের দিকে, বোম্বাই শহরের সীমা শুরু হয়েছে। পাহাড়ের উপত্যকায় বড় বড় বাড়ি, কারখানা সুন্দর পথঘাট, কর্মব্যস্ত শহরতলী।

প্লেন গিয়ে নামলো বিমানবন্দরে। প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে গিয়ে দেখি সামনেই শক্তি সামন্ত নিজে এসেছেন আমাকে রিসিভ করতে। প্লেনের থেকে মালপত্র এনে ফেলা হচ্ছে কনভেয়ার বেল্টে, সুটকেশ ব্যাগ সব বেল্টে এগিয়ে আসছে। তার থেকে যে যার লাগজ তুলে নিচ্ছে।

আমার সুটকেশও উদ্ধার করে এবার গাড়িতে উঠলাম। ঝকঝকে জাপানী টয়েটা. উর্দিপরা ড্রাইভার—বাহাদুর। গাড়ি চলছে এয়ারপোর্ট থেকে নটরাজ স্টুডিওর দিকে কর্মব্যস্ত গুজরাট হাইওয়ে ধরে, ঝাকঝাকে শহর। গাড়ির ভিড়ও বেশি। এই সান্তাক্রুজ, আন্ধেরী অঞ্চল বোম্বাই শহরের শহরতলীই। কিন্তু এরাও শহরের তুলনায় কম কিছু নয়।

গাড়ি গিয়ে ঢুকলো নটরাজ স্টুডিওর মধ্যে, ওদিকে বেশ কিছু প্রযোজকদের ঘর। প্রথমে শক্তিবাবুর শক্তি ফিল্মস্ তারপর দেখলাম রামানন্দ সাগর এন-সি-শিপ্পী প্রমোদ চক্রবর্তী আরও অনেকের ঘর। মাঝখানে পুরোনো আমলের একটা বাংলো, বেশ কিছু আম, দেওদার অন্য গাছও রয়েছে।

ওদিকে কয়েকটা ফ্লোর, ওপাশে প্রজেকশন রুম, শক্তি ফিল্মস্-এর এডিটিং রুম।

শক্তিবাবুর বাইরের ঘরে প্রডাকশান ম্যানেজার বসে, পিছনের ঘরে ক্যামেরা, মাউন্টের যন্ত্রপাতি, লোকজনরা, এপাশে শক্তিবাবুর নিজের চেম্বার। মেজেতে পুরু কার্পেট পাতা। কয়েকটা সোফা ওদিকে শক্তিবাবুর চেয়ার। র‍্যাকে বিভিন্ন ছবির নানা ক্র্যাহয়ার্ড।

কফি এসে গেছে। কফি খাওয়ার পর চিত্রনাট্য পড়া শুরু করলাম। বোম্বাই স্টুডিওতে পা দিয়ে দেখলাম, এঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে যে যার কাজ করেন। সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলে এখানে সবাই।

ওদিকে শক্তি ফিল্মস্-এর 'অনুরাগ' ছবি শেষ হয়েছে, তার রিলিজ হবে সারা ভারতে। তারই তোড়জোড় চলছে।

তখন শক্তি ফিল্মসের ওর্লিতে, ফেমাস স্টুডিওতে। সেই বোম্বাই শহরে। আর আন্ধেরীতে নটরাজ স্টুডিওতে এদের প্রডাকশন অফিস। ছবি তৈরির কাজকর্ম এখানেই হয়, আর ছবির মার্কেটিংগুলোর কাজ, ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজ হয় ওই ফেমাস স্টুডিওর লাগোয়া অফিসে। দূরত্ব কম নয় তাই চেষ্টা করছেন ওরা নটরাজ স্টুডিওর

লাগোয়া সদ্য নির্মিত স্বামী স্টুডিও বিলডিং-এ সেই অফিস আনতে।

এর মধ্যে ইউনিটের কর্মীদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেন। তখন শক্তিবাবুর প্রধান সহকারী কপিলজী, দ্বিতীয় সহকারী পরিচালক এক বঙ্গসন্তান প্রভাত রায়, তৃতীয় সহকারী নদীয়ার ছেলে জ্যোতিপ্রকাশ রায় হিসাবপত্র দেখে সোদপুরের অজয় চন্দ, আর বর্ধমানের উঘরার সিন্‌হা। প্রডাকশন ম্যানেজার বরানগরের বঙ্গসন্তান মনোজ অধিকারী। ক্যামেরাতে চিফ ক্যামেরাম্যান শ্যামবাজারের ছেলে আলো দাশগুপ্ত, তার সহকারী সোনারপুরের রবীন কর। ফিল্ম এডিটার আসাম প্রবাসী বিজয় চৌধুরী।

দেখে মনে হলো আমি বোম্বাই-এ নেই। যেন কলকাতার স্টুডিওর কোন ইউনিটেই রয়েছি। ওরা তাদের দলে আর এক বাঙালিকে পেয়ে খুশি।

চিত্রনাট্য করার পর শক্তিবাবুর কিছু বক্তব্য নোট করছি। সেই মত পরিবর্তন করতে হবে। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে।

স্টুডিওর ক্যানটিনেই স্টাফরা লাঞ্চ করে।

শক্তিবাবু বলেন চলুন লাঞ্চ করা যাক।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখি বড় টিফিন কেরিয়্যারে শক্তিবাবুর বাড়ি থেকে লাঞ্চ এসেছে। বাসমতি চালের ভাত, কিছু ফুলকা অর্থাৎ ছোট সাইজের রুটি, হটপটে বেশ গরম রয়েছে। সঙ্গে ডাল-বেগুন ভাজা-শুকতো-পোস্ত, মাছ, দই।

একেবারে খাঁটি বাঙালি খাবার। শক্তিবাবুর আদি বাড়ি বাঁকুড়া বর্ধমান সীমান্তের গ্রামে, তাই পোস্ত ঠিকই এসেছে।

বোম্বাই-এ বাঙালি খাবার মেলা মুস্কিলই সেটা পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম, তাই এখানে বাঙালি খানা দেখে ভালো লাগে।

লাঞ্চের পর কফিও এলো।

আবার কাজ শুরু করেছি। সেদিন দিল্লিতে রোভার্স কাপের ফাইন্যাল চলছে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে। যেখানে বাঙালি সেখানেই ফুটবল।

রেডিওতে রিলে শুনছে বাইরের হলে সকলে।

এমন সময় এক ফর্সা পাতলা চেহারার ধুতি আদ্দির পাঞ্জাবী পরা বয়স্ক বঙ্গসন্তান ঢুকতে শক্তিবাবু উঠে দাঁড়ান।

—আসুন দাদা, বসুন।

দেখি শচীন দেব বর্মন। আমিও নমস্কার করলাম তাঁকে।

হাতে একটা লাঠিও রয়েছে তাঁর। তবে সেটার ওপর নির্ভর যে করেন না তাও মনে হলো। কথায় বাঙাল টান!

কথাবার্তা চলছে। মাঝে মাঝে ছেলেদের শুধোন রেজাল্ট কি হইল? ইস্টবেঙ্গল কয় খান দিছে?

ছেলেরাও খবর জানাচ্ছে? দেখে মান হলো বেশ চিন্তিত ওই রেজাল্ট সম্বন্ধে কারণ ইস্টবেঙ্গল তখনও গোল করতে পারেনি। দিল্লিতে খেলা ড্র চলেছে।

শক্তিবাবু বলেন—মোহনবাগান জিতে যাবে দাদা।

শচীন কর্তা বলেন—চুপ মাইরা থাকো। যত্তোসব ঘটির দল।

তখন শচীনকর্তা বোম্বাই চিত্রজগতের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি। একটার পর একটা ছবিতে তার গান সারা ভারতবর্ষ—এমনকি বাইরের যেসব দেশে হিন্দি ছবি যায় সেখানের দর্শকদের মন জয় করেছে। তার মত হিট ছবির রেকর্ড কারও নেই।

নিজের গলার গানও দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। গাইড, আরাধনা, অমর প্রেম, প্রভৃতি ছবিতে তার গানও সাড়া তুলেছিল। তখন নায়করা কিছু কামিয়েছেন। বেছে বেছে দু'চারটে ছবিতে কাজ করছেন।

মোহিনীর সঙ্গে আমিও কলকাতায় থাকাকালীন তার হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে গেছি। সেসব কথাও হচ্ছে।

এমন সময় কলরব ওঠে। ইস্টবেঙ্গল গোল দিয়েছে আর সেই গোলেই ইস্টবেঙ্গল রোভার্স কাপ জয়ী হয়েছে।

শচীনকর্তাও খুশিতে ফেটে পড়ে বলেন, —রবীন, সকলের জন্য কফি দিতি কও। ইস্টবেঙ্গল জিতছে—আমিই কফি খাওয়াইছি।

একটু আগেই কফি খেয়েছি, তাই বলি, —আমি খাবো না। একটু আগেই খেয়েছি।

শচীন কর্তা শুধোন—কই থাকা হয় কলকাতায়?

আমি জানাই—উত্তর কলকাতায়, সিঁথিতে।

শচীন কর্তা বলে ওঠেন—বুঝছি। মোহনবাগানের সার্পোটার।

টিম হারছে বুকে ব্যথা পাইছেন, কফি খামুনা কন্!

শক্তি ফিল্মস্-এর প্রডাকশন কনট্রোলার ছিলেন শক্তিবাবুর ছোটভাই গিরিশবাবু। দিল খোলা সজ্জন ব্যক্তি। নিজেও খুব কাজের লোক। স্টাফদের সঙ্গে একেবারে সহজ সম্পর্ক, তাই যে কোন কাজই হোক সহজেই তুলে নিতে পারতেন।

এয়ারপোর্ট থেকে নেমে স্টুডিওতেই কাজ করে এবার বৈকালে শক্তিবাবু আমাকে নিয়ে বের হলেন থাকার ব্যবস্থা করতে। গাড়ি চলেছে, পথে ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়াতে কোন ভিখারী এগিয়ে আসে। ড্রাইভার খেয়াল করেনি। শক্তিবাবুই বলেন

—আর বাহাদুর দেখ—দে উস্‌কো কুছ!

ড্যাসবোর্ডে একটা প্লাস্টিকের পাত্রে কিছু খুচরো রাখা তার থেকে কিছু দিয়ে দিল তাকে বাহাদুর। এই খুচরো পাত্রটা ঠিকমত রাখাই থাকে—কিছু না কিছু যে আসে তাকেই দিতে হয় বাহাদুরকে।

শক্তিবাবুর বাড়ি সান্তাক্রুজ ওয়েস্ট অঞ্চলে সিং কিং রোডের এরোপ্লেনওয়ালা পার্কের কাছেই। তিনি চান কাছাকাছি কোন হোটেলে আমাকে রাখতে যাতে যোগাযোগটা সহজ হয়। সহজেই যাতায়াত করতে পারি।

দু'একটা হোটেল দেখা হলো, কিন্তু শক্তিবাবুরই ঠিক পছন্দ হলো না। শেষে 'খার' এলাকায় হোটেল ওরিয়েন্টাল প্যালেসেই থাকার ব্যবস্থা হলো। সাততলা বেশ

বড় বাড়ি, পার্কিং সটও আছে। সর্দারজীর হোটেল। ছ'তলার একটা রুমে উঠলাম। রুম টেলিফোন এটাচজ বাথ, ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট, মিউজিক চ্যানেল এয়ার কুলার সবই মজুত। তখন বোধহয় বাহাত্তর, তিয়াত্তর সাল, রুম রেন্ট ছিল মাত্র আশি টাকা। এর সঙ্গে বেডটি, আর ব্রেকফাস্টও দেবে তারা।

ব্রেকফাস্টও ছিল জব্বর। ফ্রুটজুস, চারটে টোস্ট সঙ্গে মাখন জ্যাম, কলা, ডবল ডিমের ওমলেট, চা কিংবা কফি। নিরামিষদের জন্য থাকত দুধ পরীজ না হয় পুরি সবজী, বেলা নটায় খেলে দুপুরে সামান্য খেলেই চলে যায়।

হোটেলের ঘরে বসেই বাংলা চিত্রনাট্যের পরিবর্তন, পরিমার্জনা করি।

অচেনা শহর, সাততলার ব্যালকনি থেকে দেখা যায় বোম্বাই শহরের বেশ কিছুটা। প্রাসাদ আর দশ-বারোতলা বাড়ির ভিড়, দূরে চেম্বুর তার ওদিকে পাহাড়গুলো. বোম্বাই শহরের মাটিও পাথুরে। তবে এই মাটিতে আম, নারকেল, দেওদার ভালোই হয়।

নিঃসঙ্গ আমি। হোটেলে মুখ বুজে কাজ করি, সবদিন স্টুডিওতে বের হই না। কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি।

বোম্বাই শহরে সূর্য অস্ত যায় কলকাতায় দেড় ঘণ্টা পরে, আমাদের যখন সন্ধ্যা তখনও ওদের ওখানে বৈকালের আলো থাকে।

আবার আমাদের এখানে ভোর হয় ছটার আগেই। ফর্সা হয়ে যায় তখন আকাশ আমরা সেই সময় উঠতে অভ্যস্ত। কিন্তু বোম্বাই-এর ঘুম তখনও ভাঙেনি। অন্ধকার রয়েছে। আমার এই সময়ের পরিবর্তনটা বিশ্রী লাগে। হোটেলও কেউ জাগেনি। চাও মিলবে না।

তবু একটু ফরসা হতেই বের হয়ে পড়ি।

এদিকে বাড়িগুলো তখনও বাংলো প্যাটার্নের ছিল। প্রত্যেকটা বাড়িতেই কিছু ফাঁকা জায়গা আর সেখানে নারকেল দেওদার, আম, আতা ইত্যাদির গাছ। না হয় ফুলের বাগান, গাছগাছালি ভরা রাস্তা একটা সাজানো পার্কও আছে।

কিছু দূরেই বোম্বের রামকৃষ্ণ মিশন।

পথের দু'দিক জুড়ে মঠ মিশন। একদিকে সুন্দর গাছগাছালির মধ্যে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ দেবের মন্দিরের আদলে তৈরি সুন্দর মন্দির। মার্বেল পাথরের মেজে বেদিতে শ্রীঠাকুর-মায়ের মূর্তি। ওদিকে সন্ন্যাসীদের থাকার ঘর, ওপাশে মা সারদাদেবীরও মন্দির। গাছে গাছে সবুজ ফুলে ফুলে ভরা ওই ব্যস্ত যন্ত্রসভ্যতার কলরবের মধ্যেও প্রশান্তির স্পর্শ আনে।

পথের এদিকে হাসপাতাল, বিশাল লাইব্রেরি পাঠকক্ষ। গেস্টহাউস আর সবুজ মাঠ। বিস্তীর্ণ এলাকার চারিদিকে অসংখ্য ফলবান নারকেল গাছের বেষ্টনী।

শ্রীঠাকুরকে দেখে মনে এলো এক নির্ভর। এখানেও তুমি আছো। প্রতিদিন সকালে মন্দিরে যাই, প্রণাম করে হোটেলে ফিরে কাজে বসি।

শক্তিবাবু 'নয়াবসত' উপন্যাসের শেষটাকে ঠিক মেনে নিতে পারেননি। উপন্যাস ছিল অরণ্যচারী অসামাজিক মধু চৌধুরী তরুণ পুলিশ অফিসারের হাতে তার প্রেয়সীকে তুলে দিয়ে বনের মানুষ সেই যাযাবর জীবনেই ফিরে যায়।

কিন্তু শক্তিবাবুর বক্তব্য মধুর মত একটা বুনো—সমাজ বিতাড়িত মানুষকে সমাজে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাকে মানসিক পুনর্বসতি করাতে হবে। আমি তখন মধুকে ওই অবস্থায় আনতে মত দিতে পারিনি।

শক্তিবাবু বলেন, ওটা শেষের মুহূর্ত। পরে আরও ভাবনাচিন্তা করা যাবে। এখন পুরো স্ক্রিপ্ট রেডি হোক।

হোটেল থেকে শক্তি বাবুর বাড়ি বেশি দূরে নয়।

বৈকালে অফিসফেরত আসেন শক্তিবাবু। আমাকে বাড়িতে নিয়ে যান, সেখানে স্ক্রিপ্ট পড়া হয়।

শক্তিবাবু চিত্রনাট্যের ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতে। ঠিক মনোমত নাহলে উস্‌খুশ করেন। আর পছন্দ হলে চুপচাপ শোনেন। সামগ্রিক ভাবে চিত্রনাট্য লেখা হলো।

মাঝে মাঝে স্টুডিওতে যাই। ওখানে জগত সঙ্গে পরিচিত হই। স্টুডিওতে দুপুরের লাঞ্চের সময় ওখানে অনেক বঙ্গসন্তানই এসে হাজির হন শক্তিবাবুর বাঙালি খানার জন্যই। কোন কোন দিন দশ-বারোজনও জুটে যান। স্টুডিওতে কাজ থাকলে হৃষিকেশ মুখুয্যে, ফণী মজুমদার ইত্যাদিও এসে হাজির হন।

এসে পড়ে গৌরী প্রসন্ন মজুমদারও। বলে—মনোজ, আগে না এলে তুমিই সব গিলে ফেলবে।

দীর্ঘ ছ ফিটের উপর লম্বা। হোটেলেও এক-একদিন আসেন। শুলে হোটেলের প্রমাণ সাইজের খাট থেকে দুটো পা বাইরে থাকে। মুখে পান-পরাগ আর তেমনি জমাটি গল্প। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিল গৌরীবাবু। পরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি গীতিকার হয়েছিলেন।

প্রথম বার সপ্তাহ তিনেক থেকে বাংলা চিত্রনাট্যের কাজ শেষ করে চলে এলাম। তখন ওরা 'অনুরাগ' ছবির রিলিজ নিয়ে ব্যস্ত। ওই সব ব্যাপার চুকে গেলে তখন নয়াবসত ছবিতে হাত দেবেন। এই ছবিতে গান লেখার কথা হলো গৌরীবাবুর সঙ্গেই।

শক্তিবাবু এর মধ্যে ওর পরিকল্পনার কথাও বললেন বাড়িতে বসে। ইতিমধ্যে আমি ওদের পরিবারের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠেছি।

শক্তিবাবুর বাড়ি বর্ধমান বাঁকুড়ার সীমান্তে এক ছোট্টগ্রামে। গ্রামের নাম 'বোথরা'।

শক্তিবাবুর বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, ওর কাকা থাকতেন ইউ পি-তে। বড় মিলিটারি কনট্রাকটর। শক্তিবাবুর বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর তিনি কাকার কাছে ইউ পি-তেই মানুষ। আই-এস-সি করার পর ইচ্ছা ছিল ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ার, কিন্তু সেবার বয়স কম থাকার জন্য ইন্‌জিনিয়ারিং এ চান্স পাননি, তাই চলে এলেন দেশের কাছে বাঁকুড়া কলেজে বি-এস-সি পড়তে।

বাঁকুড়া কলেজ থেকেই বি-এস-সি পাশ করেন। থাকতেন ব্রাউন হোস্টেলে। তখন থেকেই বেশ ডানপিটে ধরনের। বাঁকুড়া কলেজ ট্যাস্ক রোজ সকালে দুবার পারাপার করা ছিল দিনের প্রারম্ভিক কর্মসূচি।

বি-এস-সি পাশ করে ইউ পি-তে ফিরে তিনিও মিলিটারি সাপ্লাই-এর টুকটাক

কাজ শুরু করলেন বড় সাপ্লায়ার কাকার অগোচরেই। প্রথম থেকেই নিজে কিছু করার আগ্রহ তার।

প্রথমে বেশ কিছু ক্যাম্পখাট সাপ্লাই-এর অর্ডার পেলেন, সেটা করে বেশ কিছু টাকাও হাতে এলো। সেই সঙ্গে গানের দিকেও ঝোঁক ছিল, ওরা থাকতেন 'বাদাউন-এ'। সেখানেও উচাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা ছিল। শক্তিবাবু গানের তালিমও নিচ্ছেন। ওদিকে সাপ্লাই এর কাজও চলছে, কিন্তু কাকার কাছে সে খবরটা পৌঁছে যেতে কাকা একটু অখুশিই হন।

শক্তিবাবুর ব্যক্তিত্বে লাগে। বের হয়ে পড়লেন আর বোম্বাই পুনে রোডের ধারে এক মনোরম পাহাড়ী উপত্যকায় 'খাপৌলি'-তে এক মিশনারি স্কুলে অঙ্কের শিক্ষকের পদও পেলেন।

মাস্টারি করছেন, আর স্বপ্ন দেখেন বোম্বাই-এর চিত্রজগতে কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হবেন। তাই মাঝে মাঝে বোম্বাই এসে স্টুডিওগুলোতে ঘোরাঘুরি করেন।

তখন মালাড-এ বোম্বে টকিজের খুব নাম ডাক। পুনাতে রয়েছে প্রভাত স্টুডিও। মালাডে তখন সবই ফাঁকা, দূরে সমুদ্রের বেলাভূমি, লোকজন বসতি বিশেষ নেই বোম্বে টকিজের আশপাশে। সেখানেই আসতেন আর অশোককুমার তখন বোম্বে টকিজের হিরো। জনপ্রিয় অভিনেতা।

ফণী মজুমদার পরিচালক হিসাবে যুক্ত ছিলেন নিউথিয়েটার্স-এর সঙ্গে। তার সায়গলকে নিয়ে 'সাম্বী' ছবি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। নায়িকা ছিলেন কানন দেবী। ফণীবাবু তখন বোম্বাই বোম্বে টকিজে ছবি করছেন। শক্তিবাবু অশোককুমারের সান্নিধ্যে আসেন। তখনও খাপৌলির মিশন স্কুলের শিক্ষক রয়েছেন শক্তিবাবু। শিক্ষকতা ছেড়ে ফিল্মের অনিশ্চয়তার মধ্যে আসতে নিষেধই করেন অশোক কুমার। তাছাড়া কণ্ঠশিল্পীর তখন বিশেষ কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল না।

শিক্ষকতায় মন বসে না। এমনি দিনে সেই মিশনারি স্কুলের কর্তৃপক্ষ শক্তিবাবুকে আফ্রিকায় তাদের কোথায় কোন মিশনারি স্কুলে যোগ দিতে বললেন। শক্তিবাবুর চোখে তখন রুপোলি জগতের স্বপ্ন।

স্কুলের চাকরি ছেড়ে চলে এলেন বোম্বাই-এ। তখন বেকার, শেষে অশোককুমারের চেষ্টাতেই বোম্বে টকিজে ফণী মজুমদারের সহকারী পরিচালক হয়ে ঢুকলেন।

তারপর দীর্ঘ পথ, বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসে আজ পায়ের তলে মাটি পেয়েছেন। সান্তাক্রুজের মত অভিজাত এলাকায় বিশাল জায়গা নিয়ে বাংলো, বাগান-গ্যারেজে তিন চার খানা দেশী বিদেশী গাড়ি, অন্য ব্যবসাপত্র।

ওর স্ত্রী বাঁকুড়ারই মেয়ে, বাঁকুড়ায় সাহানা পরিবারে তখন সতী সরস্বতী দুজনেরই কৃপা ছিল। নানা ব্যবসা, হাজারীবাগে মাইকার ব্যবসা, মাইনস, ওই বাড়ির শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি বিখ্যাত গবেষক, প্রবন্ধকার।

সেই পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন শক্তিবাবু, আর তার ছোটভাই গিরিজা বাবু বিয়ে করেছিলেন বাঁকুড়ার ওন্দার কাছের এক গ্রামের ধনাঢ্য হাজরা পরিবারে, বাঁকুড়ার পাতাকোলায় তাদের বড় রাইস মিল, অন্য ব্যবসাপত্রও ছিল, আমিও বাঁকুড়ার লোক, তাই অন্দর মহলের সঙ্গেও পরিচিতি ঘটতে দেরি হয়নি।

এর মধ্যে ইউনিটের ছেলেদের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছে। চিত্রনাট্যের কাজ আপাতত শেষ করে ফিরলাম কলকাতায়। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হলে তখন যেতে হবে।

সে সময় যতদূর মনে পড়ে প্লেনের ভাড়া ছিল পাঁচশো টাকা করে।

কলকাতায় ফিরে আবার সেই চাকরি, সন্ধ্যায় বইপাড়া-উপন্যাসের আড্ডা বসে তবে তখন মধ্যমণি প্রসাদ সিংহ আর নেই। গিরীন বাবুই দেখাশোনা করে আর প্রফুল্ল বসুও বসছে।

•

ববি বসু ছিল প্রসাদের আমলে। তরুণ চিত্রসাংবাদিক। প্রথমে রূপাঞ্জলি পত্রিকায় ছিল। ক্রমশ উল্টোরথ, সিনেমা জগতের জয়যাত্রা শুরু হতে রূপাঞ্জলি, রূপমঞ্চ সেই দৌড়ে পিছিয়ে গেল।

এক ঝাঁক তরুণ ফটোগ্রাফার রিপোর্টার এলো প্রসাদের কাছে। ববি বসু, আশিসতরু মুখোপাধ্যায়, শ্রী পঞ্চানন, তারাপদ আরও অনেকে এল। ববি বসুর কলমও ছিল বেশ সরস। সহজেই সকলের সঙ্গে মিশতে পারত।

সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ রোডের মোড় থেকে পকৌড়া আর মুড়ির আসর বসত।

হঠাৎ প্রসাদ চলে গেল। সেই প্রথম প্রকৃত বন্ধু বিয়োগ ব্যথা অনুভব করলাম। সাহিত্য জগতের কেন চিত্র জগতেরও ক্ষতি হলো প্রভূত। প্রসাদ যাতে হাত দিত তাতেই সার্থক হত।

উল্টোরথ পত্রিকার তখন স্বর্ণযুগ। সারা বাংলার কোণে কোণে ছিল এর প্রচার। পুজো সংখ্যা ট্রাকে করে আসানসোল যেত—ওই অঞ্চলে ট্রাক ভর্তি পত্রিকা যোগাতে হত।

প্রসাদ একটা ছবিও করেছিল, 'মণিহার'। সেই দিন বুঝেছিলাম চিত্র প্রযোজক হিসাবেও ও সফল, মণিহার ছবির গান আজও লোকে ভোলেনি। আর সেই ছবিও সুপার, ডুপার হিট করেছিল, কিন্তু প্রসাদ চলে গেল।

মোহিনী চৌধুরীর সঙ্গেও দেখা হয়, তবে কম। তার আগে ওখানেই ছিল রবিবারের আড্ডা। মোহিনী তখন শৈলজাদার ছবির গান ছাড়াও কিছু গান লিখছে। রবিবার ওর বাড়িতে যেতাম। আসত অমল ঘোষ হাজরা, তখন সে ডাক্তার, আসত ডাঃ স্বরাজ সান্ন্যাল, অশোক সরকার। বেল দুটো তিনটে অবধি ওদের বাগানে পার্টি পেতে আড্ডা জমত। বাড়ি থেকে আমাদের খাবারের ডাক আসছে, উঠি না। শেষে মোহিনীর বাবা এসে বলেন।

—খেতে হয় গিয়ে খেয়ে নাও। বাড়ির লোকে না খেয়ে আছে। আর আড্ডাই

যদি এখনও দিতে হয় পাটি তুলে অন্যত্র গিয়ে আড্ডা জমাও। না খেয়ে গেরস্থের অকল্যাণ করো না।

বাধ্য হয়ে আড্ডা ভেঙে পাতে গিয়ে বসতাম।

সেই আড্ডাও গেছে। কারণ মোহিনী সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সিনেমা লাইনেই পাকাপাকি ভাবে ভিড়ছে। এতদিন গান শিখছিল। আর চাকরিও করছিল। ওর ভালো গানের অধিকাংশ লেখা হয়েছে এই সময়ই।

কিন্তু শৈলজাদার ছবিতে গান লেখার পর ফিল্ম লাইনে যাতায়াত করতে করতে ওর মাথায় ঢুকলো শুধু গান শিখলেই হবে না। তাকে পরিচালক হতে হবে। ছবি তৈরি করবে সে।

আর ছবির পরিচালক হতে গেলে সব সময়ই ওই নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। ওর আশেপাশে দু'একজন এর মধ্যে জুটেও গেছে। তারাও ওকে পরামর্শ দেয়—প্রযোজক জুটে যাবে। টাকার অভাব হবে না। তুমি ছবি করো। আমরাও সঙ্গে আছি।

আমি ওকে বারবার বলতাম—গান লিখছ লেখো। পায়ের তলে তবু শক্ত মাটি একটা আছে। এটাকে মুছে ফেলে অনিশ্চিতের পিছনে দৌড়োও না।

তখন মোহিনী বিয়েও করেছে। আসানশোলে ওর শ্বশুরমশায় থাকেন। মোহিনীর চাকরি ছাড়ার কথায় ওর বাবাও মত দেন না। তাই নিয়ে বাড়িতেও অশান্তি হয়।

কিন্তু মোহিনী তখন নিজেই একটা গল্প লিখে চিত্রনাট্যও করেছে। যতদূর মনে পড়ে ছবির নাম দিয়েছিল 'প্রতিভা' না কি যেন। চাকরি ছেড়ে সে এবার ডিরেকশানের কাজেই নেমে পড়ল।

তখন উত্তর কলকাতার দক্ষিণেশ্বর ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিও ছিল। সেখানেই কয়েকদিন শুটিংও করলো। মোহিনী তখন গান শোনার কাজ কমিয়ে ছবির পরিচালনার কাজেই নেমে গেল।

কিন্তু সেই ছবির কাজও ঠিকমত হচ্ছে না। যারা টাকা দেবার কথা বলেছিল তাদের অনেকেই সরে গেছে। মোহিনীও বিপদে পড়েছে। চেষ্টা করছে টাকার জন্য। তার জন্যই সে সব কাজ ফেলে রেখে হন্যে হয়ে ঘুরছে। যে ভাবে হোক ছবি শেষ করতেই হবে। তখন ওর গলায় কাঁটা বেঁধার মত অবস্থা। না পারে গিলতে না পারে ফেলতে।

ও ছিল মনেপ্রাণে কবি। কল্পনাপ্রবণ মন। তাই ওর গানে রোমান্টিসিজম দেশপ্রেম সবই সমানভাবে প্রতিভাত হত। কিন্তু সেই প্রতিভা ওই চিত্রপরিচালকের খেয়ালের জন্য ঠিক যতটা প্রতিভাত হবার কথা তা হতে পারেনি। তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পথেই এটা মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নাহলে ওই হতো একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতকার—এ বিশ্বাস আমার ছিল। ও তখন বাড়ির পরিবেশের বাইরে এসে একদিকে নিজের সংসার অন্যদিকে ওই ছবির

সমস্যা নিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। অসহায় দর্শকের মত বন্ধুর এই অবস্থা দেখি মাত্র, করার কিছুই নেই।

তবু মোহিনী আমার বোম্বাই চিত্রজগতে পা রাখার কথায় খুশি। বলে—এককালে যাত্রা শুরু করেছি, থামবো না। দেখবে বন্ধ দুয়ার একদিন খুলবেই।

বেলেঘাটার দিনগুলো ভালোই কেটেছিল। ওইখানে থাকার সময় এই কনফারেন্সের জন্যই তখন বহু জ্ঞানী গুণী মানুষের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল।

তখনই প্রখ্যাত গায়ক ভীমসেন যোশীর সান্নিধ্যে এসেছিলাম। তখন তিনি প্রায় তরুণই। প্রথম কলকাতায় এসেছেন। এ কাননই ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল মহারাষ্ট্র নিবাসে।

তারপর প্রতিবৎসরই তিনি গাইতেন আমাদের অনুষ্ঠানে। আমি যে লিখি তাও জানতেন তিনি। মেঘে ঢাকা তারা ছবিতে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের প্রয়োগ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন—তেমন ছবি হলে আমিও গাইব।

কিন্তু তাকে কেমন ভাবে কোথাও ব্যবহার করতে পারিনি—এ দুর্ভাগ্যই। ভীমসেনই একদিন বলেছিলেন তার জীবন কাহিনী। বলেন—তোমার কাহিনীর চেয়েও করুণ।

ওর বাবা ছিলেন ডাক বিভাগের কর্মী। অকালে মারা যেতে ভীমসেন অনাথ হয়ে পড়েন। থাকা খাওয়ার উপায়ও নেই। শুনেছিলেন—কলকাতায় গেলে কিছু সুরাহা হতে পারে থাকা খাওয়ার। তাই বালক ভীমসেন এসে পৌঁছল অজানা শহর কলকাতায়। এখান ওখানে ঘোরে—শেষে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে বাসনপত্র মাজা—টুকটাক কাজ করার সুযোগ পেয়ে সেখানেই রয়ে গেল।

সেটা অভিনেতা পাহাড়ী স্যান্যালের বাড়ি। সেখানে গানবাজনার চর্চা হয়। ছোট্ট ছেলেটা উৎকর্ষ হয়ে শোনে সেই গান। সব কাজের মধ্যেও তার মনে সেইসব স্বর গুনগুনিয়ে ওঠে, তাকে গানই শিখতে হবে।

আড়ালে সরগমও করে। মনে তার গানের তৃষ্ণা। সেই বাসনা নিয়েই ছেলেটি কলকাতা ছেড়ে পাড়ি দিল জলন্ধরে। সেখানে কোন ওস্তাদের আশ্রয়ে থেকে বেশ কিছুদিন তালিম নিয়ে ফিরে গেল পুনায়। কুমার গন্ধর্ব তখন কিরানা ঘরওয়ানার ধারক বাহক। সুরের ঘর।

সেখানেই গিয়ে আশ্রয় পেল। চলে অবিরাম ক্লান্তিহীন সাধনা। তবু হতাশা জাগে মনে। কিছুই হলো না—জগতে তার কাছে শূন্য। একদিন কি হতাশায় ছেলেটি তখন তরুণ, বের হয়ে পড়লো পথে পথে। পথে ঘোরে, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত।

একদিন কোন পাহাড়ঘেরা সবুজ কোন উপত্যকার কোন বসতির এক মন্দিরে গিয়ে গিয়ে হাজির হয়। সেদিন মন্দিরে কি উৎসব হচ্ছে, সেখানে ক্ষুধার্ত তরুণ কিছু প্রসাদ পাবে। সেই আশাতেই গেছে। মন্দিরে ভজন চলছে।

সেই তরুণও গানের নেশায় বসে পড়ল সেখানে। সেও ভজন গাইল। সাধা সুরেলা গলা। ভজনে যেন হৃদয়ের আকুতি ঝড়ে পড়ে। গাইলেন সেই বিখ্যাত ভজন।

—"যো হরি, নাম করে সদাই

অন্ত মে, সো পরম পদ পায়।"

সেই ভজন মুগ্ধ হয়ে শোনে সবাই। মন্দিরের অধ্যক্ষ মহারাজও খুবই খুশি। প্রসাদ তো দিলেনই, তরুণকে শিরোপা দিলেন একটি টাকা আর একটি নারকেল। আর দিলেন অকুণ্ঠ আশীর্বাদ।

স্তব্ধতা কমেছে মহারাষ্ট্র নিবাসের ঘরে। মৃদু শব্দে এয়ারকুলার চলছে, ভীমসেনজী বলেন—রাজপুরুজী, সেই পণ্ডিতজীর আশীর্বাদ আজ আমি হয়তো পায়ের নীচে জমিন পেয়েছি। সেই এক রূপেয়া আজ আমার কাছে হাজার হাজার রূপেয়া হয়ে এসেছে। পেয়েছি কত হাজার মানুষের হৃদয়ের প্রীতি ভালোবাসা।

দেখেছিলাম পুনারই আর এক সাধক গায়ক বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকরকে। ঋষিকল্প ব্যক্তি। সঙ্গীত সাধনাই তাকে যেন ঈশ্বর সান্নিধ্যে এনেছিল। তাই সুরে মানবীয় নয় কোন ঐশী মহিমারই প্রকাশ পেত।

বলছিলাম এই ঘরওয়ানারই আর এক সঙ্গীত সাধককে। তিনি ছিলেন বিনায়ক রাও পটবর্ধন। পরবর্তীকালের বিখ্যাত গায়িকা সুনন্দ পট্টনায়েক ছিলেন শিষ্যা।

পটবর্ধন জী ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—সাধক প্রকৃতিরই। আমাদের কনফারেন্সে নিয়মিত গাইতেন। সেবারও গাইতে বসবেন। প্যান্ডেল কানায় কানায় ভর্তি। মঞ্চেও পর্দা ফেলে পরবর্তী শিল্পীর সঙ্গতিয়াদের বসাতে হয়। শিল্পী বসেন, তারপর মঞ্চের পর্দা সরে যায়। সঙ্গতিয়াদের মধ্যে হারমোনিয়াম বাজান শিল্পীরই সঙ্গী কেউ, তবলায় বিখ্যাত কোন তবলিয়াকে বসায় অনুষ্ঠানের কর্তারা তানপুরাও উঠেছে। দেখি এক সারেঙ্গীওয়ালা সে বেসুরো বাজায় প্রায়ই, নাচের সঙ্গেই মূলত বাজায়, সেও আমাদের জিজ্ঞাসা না করেই সারেঙ্গী নিয়ে বসে পড়েছে।

আমি অনুষ্ঠান সম্পাদক। কে কে কার সঙ্গে সঙ্গতে বসবেন সেটা আমিই নির্ধারণ করে দিই শিল্পীর সঙ্গে পরামর্শ করে। ওকে বসাতে দেখে অবাক। ওর বসার কথাও নয়।

পণ্ডিতজী মঞ্চে উঠবেন আমিই বলি—পণ্ডিতজী ওই সারেঙ্গীওয়ালা বেসুরো বেপর্দায় মারে, ওকে রাখলে আপনার গড়বড় হতে পারে। ওকে তুলে অন্যজনকে বসাই!

পটবর্দ্ধনজী একবার দেখে হাসিমুখে বলেন।

—নেহি নেহি, কোই শিল্পীকো বেইজ্জৎ মৎ করো বেটা।

সো তানপুরা, হারমোনিয়াম আউর হামরা গলা হ্যায়। হম উস্‌কা সামাল লেগা। তুম্ ফিকির মৎ করো।

উস্‌কো রহনে দেও!

তারপর দেখলাম পণ্ডিতজী পুরো মেজাজে গাইলেন। সারেঙ্গীর কোন খামতি এতটুকু বোঝা গেল না। অনুষ্ঠানের শেষে সাবরঙ্গীওয়ালাকে বলেন—সাবাস বেটা!

একজন বড় উদার হৃদয় শিল্পীই ছিলেন তিনি।

দেখেছিলাম ওস্তাদ আমীর খাঁকে। নামেও আমীর, মেজাজেও আমীর। চেহারাতেও তেমনি মনোরম ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। তার কর্মেই শুনেছিলাম হংসধ্বনি বান্দাজ লাগি লগন!

মনে কী এক অনুভূতি এসেছিল। ঋত্বিককেও তাঁর সেই রেকর্ড শোনাতে ঋত্বিক 'মেঘে ঢাকা তারায়'—হংসধ্বনিকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। সেদিন তাদের টাকার জন্য দরাদরি করতে দেখিনি। বলতেন তিনি জিসেকে লিয়ে যিতনা জরুরৎ পড়ে ওহি শনাও। উস্‌কে অধিক নেহি।

রবিশংকরজীর ছিলেন আমাদের কনফারেন্সের নিয়মিত শিল্পী। তার এবং আলি আকবর খাঁ সাহেবের সেতার সরোদের যুগলবন্দীতে শেষ হত আমাদের চারদিনের অনুষ্ঠান।

রবিশংকরজী উঠতেন সাধারণত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। হোটেলের লিফটম্যান কিছু স্টাফদের ওই কনফারেন্সে প্রবেশের জন্য নিদেন চার-পাঁচটা পাস দিতে হত। রবিশংকরকে ওরা ধরত তিনিও তাঁদের অনুরোধ রাখতেন। উনষাট-ষাট সালের কথা বলছি, তখন তাদের অনুষ্ঠানের জন্য দেড় হাজার টাকা করে দিতাম এক-এক জনকে আজকে যুগলবন্দী অনুষ্ঠানে কত পড়ে তা জানি না।

রবিশংকরজী তখন এক সেতার শিল্পীর জীবন নিয়ে একটা ছবি করার কথা ভাবছেন। তখন ম্যান্ডেভিল গার্ডেনের বিপরীত দিকে হাজরা মোড়ের কাছে একটা দোতলা বাড়িতে থাকতেন উদয়শংকর, সেখানেও যেতেন রবিশংকর। ওই বাড়িতে থাকতেন সুচিত্রা মিত্র, তার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল তখন।

রবিশংকরজী অনিলকে নায়ক করার কথা ভেবেছিলেন, গল্প লিখতে হবে আমাকে। মাঝে মাঝে তাই ওই বাড়িতে যেতাম। দেখতাম অনিলও এসেছে—সেতার শিল্পীর ভূমিকা করতে হবে। তাই সেতারের তালিম নিচ্ছে মনোযোগ সহকারে।

রবিশংকর বলতেন—দাদা ফোর ক্যাগেলস্‌ খান—আমি খাই থ্রি ক্যাগেলস্‌।

উদয়শংকর চারমিনার খেতেন, চেন স্মোকার ছিলেন তিনি। রবিশংকর খেতেন লন্ডনের থ্রি ক্যাগল সিগ্রেট। তখন বেশ কিছুদিন ওখানেই আড্ডা জমাত।

রবিশংকর তার আগে থেকেই বিশ্ব যাযাবর। বলতেন তিনি—

—To night in Babylon.
last night in Rome
under st. Paul's dome.

কবে কখন কোথায় থাকি তার স্থিরতা নেই। ছবি করার পরিকল্পনা তাই আর কাজে পরিণত করা যায়নি। সম্ভবও ছিল না। তার নিমন্ত্রণ বিশ্বলোকে, সীমার মধ্যে বাঁধা তাকে যায় না।

সেই সময় কলকাতা ছিল সারা ভারতবর্ষের মহান শিল্পীদের তীর্থক্ষেত্র। এখানের বোদ্ধা বাঙালি শ্রোতাদের সামনে গেয়ে তারা আনন্দ পেতেন, কলকাতার স্বীকৃতিই তাকে এনে দিত সর্বভারতীয় স্বীকৃতি।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর ছিলেন সেই যুগের মহান শিল্পীদের অন্যতম। তখন সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভারতবর্ষের বহু রাজ্য যখন বরোদা, জয়পুর, গোয়ালিয়ার, মাইহার দক্ষিণ ভারতের মহীশূর ত্রিবাঙ্কুর আরও অনেক করদ রাজ্যও ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে এসে মিশেছে। সেই রাজা মহারাজাদের প্রতাপ, প্রতিষ্ঠাও বিগত প্রায়।

তখনকার ওই রাজা মহারাজরা ছিলেন ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। মাইহার রাজই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে সেখান থেকেই তালিম পেয়ে বিশ্বজয় করেছেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, পণ্ডিত রবিশংকর প্রভৃতি। এছাড়া খাঁ সাহেবের প্রচুর গুণী শিষ্য ছিলেন। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁও তাদের অন্যতম।

তেমনি বড় বড় মার্গ সঙ্গীতের শিল্পীরাও বিভিন্ন রাজা মহারাজের আশ্রয়ে থেকে শিল্পচর্চা করেছেন।

সমৃদ্ধ করেছেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে। এই ভাবে গোয়ালিয়ার ঘরওয়ানা, আগ্রা, ঘরওনা জয়পুর, ঘরানা পুনার মারাঠা সামন্ত রাজাদের দাক্ষিণ্যে বর্ধিত হয়েছে কিরানা ঘরওয়ালা, দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সেই ভাবেই সেদিকের রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধতর হয়েছিল। তখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে পশরায় পরিণত হতে হয়নি। সেই মহান শিল্পীদেরও সাধারণ আসরে কনফারেন্সে গেয়ে বাঁচার রসদ সংগ্রহ করতে হয়নি।

কিন্তু রাজ মহারাজাদের দিন শেষ হতেই বিপদে পড়লেন ওই শিল্পীরা। তবু সেদিনের বহু সংস্কৃতিমনা মানুষও এবার প্রকৃত মার্গসঙ্গীতের স্বাদ পেয়ে সেই শিল্পীদের বরণ করে নিলেন।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ছিলেন গুজরাতের মানুষ, বরোদার রাজ দরবারের শিল্পী। বাংলার বোদ্ধা রসিক দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় তাঁর ছিল না। অবশ্য কলকাতার একটি মাত্র কনফারেন্সে তিনি গাইতে আসতেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে আগলে রাখতেন। তাঁদের আসরে গাওয়ার পরই তিনি ফিরে যেতেন। তারা অবশ্য তাকে সেদিনের তুলনায় যথেষ্ট প্রণামীই দিতেন।

পণ্ডিত ওঙ্কার নাথজী ছিলেন সাধারণের নাগালের বাইরে। আসরে বাঙালি শ্রোতারা তার মত মহান শিল্পীর সঙ্গীত থেকে বঞ্চিত হতেন। তাই আমাদের চেষ্টা শুরু হলো তাঁকে পেতে হবে।

ওঙ্কারনাথজী তখন রয়েছেন বেনারসে। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তখন ডীন অব দি ফ্যাকালটি অব মিউজিক। ওঙ্কারনাথজী ভারতের বাইরেও অনেক অনুষ্ঠান করেছেন। পরে তার মুখেই শুনেছিলাম ইটালির ডিক্টেটর মুসোলিনীও ভালো বেহালা বাজাতেন। ওঙ্কারনাথজীর সঙ্গীতের তিনি ছিলেন পরম ভক্ত মুগ্ধ শ্রোতা।

তখন ওঙ্কারনাথজী কলকাতার সেই কনফারেন্সের কর্তৃপক্ষের উপর কেন জানি না খুশি নন। পরে জেনেছিলাম তাঁর কাছেই, এবার কোথাও গাইবেন না।

তখনকার দিনের প্রখ্যাত গায়িকা বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার।

ওর কাছে তালিম নিতেন, বিজনদিকে উনি নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করতেন। বিজনদির কাছে শুনলাম পণ্ডিতজী কলকাতা আসছেন আর উঠবেন সানি পার্কে কোন অবাঙালি শিল্পপতির বাড়িতে। বিজনদি বললেন—ওর শরীর ভালো নেই, উনি গাইবেন কি? দ্যাখ বলে। আমিও ওঁকে তোমাদের কথা বলবো।

কনফারেন্স করার সময় কলকাতার জ্ঞানী মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলাম, সেই শিল্পীবন্ধু দেবব্রতেরও উপর মহলে যাতায়াত আছে। তার সঙ্গে নিয়ে পরিচিত হয়েছিলাম, পরে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল বিশ্বরূপার কাছে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রজ্ঞা মহারাজের সঙ্গে। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপর ওর বেশ কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনা করেছিলেন তিনি কঠিন পরিশ্রমে।

সেই সব বই কিছু পড়েছিলাম। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে ভালোবেসেছিলাম তাই মাসাবধি কাল ধরে ওই কনফারেন্সের জন্য বেগার দিতাম, একা আমি নই। সারা কলকাতায় তখন প্রচুর মানুষ এই কাজ করতেন।

খবর পেলাম ওঙ্কারনাথজী এসেছেন। আমিও আমার এক সহকারীকে নিয়ে হাজির হলাম পণ্ডিতজীর সান্নিধ্যে দুরু দুরু বুকে। শুনেছি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

বিশাল ঘরে একটা কয়েক ইঞ্চি উঁচু বিশাল গদিতে বসে আছেন। সৌম্য শান্ত সদা হাস্যময় চেহারা, ঘাড় অবধি চুল নেমেছে। পরনে ধুতি, গেঞ্জি। গিয়ে একেবারে প্রাণপাত হয়ে প্রণাম করলাম। আমার চ্যালাকেও শেখানো ছিল। সেও দাঁড়িয়ে বডি ফিটিং সেলাই করা প্যান্ট নিয়েই আমার মতই সভক্তি প্রণাম করল।

বিজনদির চিঠিখানা হাতে দিতে পড়লেন। বলেন—

—বেটা বুড়াপা হো গিয়া মুঝে ছোড় দে।

এক কথায় চলে যেতে আসিনি। ওদিকে কনফারেন্সওয়ালাদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব আনছে যোগাযোগ থাকলেও গোপনে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকত। কে কত বড় শিল্পীকে এই নিয়ে রেষারেষিও ছিল।

ওঙ্কারনাথজীকে পাবার আশাতেই এসেছি। তবু ওসব কথায় না গিয়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়েই আলোচনা শুরু হলো। তিনি তখন কাশীতে কোন

বৈদ্যমহারাজকে দিয়ে সংকল্প করার কথা ভাবছেন, শুরু হলো সংকল্প থেকে। তারপর এলেন ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে।

পণ্ডিতজী ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সেই ইতিহাস কয়েক খণ্ডে রচনা করার কাজে হাত দিয়েছেন, আমিও নিষ্ঠাবান ছাত্রের মত তার সেই সঙ্গীতের ইতিহাস এর কথা শুনছি, মাঝে মাঝে প্রজ্ঞা মহারাজের সদ্য পড়া হিসট্রি অব ইণ্ডিয়ান মিউজিক থেকেও কিছু ধরতাই দিয়ে যাচ্ছি।

আমীর খসরু, তানসেন মান্ডুর সঙ্গীতের ইতিহাসের দু'একটা ধরতাই দিতে পণ্ডিতজীর এবার প্রাণ খুলে আলোচনা চালাচ্ছেন।

হঠাৎ এমন সময় যা ভয় করেছিলাম তাই-ই ঘটল। দেখি মধ্য কলকাতা সঙ্গীত সম্মেলনের সনাতন এসে পড়েছে ঠিক খবর পেয়ে।

সনাতনদের অর্থ সামর্থ্য আমাদের থেকে অনেক বেশি। সনাতনের বোলচালও বেশ জোরদার। টাকার জোরও আছে। কারণ ওর পৃষ্ঠাপোষক বহু ধনী অবাঙালির দল। আমরা তো নেহাৎ বঙ্গবাসী ছা-পোষা বাঙালি শ্রোতাদের কথ্য অনুষ্ঠান করি। আমাদের সাধ্য খুবই সীমিত।

সনাতন গটগট করে ঢুকে হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গি করে বলে, ওস্তাদজী আপনাকে আমাদের কনফারেন্সে গাইতে হবে। পুলিশ কমিশনার অফিসার আমাদের শঠদা আপনার গান খুবই ভালোবাসেন। একটা অনুষ্ঠান করুন, পাঁচ হাজার টাকা দেব।

আঠান্ন-উনষাট সালের কথা। তখন পাঁচ হাজার টাকার দাম অনেক। রবিশংকরজীকে দিই আমরা মাত্র দেড় হাজার। আমীর খাঁ সাহেব, ভীমসেনকে দিই হাজার টাকা। ওর পাঁচ হাজারি হাঁক শুনে ঘাবড়ে যাই।

পণ্ডিতজীকে চেয়ে দেখি সব মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। সহজ মানুষটি একেবারে গম্ভীর হয়ে গেছেন। সংযত কণ্ঠে বলেন সনাতনকে। বুড়াপা হো গিয়া— আউর ফ্যাংশন নেহি কর সকেগা।

মুঝে ছোড় দেও জী।

তারপরই দুহাত তুলে ওকেই নমস্কার জানান নমস্তে।

অর্থাৎ আর কোন কথাই শুনতে চান না। ওকে বিদায় হতেই নির্দেশ দেন ওই নমস্কারে।

সনাতনও স্তব্ধ। ওই ব্যক্তিত্বের সামনে তার আর বাক্য সরে না। মাথা নীচু করে বের হয়ে যায়, পণ্ডিতজী ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর ও চলে যেতে হো হো করে হেসে ওঠেন, যেন অন্য মানুষ।

আমি তো হতবাক। পণ্ডিতজী বলেন—হামকো রূপেয়া দেখানে আয়া!

পণ্ডিতজী তারপর বলে ওঠেন ওর আগেকার সেই টাকা ওয়ালাদের কনফারেন্সে ওর অভিজ্ঞতার কথা। বড় বড় শেঠ ধনীদের কনফারেন্সে তিনি গাইতেন। বসেন—

গানের সময় দেখি সামনের পিছেনের সিট ফাঁকা, শেঠদের দেখাই নেই। তাদের গাড়ির দুদশ জন ড্রাইভার মুনিমনীরা বসে ঢুলছেন আমি গাইছি। আর বৈজয়ন্তীমালার নাচের সময় সব শেঠ এসে ভিড় করেন। তারপর আবার ফাঁকা। কাদের শোনাবো আমার গান। শ্রোতা কোথায়।

আমি জানাই আমাদের সব বাঙালি শ্রোতা। প্যাণ্ডেলে হাজার পাঁচেক লোক ঠাসা থাকে, তারা গান শুনতেই আসেন।

কথাটা একবার ছুঁইয়েই প্রসঙ্গন্তরে চলে যাই। ওর সান্নিধ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। ওর দেহ থেকে যেন সাধনার জ্যোতি প্রকাশ আমাকে স্পর্শ করে সারা মন কি অনাবিল তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। বলি পণ্ডিতজী আমীর খানের পর—

আবার সেই ইতিহাসের আলোচনাতেই ডুবে যান। পরবর্তীকালে মীরার ভজন নিয়েই আলোচনা চলছে। একটি মনোরম সন্ধ্যায় আমি ঘন তন্ময় হয়ে কোন সাধকের প্রবচন শুনছি। ঘণ্টা দেড়েক কোনদিকে কেটে গেছে জানি না। এরপর আর অনুষ্ঠানে গাইতে বলার সাধ্যও নেই। যে ব্যক্তি পাঁচহাজার টাকার অফার এক কথাতেই ফিরিয়ে দিতে পারেন, তাকে যোগ্য সম্মান দক্ষিণা দিয়ে নিয়ে যাবার সাধ্য আমার নাই।

তার সান্নিধ্য পেয়েই আমি তৃপ্ত। তাই বলি—

আমার সৌভাগ্য আপনার পা ছুঁতে পেরেছি। এই নিয়ে তৃপ্ত।

এবার আসি তাহলে—

পণ্ডিতজীর কেন জানি না বোধহয়, আমার উপর দয়াই হয়েছে, তিনিই বলেন—তোমার কনফারেন্সের কথা বলছিলে—আমিই জানাই-আপনার যোগ্য প্রণামী দেবার সামর্থ তো আমার নাই। পত্র পুষ্পই দিতে পারি মাত্র। পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে বলেন।

ক্যা তেরা পত্র ক্যা তেরা পুষ্প সোহি তো বাতা। আমি কুণ্ঠিত চিত্তে জানাই মাত্র দেড় হাজার টাকা আমার সাধ্য! এর বেশি সামর্থ আমাদের নাই। আর আপনার যাতায়াতের প্যাসেজ।

পণ্ডিত আমাকে অবাক করে বলেন, ঠিক হ্যায়। কব তেরা কনফারেন্স? আমি তো অবাক। একটু আগে ইনিই পাঁচহাজার টাকার অফার এক কথায় নাকচ করে ওই টাকাতেই আমাদের ওখানে গাইতে সম্মত হলেন। তবে ওর সঙ্গে গায় একজন, তাকে আনতে হবে। তার জন্য কিছু দিতে হবে।

আমিও রাজি হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে অনুমতি পত্রও দিয়ে দিলেন।

তিনি এর আগে সাধারণ বাঙালি শ্রোতাদের সান্নিধ্যে আসেননি। তার গান বাঙ্গালী শ্রোতা সামনে বসে শোনেনি অনেকেই। সেই রাত্রে মনে পড়ে খড়্গপুর, এদিকে রানাঘাট নানা জায়গা থেকে শ্রোতারা এসেছিলেন, আমরা তাদের ঠাঁই দিতে পারিনি। তারা শুধু দাঁড়িয়ে থেকে ওঙ্কারনাথজীর অনুষ্ঠান শুনেই চলে যাবেন

তারজন্য পুরো টিকিটের মূল্যও দিয়েছিলেন। প্যান্ডেলের ঘেরা ত্রিপল তুলে দিতে হয়েছিল।

পণ্ডিতজীও বাঙালি যে এমনি সঙ্গীতপাগল তা জানতেন না। এখানেই দেখলেন তার প্রকৃত শ্রোতাদের। গান গাইবার আগে নিজে প্যান্ডেলে দর্শকদের মধ্যে ঘুরে এলেন, খুশিতে তিনি উচ্ছল। সেদিন গেয়েছিলেনও প্রাণমন দিয়ে। তার কণ্ঠে ছিল জাদু। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কয়েক হাজার শ্রোতাকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলেন। তার কণ্ঠস্বর, সৌম্য সাধকোচিত তনু-মানুষকে আড়াই ঘণ্টা কোন স্বপ্ন রাজ্যে নিয়ে যেত। মীরার ভজন গাইতেন-যোগী মৎ যা।

সারা আসর কি আর্তিতে আপ্লুত হয়ে যেত।

প্রথম রাত্রে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে গান গেয়ে গেলেন, আবার ভোর রাত্রে এসে বন্দেমাতরম গেয়েছিলেন।

তারপর তিনি যতদিন সুস্থ ছিলেন আমাদের অনুষ্ঠানে আসতেন। অন্য কোথাও গাইতেন না।

সেই একটা যুগকে দেখেছিলাম। আজ কলকাতার বুক থেকে সেই অনুষ্ঠানের খোয়াব মুছে গেছে। উঠে গেছে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স, সদারং সঙ্গীত সম্মেলন আরও বহু অনুষ্ঠান। একমাত্র ডোভার মিউজিক কনফারেন্স এখনও টিকে আছে কোন মতে। সেই সব মহান শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের গৌরবময় যুগও শেষ হয়ে গেছে।

এখন নেতাজী ইনডোরে কখনও সল্টলেক স্টেডিয়ামে নৃত্যগীত হয়, কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের কোন অনুষ্ঠান আর হয় না। একটা বিশাল জাতীয় সংস্কৃতিকে আমরা একালের প্রজন্ম ধুয়ে মুছে ফেলছি।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এমনি মড়ক দেখা দিতে শুরু করল। তখন বাংলার ঐতিহ্যময় মাসিক সাহিত্যপত্র বের হত বেশ কয়েকটিই। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, গল্প ভারতী প্রভৃতি একে একে তারাও সব বন্ধ হয়ে গেল। বসুমতী সরকারি পরিচালনায় কিছু দিন টিকে ছিল। তারপর সেও অবলুপ্ত হয়ে গেল।

উল্টোরথের সেই গরিমা আর নাই। তার প্রাণপুরুষ প্রসাদ চলে যাবার পর ক্রমশ সেখানেও নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, গিরীন সিংহ ছিলেন প্রসাদের বন্ধু।

সেই গিরীনবাবুও চলে গিয়ে অন্যত্র প্রসাদ নামেই পত্রিকা বের করতে শুরু করলেন। সেখানেও লিখি। গিরীনও ছিল আমাদের বন্ধুই।

এই সময়ের কিছু আগে একদিন বেলেঘাটার বাড়িতে এলেন দেবসাহিত্য কুটির থেকে মধুসূদন মজুমদার। বিনয়ী বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তিনি বললেন—

—আমরা একটা মাসিক সাহিত্যপত্র বের করছি, আপনাকেও লিখতে হবে।

মধুসূদনবাবু ছেলেবেলাতেই দৃষ্টি শক্তি হারান, কিন্তু দৃষ্টিহীনতা যে মানুষের বড় হবার পথে কোন বাধা নয়—সেটা তাকে দেখেই মনে হয়েছিল।

দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রি নিয়েছিলেন। এর সহপাঠীই ছিল বোধ হয় আর এক খ্যাতিমান দৃষ্টিহীন ব্যক্তি ব্যারিস্টার সাধন গুপ্ত মশায়।

প্রথম দিনেই মধুবাবুকে ভাল লেগে গেল। ক্রমশ ওই মানুষটিকে পেলাম অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবেই। প্রসাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছিলেন মধুবাবুই।

সদালাপী বন্ধুবৎসল মানুষ, মানুষকে তার ব্যবহার যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতো। এদের পত্রিকার নামকরণ করা হল নবকল্লোল।

মধুবাবুর সম্পর্কে ভাইপো ছিলেন ওই পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার সুবোধবাবু। দুজনেই প্রায় সমবয়স্ক, তাই কাকা ভাইপো নয়, ওদের মধ্যে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সুবোধবাবু ছিলেন অ্যার্থনি কিন্তু ছিল অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রীতি—যা ছিল ওই পরিবারের ঐতিহ্য।

দেবসাহিত্য কুটিরের সাহিত্যের ব্যাপার ছিল বংশানুক্রমিক। তাই ওদের রক্তে ছিল সাহিত্যপ্রীতি। সেই ধারা আজও তাদের উত্তর পুরুষদের মাঝে প্রবহমান। অফিসের পর ফাঁক পেলেই সন্ধ্যার মুখে মধুবাবুর আড্ডায় হাজিরা দিতাম। মধুবাবু এক একজনের পায়ের শব্দেই চিনতেন। কিছু বলবে আগেই মধুবাবুই বলাতেন।

—এত দেরি কেন?

এই পত্রিকাতে লিখতেন নিয়মিত তারাশংকরবাবু, অন্যসব সাহিত্যিকরাও ক্রমশ। নবকল্লোল বাংলা সাহিত্য জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিল।

মধুবাবুর মতো মানুষ আমি কমই দেখেছি। খুব বড় মনের বড় মনের মানুষ ছিলেন তিনি। তার গোপন দান কত ছিল তা জানি না। তবে দেখতাম আড্ডায় বসেছেন। তার খাস বেয়ারা এসে কানে কানে কি বলল।

মধুবাবু পাশের ঘরে উঠে গেলেন। ফতুয়ার পকেট থেকে কী বের বৃদ্ধ করলেন। কোন অন্ধমহিলা, কোন বিগত দিনের নট তাদের কী দিয়ে আবার ফিরে এলেন। এইরকম বহু অভাবী মানুষকে গোপনে নিয়মিত অর্থ দিতেন। আর সে কথা কোনদিন প্রকাশও করতেন না।

মধুবাবু ছিলেন নাটকের প্রতি খুব অনুরক্ত। সব নাটকই দেখতে যেতেন। আর উনি অভিনেতার কণ্ঠস্বরেই যেন তার অভিব্যক্তির তারতম্য বুঝেছিলেন। কোন শিল্পী সেদিন মঞ্চে ঠিক মতো অভিনয় করেছেন, কে সেদিন ঠিক অভিনয় করতে পারেননি, কোথায় তার ভুলচুক হয়েছে সঠিক ভাবে বলতে পারতেন।

নিজেও ছিলেন সুলেখক। ছেলেদের জন্য বেশি লিখেছেন। তিনি ছিলেন ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাসের বহু কাহিনী ছেলেদের জন্য লিখেছেন। নিজে বলে

যেতেন আর তার সহকারী লিখে যেতো। পড়াশোনা করতেন প্রচুর। তার পছন্দমতো বই তার সহকারী কেউ পড়ে যেতো উনি শুনতেন। আর স্মৃতি শক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। সেই পড়ার পর তিনি সারমর্ম ঠিক মতো বলে যেতেন।

এক শিক্ষককে দেখতাম রিটয়ার করার পর অসুবিধায় পড়েছেন। তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান বোধ তার। সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত। মধুবাবু তার কাছে সংস্কৃতের পাঠ নিতে শুরু করলেন। তিনি ভট্টি, কাদম্বরী, বাণভট্ট এসব পড়ান, মধুবাবুও পাঠ নেন। বিনিময়ে গুরুদক্ষিণা দেন তিনি।

একটি মানুষ দৃষ্টিহীন হয়েও কত যে দূরদৃষ্টি ছিল তার তা বুঝেছিলাম। তাই মানুষটিকে ভালোবেসেছিলাম— তার আড্ডার নিয়মিত সভ্যই হয়ে গিয়েছিলাম— আড্ডার অনুপানও ছিল সুন্দর।

ঝামাপুকুর কলকাতার বনেদি পুরাতন অঞ্চল। ওখানেই প্রথম এসে থাকতেন দাদার টোলে রামকৃষ্ণদেব। ওই অঞ্চল তার পদধূলি ধন্য।

ওই দিকে কোথায় একটা বনেদি কচুরির দোকান ছিল, সেইখানের উৎকৃষ্ট গরম কচুরি আলুর তরকারি আর সন্দেশ তৎসহ চা ছিল আড্ডার অনুষ্ঠান। সবমিলিয়ে সে সব মধুর স্মৃতিই হয়ে আছে।

স্মৃতি বলছি কারণ মধুবাবু হঠাৎ চলে গেলেন। এক বারে স্ট্রোক হয়েই মারা গেলেন। একজন প্রকৃত বন্ধুকে পেয়েছিলাম আবার হারালাম।

এর কিছুদিন পর চলে গেলেন সুবোধবাবু। আর ওদের বংশধররা আজও নবকল্লোল, শুকতারাকে সগৌরবে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মজুমদার বংশের অকৃত্রিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রীতি আজও অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে।

প্রবীর বাবু, অরুণবাবুরা এখন হাল ধরেছেন পত্রিকাগুলোর। ওরাই এখন বাংলা সাহিত্য জগতে পত্রিকাকে সগৌরবে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিষ্ঠার জন্যই।

ঋত্বিকের 'সুবর্ণ রেখা' মুক্তি পেল। অসাধারণ ছবি। কিন্তু ঋত্বিক ছিলেন বর্তমানকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যৎ-এর রূপকার। তাই বর্তমান কাল সেদিন ঋত্বিককে চিনতে পারেনি। পত্রপত্রিকার তথাকথিত সাংবাদিকরাও তাকে সঠিক মূল্যায়ন করে সেই কালজয়ী রূপকারের কোন স্বীকৃতিই দেয় নি। বরং তাকে নানাভাবেই অন্যেকে আক্রমণাত্মক সমালোচনাই করেছিল। ক্রুদ্ধ হতাশ ঋত্বিকবাবুর অন্তরে সেই আঘাত খুবই বেদনা দিয়েছিল। তাই যেন তিনি আত্মনির্যাতনই শুরু করেছিলেন ভেঙে পড়েছিলেন। তার স্পষ্টবাদিতার জন্য বহুভাবে অপমানিতও হয়েছিলেন। সে এক দুঃখজনক পরিস্থিতি। দেখেছিলাম তিলে তিলে একটি দৃপ্ত প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটানো হলো। যে সম্মান পাবার হক তার ছিল তা সেকাল তাঁকে দেয়নি।

এর মধ্যে আবার বোম্বাই পাড়ি দিতে হয়েছে। তখন বাংলা চিত্রনাট্যটা নিয়ে

আবার বসতে হলো। সেদিন সেই চিত্রনাট্য আগে যা ভালো লেগেছিল সেটা আমার কাছেই কিছু দুর্বল বলে মনে হলো।

শক্তিবাবু বলেন চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে তাই সময়ের দরকার। আবার নতুন করে কাটা ছেঁড়া করে এবার মনোমত হলো। স্টুডিওতে যাই আর সেই পুরোনো হোটেলেই উঠেছি খার অঞ্চলে। নিউ থিয়েটার্স তখন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে সেই স্টুডিওতে অন্যসব নায়করা ভাড়া নিয়ে কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠান আছে—প্রাণপুরুষ কর্মী, পরিচালকরাও সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছেন। ওদের মধ্যে চিত্রনাট্যকার বিনয় চাটুজ্যে রয়েছেন বান্দ্রায়, বোম্বাই-এ কিছু কাজ করছেন। শক্তিবাবুর 'অনুরাগ' তারই কাহিনী, চিত্রনাট্যে গড়ে উঠেছিল।

আমার হোটেলের কাছেই রয়েছেন নিউথিয়েটার্স এর আর্ট ডাইরেক্টর সৌরেন সেন। বিনয়দার পূর্ব পরিচিত ফণী মজুমদারও রয়েছেন। ওদের সঙ্গেও দেখা হয়।

বিনয়দা বিয়ে থা করেননি। বান্দ্রার সমুদ্রতীরে ব্যান্ডস্ট্যান্ডের কাছে একটা বাড়ির সাততলার ফ্ল্যাটে থাকেন। একা মানুষ কিন্তু তার আশ্রিত সেখানের অনেক। বোম্বাই শহরে কাজ মেলে তবু থাকার জায়গা মেলে না। তাই বেশ কিছু ছেলেকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। এদেরই একজন ছিল জ্যোতি রায়।

নদীয়ার ছেলে, বোম্বে ফিল্ম ইনডাস্ট্রিতে নদীয়ার বিশেষ করে কৃষ্ণনগরের বেশ কিছু তরুণ আর্ট ডিরেক্টর, সহকারী আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে। কৃষ্ণনগরের সঙ্গে শিল্পের একটা নিবিড় যোগ আছে, তাই ঠিক ভিন প্রদেশেও এরা নাম করেছে।

ওই জ্যোতি তখন কলকাতায় নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। পরে বোম্বাই-এ গিয়ে হাজির হয়। লেখেও। কবিতা ভালো লেখে। সাহিত্যবোধ আছে। বিনয়দাই জ্যোতিকে শক্তি ফিল্মস্-এ সহকারী পরিচালনার কাজে ঢুকিয়ে দেন। বিনয়ী তরুণটিও মনের মতো কাজ পেয়ে এবার বদলে যায়।

বোম্বাই শহরে সকলেই কাজ করে, আর নিষ্ঠার সঙ্গেই করে থাকে। কাজ বন্ধ করে দাবির সোচ্চার হুঙ্কার সেখানে কেউ তোলে না। নেতারাও তুই কিছু পা আর আমাদের কিছু দিয়ে আমাদের জয়ধ্বনি কর, কাজে ছেড়ে মিছিলে যা, এসব শিক্ষা দেয় না। ওদের নীতি কাম করো, মাল কামাও। তাই ওয়ার্ক কালচার রয়েছে। স্টুডিওতে দেখেছি কর্মব্যস্ততা। যে যার কাজে বেশি নৈপুণ্য দেখিয়ে নিজের কেরিয়ার গড়তে চায়। তাই কাজ সকলকেই করতে হয়।

স্টুডিওতেই দেখেছিলাম অশোককুমারকে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে তিনি বোধহয় সর্বজনপ্রিয়, দাদামণি বলে তাকে ডাকে। তাবড় প্রডিউসার, পরিচালক, শিল্পী থেকে সাধারণ কর্মীও। সহজ মানুষ, আনন্দময় পুরুষ।

শক্তিবাবু এই দাদামণিকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। তিনিই শক্তিবাবুকে এই জগতে এনেছেন এ কথা শক্তিবাবুকেও বারবার বলতে শুনেছি। আর দেখেছি শক্তিবাবু ফণী মজুমদারকেও খুবই শ্রদ্ধা করেন। ওর প্রথম কাজের হাতে খড়ি ওর কাছেই।

শক্তিবাবুর চেম্বারে দাদামণি এসে বসেন। ওর বহু ছবিতেই অশোককুমার অভিনয় করেছেন। নটরাজ স্টুডিওর কর্মকর্তাদের মধ্যে শক্তিবাবু অন্যতম। তাই নিজেই স্টুডিওতে অশোককুমারের বিশ্রাম নেবার জন্য সুন্দর এয়ারকুলার বসানো ঘরও রেখেছেন। তার বাথরুমটাও সুন্দর করে সাজানো। দাদামণি বাথরুমে বসেও পড়াশোনা করতেন অনেক সময়।

উনি না এলে আমরা মাঝে মাঝে ওর ঘরে বসে কাজ করতাম। বাংলা চিত্রনাট্য শক্তিবাবুর পছন্দ হলো। এবার হিন্দিতে ভাষান্তর করতে হবে ওই চিত্রনাট্যকে। হিন্দি বাংলা দুটো ভাষায় হবে।

আমি বোম্বাই-এ থাকাকালীন হোটেলেই লেখালেখি করতাম। চিত্রনাট্য লেখা শেষ হতে এবার শক্তিবাবু তার সহকারী প্রভাত রায়কেই আমার সঙ্গে হোটেলে বসিয়ে দিতেন। প্রভাতের হাতের লেখা সুন্দর। জ্যোতি রায়ের লেখাও। ওদের কেউ বসতো চিত্রনাট্যের কপি করতে।

এদিকে হিন্দি চিত্রনাট্যকারও বসছেন। ভদ্রলোকের নাম ব্রজেন্দ্র গেড়ি। হিন্দি চিত্রনাট্যকার, পরিচালকও ছিলেন তিনি। তার ছবি জাগ উঠে ইনসান-আর কি সব। বাংলা কিছু কিছু বোঝেন।

তাকে বাংলায় সিনগুলো পড়ে বুঝিয়ে দিই, উনি হিন্দিতে সিন, সংলাপগুলো লিখে নিন, পরে হিন্দির মতো করে সেগুলো লিখতে হবে। তবে দৃশ্যের পরম্পরা ঠিকই থাকবে। বাংলা চিত্রনাট্যের ধারাতেই হিন্দি চিত্রনাট্য গড়ে উঠবে।

কয়েকদিন কাজ করার পর দেখা গেল ব্রজেন্দ্রবাবুর কাজ শক্তিবাবুর মতঃপুত হচ্ছে না। সেই রং—মেজাজ যেন আসছে না ওই চিত্রনাট্যে। তবু শক্তিবাবু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু ঠিক মনোমত হচ্ছে না। ওদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে। কাজও এগোচ্ছে না। শেষে শক্তিবাবু আনলেন হিন্দি সাহিত্যিক, তখন টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার হিন্দি সাহিত্যপত্র সারিকার সম্পাদক কমলেশ্বরকে কমলেশ্বর নিজে ছোটগল্পকার, বেশ কিছু উপন্যাসও লিখেছেন তিনি হিন্দিতে ইউপির সৈন্যবাদের মানুষ। শিক্ষা দীক্ষা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। টাইমস্ অব ইন্ডিয়াতে তখন অনেক বঙ্গ সন্তান কাজ করে। এলাহাবাদের কমলেশ্বরের কিছু বাঙ্গালী বন্ধু ছিল তাই বাংলাটা লিখতে না পারলেও ভালোই বোঝেন।

লেখার হাতও ভালো। তাই আমাদের দুজনের মানসিকতার মেলবন্ধন হতে দেরি হয় না। খুব তাড়াতাড়িই লেখেন কমলেশ্বর। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা হিন্দি ছবির চিত্রনাট্যও লিখেছেন। 'আঁধি' সুচিত্রা সেনের ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার তিনিই। 'গরম হাওয়া' আর কিছু ছবিতে কাজ করেছেন। 'লিখছেন পতী পত্নী আউর উ, বার্নিং ট্রেন ইত্যাদি।

নয়াবসত-এর নতুন নামকরণ করা হলো 'অমানুষ'। কমলেশ্বর গল্পের মেজাজ,

মধুর চরিত্রটাকে ঠিক বুঝে নিয়ে চিত্রনাট্যের ভাষান্তর করলেন। তবে শেষটার তখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিছু হয়নি। মধু বসতে থাকবে না হারিয়ে যাবে সেটার ফয়সালা পরে করা যাবে।

শক্তিবাবুর ইচ্ছা ছিল কলকাতাতেও তিনি একটা নিজস্ব ইউনিট রাখবেন। বছরে হিন্দি ছাড়াও এখান থেকে একটা করে বাংলা ছবি করবেন। বাংলার প্রতি তার কৃত্য কিছু আছে এটা মনে করতেন। বাংলা ছবির টাকা। এখানেই পরের ছবিতে লাগাবেন।

শক্তি ফিল্মসের নিজেরই চারটে ক্যামেরা চার পাঁচটা রেকর্ডিং মেসিন। আলোও নিজস্ব। নিজের কাজ ছাড়াও ওসব যন্ত্রপাতি অন্য প্রযোজকদের ভাড়া দেওয়া হয়। তার থেকে একটা ইউনিটের যন্ত্রপাতি এখানে পাঠাবেন।

অফিস কাম কর্মীদের কলকাতায় যাবার জন্য কারনানী ম্যানসনে বিশাল একটা ফ্ল্যাটও কেনা হলো। এবার শক্তিবাবু নিজে কলকাতায় এলেন শিল্পী নির্বাচন চূড়ান্ত করতে। লোকেশন দেখার জন্যও।

তখন পিয়ারলেস ইন হয়নি—ওখানে ছিল 'হোটেল রিজ'। ওরই সাততলার একটা স্যুটে শক্তিবাবু উঠেছেন। উত্তমবাবুকে চিত্রনাট্য শোনাতে হবে।

ময়দানের দিকে একটা জানলার সামনে বসে শক্তিবাবু, একদিকে আমি, সামনের সোফায় উত্তমবাবু আর দেবেশ ঘোষ। চিত্রনাট্য পড়ছি আমি, উত্তমবাবু এর আগে মূল উপন্যাসটি পড়েছেন, তাই কাহিনীটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মধুসূদনের চরিত্রটাই করবেন তিনি। চিত্রনাট্য পড়া শেষ হতে শক্তিবাবু ওঠেন।

—উত্তমবাবু, কেমন লাগলো আপনার?

বিশেষ কোন আপত্তি উত্তমবাবুর দিক থেকে এলো না। তিনি দু'একটা পয়েন্টের বিষয়ে কিছু বলতে আমি তার জবাব দেবার আগেই শক্তিবাবু বলেন আত্মবিশ্বাসের স্বরে— উত্তমবাবু, দ্যাটস্ এ কোশ্চেন অব ন্যারেশন অ্যান্ড এগ্‌জিকিউশন' লিভ ইট টু মি।

আমিও শক্তিবাবুকেই ওই কথা বলতে দেখে থেমে গেলাম, উত্তমবাবুও আর কোনো প্রশ্ন তোলেন না। তিনি চিত্রনাট্য ও.-কে করে দিলেন। এবার অন্য শিল্পী নির্বাচনের পালা।

শক্তিবাবু চেয়েছিলেন বাংলার শিল্পীদেরই বেশির ভাগ নিয়ে হিন্দিবাংলা ছবি করবেন। যাতে বাংলার প্রতিভাবান শিল্পীরাও হিন্দির বাজারে আসতে পারে। নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি ছবিতে পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, কাননদেবী, অমর মল্লিক যেমন এসেছিলেন।

হোটেলেই এলেন উত্তমবাবু, অনিল চাটুজ্যে, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ প্রভৃতি। তাদের চিত্রনাট্য শোনানো হলো। অনিল আমার কাছে ছিল লাকি আর্টিস্ট। ও আমার যে কটা ছবিতে অভিনয় করেছে সব কটাই হিট করেছিল, তাই অনিলকে আমিই চেয়েছিলাম, শক্তিবাবুও নিয়েছিলেন অনিলকে।

রবি ঘোষ আর একজন কৌতুক অভিনেতাকেই ভাবা হলো পদা আর তার সঙ্গীর চরিত্রে। মিঠু মুখার্জিকে নির্বাচিত করা হলো প্রেমানারায়ণ যে চরিত্র করেছিল সেটার জন্য।

এবার শুরু হলো লোকেশন দেখা।

আমি সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলে মোহনদার ভাঙা তুষখালির ক্যাম্পে যেতাম। সেটা তখন ছিল দূর দুর্গম। তখন কোন রাস্তাও ছিল না। যাবার পথ ছিল এখান থেকে ইটিন্ডা ঘাট থেকে লঞ্চে। নিদেন সাত আট ঘণ্টার পথ।

সেখানে বসার জায়গা বলতে মোহনদার লগ কেবিন আর কাঠুরিয়া, বাউলিয়াদের জন্য খড়ের চালা। সেখানে যাওয়াই কঠিন। তাই গাড়ির অ্যাপ্রোচ রোদের কাছে বাদাবনের যেসব ঠাঁই আছে সেগুলোর দিকেই নিয়ে যেতে শুরু করলাম।

রায়দিঘী, ওদিকে কাকদ্বীপ, নামখানার নদীর ধারে বসতে নিয়ে যাই, কোনদিন যাই হারউড পয়েন্টে। শক্তিবাবু দেখেন সবই ঘুরে ঘুরে কিন্তু মনঃপুত হয় না।

খুত খুত করেই চলেন—নাঃ ঠিক চোখে ধরছে না। যা রয়েছে চিত্রনাট্যে তা সব মিলছে না।

শেষে বলেন, আপনি তো সুন্দরবনের আবাদে যান, সেটা কোথায়? জানাই পথের দুর্গমতার কথা। গাড়ি, লঞ্চ সব বাহনেরই দরকার। দুর্গম স্থান। শক্তিবাবু বলেন— হোক দুর্গম, সেখানেই চলুন। গাড়ি, লঞ্চ এসবের খরচা জন্য ভাববেন না।

তখন মোহনদা নিজেই কাঠের ব্যবসার জন্য লঞ্চ কিনেছেন। মোহনদা এর আগেও আমার 'কুমারী মন' এর শুটিং-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। মোহনদা কলকাতার মানুষ হলেও সুন্দরবনের গহনেই, আবাদ অঞ্চলেই বেশির ভাগ সময় থাকতেন। ভালোবাসতেন সুন্দরবন, আবাদের মানুষদের। ওর সঙ্গে সুন্দরবনের গভীরে, বাদা অঞ্চলে ঘুরেছি। 'নয়াবসত' সেই অভিজ্ঞতারই ফসল।

বাদাবনের জীবনকাহিনী, তাই তিনিইও সানন্দে সব সহযোগিতা করতে রাজি হলেন।

তখন আগস্টের প্রথম দিক। বর্ষাকাল। আমি শক্তিবাবু, ওর এক বন্ধু রাম ঝারি, দেবেশবাবু বের হলাম লোকেশন, সুন্দরবন সবই দেখতে হবে। তাই একটা ক্যামেরাও নিলেন সঙ্গে একরোল কালার ফিল্মও।

কিছুদিন আগে হিন্দি ছবি সব কালারে হচ্ছে। বাংলায় তখনও সাদাকালো ছবি করছেন অনেকে, সব ছবি রঙ্গিন হয় না, এই নিয়ে কলাকুশলী ইউনিয়নও এবার দাবির লড়াই শুরু করেছে, তারা চায় সাদাকালো ছবির কাজের এক রেট হবে আর রঙিন ছবি হলে তাদের রেট বাড়াতে হবে। অথচ কাজ একই। প্রোডাকশন বয় যে সাদাকালো ছবিতে শিল্পী কলাকুশলীদের চা-জল দেয়, সেও আবদার ধরল রঙিন ছবিতে চা-জল দিতে তাকেও বেশি রেট দিতে হবে।

অর্থাৎ ফিল্ম ইনডাস্ট্রিতেও তখন 'দিতে হবে' শ্লোগান তুলে দিয়েছেন নেতারা জনপ্রিয়তা লাভ করার জন্যই, শিল্পের ভালো মন্দের কথা, শিল্প রইল না গেল ওসব ভাবার কথা তাদের নয়। তাদের দাবি মানতে হবে।

বাংলা ফিল্ম শিল্পের কণ্ঠনালী টিপে ধরার পর্ব তখন শুরু হয়ে গেছে। বোম্বাই-এ এ ধরনের আন্দোলনের কথা ওঠেনি। কেউ করেওনি। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে শিল্পে নতুন রীতিকে তারা সহজেই মেনে নিয়েছিল।

মাদ্রাজেও এসব কিছু হয়নি। বাংলায় ঘড়ি ধরে আট ঘণ্টার শিফট, মাদ্রাজে এখনও সেটা প্রচলিত নয়। তাদের কাজও প্রচুর।

"দুটো গাড়িতে রওনা হলাম বসিরহাট থেকে। আরও নদীর ভাটিতে আমরা ন্যাজাট অবধি গেলাম। ওখানে মোহনদার লঞ্চ এসেছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। ন্যাজাটের ধানকল মালিককে বলে কয়ে গাড়ি দুটো দুদিনের জন্য ওখানে রাখার ব্যবস্থা করে এবার লঞ্চে উঠব।

নদীর বুকে বর্ষার উদ্যমতা। নদীর ধারে আমি আর শক্তিবাবু দাঁড়িয়ে ওপারে কালীনগরের হাটতলার দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ একটা রাখালছেলের চিৎকারে চাইলাম। ছেলেটা ব্যাকুল ভাবে সাবধান করছে।

—সরে আসেন, সরে আসেন নদীর ধার থেকে। ওর হাঁকগুনে একটু সরে এলাম নদীর ধার থেকে। শুধোই কেন রে? ছেলেটা বলে চানে গরমের সময় ওখানে একটা গরু চরছিল, একখান ইয়া কুমীর ল্যাজের ঝাঁপটা মেরে সেটাকে গাং-এ ফেলে কল্লা টিপে ধইরা ডুইবা গেল। দফা শ্যাষ।

—বলিস কি! গরুটাকে নিয়ে গেল?

—ইঃস! ইয়া দুধেল গাই, ওই লস্করবাবুদের।

শক্তিবাবু বলেন, কোথায় আনলেন?

—আপনিই আসতে চাইলেন। সুন্দরবনের জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ। চলুন দেখবেন।

লঞ্চ ছাড়ল ভাটিতে যত যাই নদীর বিস্তার তত বাড়ে, রূপ তত ভয়ানক হয়ে ওঠে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এসে হাজির হলাম তুষখালিতে মোহনদার আস্তানায়। কয়েকটা লগ কেবিন, কাঠের মাচার ওপর ঘর, ওদিকে ছোট বড় নৌকার সমাবেশ, বাওয়ালিদের ঘর। তারপরই ভেড়ি, বাঁধের ওদিকে ধানজমি আর গ্রামবসত। ভেড়ি থেকে বসত, ওদিকে ফরেস্ট অফিস, কাঠের বাংলো-ছোট পুকুর, সব দেখি। শক্তিবাবু বলেন।

এইতো চাইছিল। সব ঠিক মিশছে। এখানে না এনে এতদিন কেন যে ঘোরালেন।

—বলি জায়গা তো মিললো! কিন্তু থাকবেন কোথায়?

মোহনদাও বলেন—সেইটাই প্রবলেম। এত লোকজন, এতবড় শিল্পীরা সব কোথায় থাকবেন।

শক্তিবাবু বলেন, ভেবে দেখি। আগে আশপাশের গ্রাম, হাটতলা মন্দির এসব দেখি।

বিকালেই বের হলাম নদীর আড়পারে সন্দেশখালির হাটতলা, বসতির দিকে। বর্ষাকাল, ওখানের মাটিতে পা রাখা যায় না। আমার হাতে একটা গরান কাঠের লাঠি। দেবেশ, শক্তিবাবু হাসেন।

সন্দেশখালির হাটতলার পাশেই থানা, একটা সেচ বিভাগের দু'কামরা কাঠের বাংলোও আছে। হাটতলা নির্জন। হঠাৎ পা পিছলে শক্তিবাবু পড়লেন, দেবেশ হাসতে হাসতে বলে ক্যাপটেন, তুম্ খুদই গির গিয়া—কথাটা শেষ হলো না, দেখা যায় দেবেশবাবুই কুমড়ো গড়ান দিয়ে গিয়ে জমা হয়েছে ভূতলে শক্তিবাবুর কাছেই। গতিক দেখে রাম ঝারি আমার হাতটাই ধরেছে। আমি তখন কাদামাটিতে সেই গরান দণ্ড পুতে বেশ জাম্পশ করে ধরে আছি।

জায়গা দেখে শক্তিবাবুর পছন্দ হয়ে গেল। মোহনদার ক্যাম্পেই একটা গাছের নীচে বাওয়ালিদের তৈরি করা একটি বনবিধির মন্দির রয়েছে। সুন্দর মাতৃমূর্তি-পাশে দক্ষিণরায়। বাওয়ালিরাই পুজো করে।

এবার সুন্দরবনেও একটু যেতে হবে। আমরা রাতে খাওয়ার পর বের হব। বোম্বাই-এ শক্তিবাবুরা কিভাবে থাকেন দেখেছি। বাড়ি এয়ার কনডিশনড-গাড়িও-অফিসও। আর ঝকঝকে তকতকে পরিবেশ। ডাইনিংরুমের টেবিল, বাসনপত্র ও মূল্যবান।

সেই বিশাল ব্যসনের মধ্যে থাকা মানুষটিকে লঞ্চে এইভাবে থাকতে দেখে অবাক হই। খাবার দাবারের আয়োজন বর্ষার ওই বাদায় কিছুই করা সম্ভব নয়। ডাল-ভাত আর কিছু মাছের তরকারি, কলাই করা থালাতেই সকলের সঙ্গে ভোজনপর্ব সারলেন শক্তিবাবু তৃপ্তির সঙ্গে।

তারপর লঞ্চের কাঠের বেঞ্চেতেই একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন, বালিশ টালিশ আর কোথায়। রাতেই লঞ্চ ছাড়ল বাঘনা চেকপোস্টের দিকে, ওখান থেকেই সুন্দরবনের আদিম অরণ্যের শুরু।

ভোরের আগেই লঞ্চ এসে পৌঁছাল বনের ধারে। বাঘনা খালে লঞ্চ রাখা হয়েছে। ওদিকেই সুন্দরবন এর সীমা। ঘন গাছগুলো অন্ধকারে জমাট দেওয়ালের মত লাগছে। একটা চাপা গর্জন শোনা যায়। আমার ঘুম ভেঙে গেছে। দেখি শক্তিবাবু নাই। ওর জায়গাটা খালি। চাপা গর্জনটা ভেসে আসছে। লঞ্চের সবাই ঘুমোচ্ছে, শক্তিবাবুই নাই। উঠে এদিক ওদিক দেখেও পাই না। লঞ্চের ছাদে এসে দেখি একরাশ দড়িদড়ার ওপর আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে আরামসে ঘুমোচ্ছেন শক্তিবাবু।

তখন অরণ্যসীমার ঊর্ধ্বাকাশ ঝিনুকের মত নীলাভ হয়ে উঠছে। বিস্তীর্ণ নদীর বুকে সেই আলোর বিচ্ছুরণ। বনের পাখীদের কলরব শুরু হয়েছে। পূর্ব আকাশের রং নীলাভ ঝিনুক থেকে প্রবালের রূপ নিচ্ছে।

শক্তিবাবু ধড়মড় করে উঠে ক্যামেরার সহকারীকে ডেকে ছাদেই ওই আলোর মধ্যেই ক্যামেরা নিয়ে বসলেন। আকাশ নীলাভ থেকে ধীরে ধীরে আবীরের রং ধরছে, সারা নবভূমি নদীর বুকে চলেছে রং এর খেলা, সেই আকাশ বন-গাং-এর ছবি নিয়ে চলেছেন শক্তিবাবু। সূর্য উঠল সারা বনভূমি যেন জেগে ওঠে নতুন সাজে।

এই ভোরের শটগুলোকেও তিনি পরে 'অমানুষ' এর টাইটেলে লাগিয়েছিলেন যেগুলো ওই ছবির পটভূমিকা চিত্রায়ণে এক নতুন মাত্রা এনেছিল।

সকালের প্রাতঃরাশ রাম ঝারি বুদ্ধি করে নিয়ে গেছিল এক টিফিন কেরিয়ার ভর্তি করে। খাঁটি ঘিয়ের তৈরি আঁলু পরোটা আর আলুর চচ্চড়ি সঙ্গে বেশ কিছু সন্দেশ। আর পরোটাও ছিল প্রচুর।

বনের মধ্যেও লঞ্চ নিয়ে ঢোকা হল। বনভূমির নাম আড়বাঁশির ব্লক। হেতাল বনের আশপাশেও লঞ্চ ঘুরলো তবে লঞ্চের শব্দ ওখানে বেশ জোরেই হয়। তাই বন্য প্রাণীরাও সাবধান হয়ে যায়। হরিণের দল অবধি। তাই তাদের দর্শন পাওয়া গেল না। তবে বাঁদরের দাত খিচুনি কিছু দেখা গেল।

লোকেশন পছন্দ হয়েছে। সমস্যা থাকার জায়গার। শক্তিবাবুই বলেন ওপাশে বটতলার ধারে ফাঁকা বেশ খানিকটা জায়গা দেখিয়ে-ওখানেই বড় করে কাঠের অস্থায়ী বাংলো বানাতে হবে। ষোলখানা ঘর চাই টু-বেডের। আর একটা বড় ডর্মেটারি। জন তিরিশ চল্লিশ লোক থাকার মত আর একটা ক্যানটিন—খাবার জায়গা। সঙ্গে থাকবে এটা বড় বাথ, আর জলের জন্য দরকার হলে টিউবওয়েল বসাতে হবে। ইলেকট্রিক লাইনও করতে হবে। কয়েকটা জেনারেটার চলবে।

এলাহি ব্যাপার। মোহনদার ক্লান্তি নাই। বলেন—

—হয়ে যাবে।

—কত পড়বে আন্দাজ?

মোহনদা বলেন, বাংলোর প্ল্যান এসব মাপজোক করে কলকাতায় ফিরে আপনাকে জানাবো।

শক্তিবাবু বলেন, যাই লাগুক তার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এখানে তো একটা পেরেক অবধি মেলে না। এসব আপনাকেই করে দিতে হবে। আমার লোকজন এখানে এসে গাং এ তলিয়ে যাবে। কোন কাজই হবে না। আপনার সব ভার নিতে হবে। মোহনদা বলেন— ঠিক আছে।

শক্তিবাবু ফিরে এলেন সুন্দরবনের লোকেশন দেখা শেষ করে। মোহনদাও সব প্ল্যান হিসাবপত্র দিয়েছেন। কয়েক লাখ টাকার ব্যাপার। সেই টাকাতে তখন চেষ্টা

চরিত্র করলে একটা বাংলা সাদাকালো ছবিই করা যায়। শক্তিবাবু হিসাব দেখে বলেন ঠিক আছে, আমি পুজোর আগেই আসছি। তখন সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ডিসেম্বর থেকে শুটিং করব ওখানে, তার মধ্যে বাংলো বানাতে হবে।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে বোম্বাই-এর প্রখ্যাত প্রযোজক পরিচালক শক্তি সামন্ত এখানে এসে ছবি করবেন, একটা বাংলা ইউনিট গড়বেন এখানে এ খবরটা চাউর হতে বেশ সাড়া পড়ে গেল। শিল্পীদের সঙ্গে চুক্তিপত্র হয়ে গেছে, অফিসও রেডি, লোকেশন দেখা হয়েছে।

এবার একটা গোষ্ঠী যেন নীরবে বাইরে থেকে কারো এসে এখানের ফিল্মে পা রাখাটাকে ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। দু'একজন প্রযোজকও এবার খেলা শুরু করলেন অন্তরালে। কেউ দাবি জানালেন—অমুককে সঙ্গীত পরিচালক করতে হবে। এরা চাইলেন শক্তিবাবুকে নানা ভাবে চাপ দিতে যাতে এখানের বাজারে তিনি বসতে না পারেন। আগুন থাক না থাক ধোঁয়ায় খবর আগেই ছড়ায়। বাজারে দু'একটা কথাও শুনি। সেদিন রাম ঝারি আমার অফিসেই এলেন। বলেন —শুনেছেন বাজারে নানা কথা উঠছে। ওরা চায় না শক্তিবাবু এখানে কাজ করুন।

আমি চিনি শক্তিবাবুকে। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মত বিদ্যা তার আছে। তাই বলি ওসব নিয়ে ভাববেন না। শক্তিবাবুতো পুজোর আগেই আসছেন। তখন সব মিটে যাবে।

শক্তিবাবু এলেন মহালয়ার পর। শুটিং এর প্ল্যান করতে হবে। মোহনদাকে ডেকে এনে বাংলোর কাজ শুরু করতে বলেন। প্রাথমিক পর্বের কাজের জন্য মোটা টাকার চেকও দিয়ে বলেন —কাজ শুরু করে দিন। যেন শুটিং এর আগেই সব হয়ে যায়। যা টাকার দরকার হবে বোম্বেতে ফোন করবেন এসে যাবে।

তখন শক্তিবাবু পার্ক হোটেলে উঠছেন। সেদিন বৈকালে গেছি, শক্তিবাবু বলেন এখানের মানুষজন কী ভাবেন বলুনতো? একজন ক্যামেরাম্যানকে চার মাস কাজের জন্য বললাম, তিনি চাইলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা! আমার ক্যামেরাম্যানকে দিই মাসে আটহাজার টাকা। বোম্বের গ্রেড ওয়ান ক্যামেরাম্যানদের এই রেট।

বাহাত্তর সালের কথা। তখন এখানে পুরো ছবির জন্য ভালো ক্যামেরাম্যান পেতেন বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা। শক্তিবাবু বলেন—এরা ভেবেছেন বোম্বাই সে এক মুর্গা আয়া, উসকো কাটো। হম মুর্গা থোড়াই হ্যায়।

এবার বুঝতে পারি রাম ঝারির কথাই ঠিক। নেপথ্যে একটা কালোহাত যেন শক্তিবাবুকে বাধাই দিতে চায় নানা ভাবে। যে অভিনেত্রীকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন তাকে আর পাওয়াই গেল না। শক্তিবাবুর সঙ্গে দেখা করতেও তিনি এলেন না। সেই রোল নিয়েও কথা হল না।

অন্তরাল থেকে একটা চাপও এসেছিল এখানেরই এক সঙ্গীত পরিচালককে

নেবার জন্য। কিন্তু তার আগেই এখানের শ্যামল মিত্রকে শক্তিবাবু সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে নিয়েছেন উত্তমবাবুর কথায়।

উত্তমবাবু খুবই বন্ধু-বৎসল ব্যক্তি। শ্যামল মিত্র অবশ্য গুণী সঙ্গীতশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক, উত্তমবাবুর সঙ্গে কয়েকটা ছবি করেছেন-দুজনে বন্ধুই। 'আমি সে ও সখা' তো দারুণ নাম করেছিল। উত্তম বেশ রসিয়ে গল্প করতেন। আমি সে ও সখা উপন্যাসটির লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, খুব ভালো মানুষ। নির্ভেজাল সাহিত্যিক। থাকেন প্রতাপাদিত্য রোডে। উত্তমবাবু ওর ওই উপন্যাস পড়ে ওটাকে ছবি করতে চান। শ্যামল মিত্র সহ প্রযোজক, সঙ্গীত পরিচালক হবেন। দুজনে আশুবাবুর বাড়িতে গেলেন। আশুতোষবাবু তখন চিত্রস্বত্ব দিতে রাজি নন। এরাও নাচাড়বান্দা। এদিকে খবর রটে গেছে উত্তমবাবু এসেছেন পাড়ার লোকজন আবালবৃদ্ধ বণিতা ভেঙে পড়েছে, পুলিশও হাজির। উত্তমবাবু বলেন আশুদা, ছবির রাইট না দেন, আমি প্রায়ই আসব। পাবলিক এসে আপনার জানলা দরজা খুলে নিয়ে যাবে, সেটা কি ভালো হবে?

এবার আশুবাবু রাইট দিতে আর দ্বিধা করেন না ওদের। দুজনের চেষ্টায় সে ছবিও হিট করেছিল। শ্যামলবাবু সঙ্গীত পরিচালক হলেন অমানুষের।

এদিকে রবি ঘোষ চিত্রনাট্য শোনার পর পর্দার চরিত্র করার জন্য মত দিয়েও সরে দাঁড়ালেন কেন জানি না।

শক্তিবাবু ইতিমধ্যে নীরব অসহযোগিতার কথাটা বুঝেছেন। তিনিও এসব সমাধানের কথা ভাবছেন। সেদিন আমি আর শক্তিবাবু দুজনে হোটেলের ঘরে কথা বলছি হঠাৎ পর্দা সঙ্গে অন্য এক কৌতুক অভিনেতা। এখানে যিনি করবেন বলেছিলেন তাকে ঢুকতে দেখে শক্তিবাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না।

ওই অভিনেতা বেশ স্মার্ট অঙ্গভঙ্গি করে বলে —দাদা, তাহলে ওই কথাই রইল। কালই আমি কনট্যাক্ট ফর্ম সই করে আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। ও কে?

শক্তিবাবু বলেন—না। আর কনট্যাক্ট ফর্ম আপনাকে সই করতে হবে না।

কৌতুকাভিনেতার কৌতুক মুছে গেছে চোখ মুখ থেকে। বলে—

—মানে!

শক্তিবাবু বলেন—আপনাকে আমার আর দরকার হবে না। আপনি অ্যাডভান্স যেটা নিয়েছেন সেটাই ফেরত দিয়ে যাবেন।

ভদ্রলোক বলে—ঠিক আছে, আমি আজই দিয়ে যাচ্ছি।

তারপরই ফিরে এসে বলেন—আজ ইয়ে আমার শুটিং আছে—

শক্তিবাবু বলেন আমার বোম্বে অফিসে চেকটা পাঠিয়ে দেবেন।

ভদ্রলোক চলে যেতে শক্তিবাবু বলেন—

—একেও পদার সহকারীর চরিত্রের অভিনয়ের জন্য কুড়ি হাজার টাকা দেব

বলেছিলাম, উনি রাজি হতে ওকে কনট্যাক্ট ফর্ম আর পাঁচ হাজার টাকা অ্যাডভ্যান্স পাঠিয়েছিলাম। উনি চেকটা ক্যাস করে বলেন কুড়ি হাজার নয়, তিরিশ হাজার টাকা দিতে হবে তবেই সই করবেন।

তখনকার দিনে ওই টাকা ওই অভিনেতার পক্ষে কোন অংশেই কম ছিল না। এখানে তার প্রতিদিনের রেট তখন আড়াই, তিনশো টাকা। সে হিসাবে এটা অনেক। কেউ তাকেও তোল্লা দিতে তিনি এই দাবি করেছেন।

শক্তিবাবু বলেন দশহাজার টাকাটা বড় নয়, আগে বললেই রফা হত। তা নয় এখন এই বলছেন তারপর সই করে শুটিং কদিন চলার পর ইনি তো আরও দাবি করতে পারেন। সেটাও সম্ভব এর পক্ষে তাই এমন লোককে নিয়ে কাজ করা ঠিক নয়।

এখানের শিল্পী কিছু কলাকুশলীকে দিয়ে এমনি কিছু ঘটনা ঘটানো হয়তো হয়েছিল যার ফলে শক্তিবাবুর কাযের প্ল্যানটাই গোলমাল হয়ে গেল। তিনিও ঠিক করলেন এই অসহযোগিতামূলক পরিবেশে সৃষ্টিধর্মী কাজ করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে। তাই তিনি এইভাবে এখানে ইউনিট রেখে কাজ করার ব্যাপারটাই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেদিন যদি বোম্বের, এমনি কোন প্রযোজক এখানে কাজ করে সফল হতেন হয়তো আরও বাইরের প্রযোজক আসতেন,আবার কলকাতা থেকে নিউ থিয়েটার্সের অবলুপ্তির পর হিন্দি ছবি কলকাতা থেকে তৈরি হত সর্বভারতীয় বাজারের জন্য। সেটা এখন ঘটছে মাদ্রাজ।

হায়দরাবাদে।

সেখানে তাদের তামিল, তেলেগু ভাষাতেও ছবি হচ্ছে। পাশাপাশি সেখানে বহু হিন্দি ছবিও তৈরি হচ্ছে। তারা এখন ভারতের বড় ছবির বাজার গড়েছে, আমরা নিজেদের প্রাধান্যকে হারিয়ে কুঁকড়ে গেছি। পদে পদে সামান্য স্বার্থ নিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছি।

শক্তিবাবু নভেম্বরে শুটিং-এর প্ল্যান বাতিলই করলেন। আবার নতুন ভাবে ভাবতে হবে। তারজন্য পটভূমিকা বেছে নিতে হবে। বোম্বাই-এর এদিকে কল্যাণের কাছাকাছি কিছু লোনা জলের খাড়ি কিছু ম্যানগ্রোভ আছে। তা সামান্যই। ওখানেই লোকেশন করতে হবে। আমিও মুষড়ে পড়ি। সুন্দরবন আর সেই খাড়ি, আসমান—জমিন ফারাক। এই বাদাবনের চরিত্র সেখানে নাই।

মোহনদাও হতাশ হয়েছেন। তিনি জানান—শক্তিবাবু, সুন্দরবন আমাকে অনেক দিয়েছে। সেই সুন্দরবনের প্রচার হবে সারা ভারতে। এর জন্য ওখানে থাকার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনি দলবল নিয়ে বোম্বাই থেকে হাওড়ায় পুরো দলকে পাঠাবেন, ওখান থেকে বাসে ইটিন্ডা, ওখানে লঞ্চ থাকবে। লোকেশানে মাস দু'য়েক থাকবেন, কাজ করবেন নিজের সব যন্ত্রপাতি শিল্পীদের নিয়ে আবার ওখান থেকে দমদম এয়ারপোর্ট, কেউ হাওড়া স্টেশনে উঠে ফিরে যাবেন বোম্বাই। এখানের

স্টুডিও, লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না এভাবেই যদি আসেন সব তৈরি থাকবে।

শক্তিবাবু বলেন আমি বোম্বে গিয়ে একটু ঠিকঠাক করে আপনাকে জানাচ্ছি মোহনদা। আপনার কথায় আমি ভরসা পাচ্ছি।

পুজোর ষষ্ঠীর দিন ভেবেছিলাম সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কালী পুজোর পর থেকে 'অমানুষ'-এর শুটিং শুরু হবে। কিন্তু হল না। সব অনিশ্চিতের মধ্যেই রয়ে গেল। হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন শক্তিবাবু বৈকালের ফ্লাইটে।

কিছু মহলে বেশ আনন্দের প্রকাশই পেল। সেই বাতিল কৌতুকাভিনেতাও খুশি। কোথাও বলা হলো ওসব চালবাজি। ওরা কলকাতার বাজার বুঝতে এসেছিল, ছবি করতে নয়।

আমিও হতাশ হয়ে পড়েছি। মনে হয় এসব নিয়ে আর এগোবেন না শক্তিবাবু। কিন্তু তার মত জেদী মানুষকে সহজে থামানো যায় না। তিনিও বোম্বাই বসে আবার নতুন করে শিল্পী নির্বাচন করলেন। নিলেন প্রেমা নারায়ণ, তরুণ ঘোষ আর পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র সুব্রত মহাপাত্রকে।

কলকাতা এসে এবার মোহনদাকেই বাংলো—সেখানের সব ব্যবস্থা করার ভার দিয়ে এবার ওখানে বোম্বাই থেকে নিজের ইউনিট এনেই সিধে ওখানে নিয়ে কাজ করবেন। আর ইনডোরের কাজ করবেন বোম্বাই-এ নিজেদের স্টুডিও 'নটরাজ'-এ এখানের স্টুডিওতে ঢুকবেন না।

তবে প্রয়োজন মত লাইটম্যান অন্য কিছু কর্মীদের নিতে হলে নেবেন। তারা কায করবে ওই সুন্দরবনের ক্যাম্পে থেকে। এইভাবেই তিনি অমানুষের কাজ করবেন। এখানের নামী ক্যাটারার কল্পনা ক্যাটারার্সকেই ভার দেওয়া হলো। ওরই সেখানে ওই বাদাবনে থেকে ক্যাটারিং করবেন। সব মেনুও ঠিক করে দেওয়া হলো।

ধাপার ময়লার পাহাড়ের নীচে দিয়ে আবাদ অঞ্চলে আবার একটা খোয়া ফেলা রাস্তা ছিল। সেটা ঘটকপুকুর ঘুসিষাটা মালঞ্চ হয়ে সরবেড়িয়া অবধি কোনমতে বহাল ছিল। সরবেড়িয়া থেকে ধামাখালি অবধি রাস্তার নকশা ছিল। মাটির চার কিলোমিটার রাস্তাও ছিল। সেটাতে খোয়া সুরকি ফেলে রাস্তা করা হচ্ছে।

জিপে করে একদিন সেই রাস্তাও দেখে আসা হলো। ধুলোর ঝড় তুলে গাড়ি চলতে পারে কোন মতে, রাস্তা ঠিকঠাক এর কায চলছে, তাহলে ক্যাম্পের আড়পার অবধি গাড়ি যাবে কোনমতে। বড় খালটা পারে হাতে হবে নিজেদের নৌকায় না হয় লঞ্চে। যাতায়াত কিছুটা সহজ হবে আর সাপ্লাই লাইনটাও ঠিক থাকবে। এত লোকের খাবার তো চাই।

তখনও রাস্তা খোলা হয়নি, যাতায়াতের পথ ইটিন্ডাঘাট হয়ে লঞ্চে। মোহনদা সেই বাদাবনে বাংলো তৈরির কাজ শুরু করেছেন। ষোল খানা ঘরের অস্থায়ী

বাংলো, ডরমেটারি, ক্যান্টিন হল, স্যানিটারি পায়খানা। দিনরাত কাজ চলছে। একটা পেরেকও নিতে হয় কলকাতা থেকে।

ওদিকে শুটিং ডেটও এগিয়ে আসছে। শক্তিবাবুর ভাই গিরিজাবাবুও এসে বাদাবনে থেকে মোহনবাবুর সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন। স্যানিটারী প্রিভি, ঘরে ঘরে এটাচড্ বাথ। জলের ব্যবস্থা, তারপর ইলেকট্রিক ওয়ারিং। এদিকে এতগুলো খাট-বিছানা, কম্বল, মশারি সব কিনে পাঠাতে হচ্ছে।

শেষ অবধি পুরো ইউনিট এলো। বাসে ইটিন্ডাঘাট সেখান থেকে লঞ্চে তুষখালি ক্যাম্প। উত্তমবাবু, অনিল, উৎপলবাবু, শর্মিলা ঠাকুররা গেলেন ওই ভাঙাচোরা পথে ধুলোর মধ্য দিয়েই। নাকে মুখে রুমাল বেঁধে দীর্ঘ বাদাবনের ওই পথ বেয়ে নেমে ধূলিধূসর মূর্তি দেখে নিজেদেরই চিনতে পারেন না।

তুষখালি মূলত একটা দ্বীপই। কলাগাছিয়া নদী এখানে বিশাল। ক্যাম্পের নীচ দিয়ে কলাগাছিয়া যেতে রামপুরার খাল বয়ে গেছে। খালও বেশ গুরুগম্ভীর, এটা গিয়ে মিশেছে বিদ্যানদীতে। ওদিকে আর একটা খাল। তুষখালি সেই দ্বীপের মধ্যে। ক্যাম্পের, দুই দিকেই নদী আর বড় খাল। ওই খাল দিয়ে যাত্রীবাহী লঞ্চ যায় গোসাবার দিকে। ওদিকের খাল দিয়েও লঞ্চ নৌকা যায় সুন্দরবনের শেষ জনবসত মোল্লাখালির দিকে।

মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে মোহনদা ময়দানবের পুরী গড়ে তুলেছেন। উঁচু পাটাতনের উপর শিল্পী-মূল টেকনিসিয়ানদের জন্য বাংলো। শাল কাঠের মেঝে, দেওয়াল, দরজা, জানলাও বসানো, রং করা হয়েছে। মাথায় গোলপাতার ছাউনি। বারান্দায় সুদৃশ্য রেলিং, এটা চড্‌বাথ বিজলি বাতি জ্বলছে ঘরে ঘরে। ওদিকে বিশাল ডর্মেটারি সাধারণ কর্মীদের থাকার জন্য তক্তপোষ বিছানা, কম্বল, মশারি। অজ গ্রাম, সেখানে ধোপার ব্যাপার নাই। তাই ধোপা নিয়ে গিয়ে নিজেরাই ধোবিখানা, ইস্ত্রিঘরও বানিয়েছে। এত স্টাফদের জামা কাপড় কাচা হবে।

ওদিকে সুন্দর হলে সানমাইকার টেবিল, চেয়ার, টেবিলে ফুলদানী দিয়ে ক্যানটিন হলও সাজনো। কিচেনে মেনুমত ফিস, চিকেন, এগ্ সবই রয়েছে। কলকাতা থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি মুরগী, গাড়িতে ছাগলও ডজন খানেক। অন্য শাক সব্জী আনাজপত্র সব সাপ্লাই যাচ্ছে।

পুরো ইউনিট চালু হয়ে গেল।

শক্তি ফিল্মস্-এর প্রোডাকশন কনট্রোলার গিরিজাবাবু, আর প্রোডাকশন ম্যানেজার মনোজ অধিকারীর কথা আগেই বলেছি। শিলং পিকে সে কালোকে সাদা করেই চালিয়ে দিয়েছিল।

মনোজকে যদি বলা হয়—মনোজবাবু, বাঘের দুধ চাই। মনোজ তক্ষণাৎ বলে দেবে— মিল জায়েগা দাদা। ওর অভিধানে 'না' বলে কিছু নাই, ওই বাদাবনেই মনোজ তার বাহিনী নিয়ে লাঠি ঘুরিয়ে চলেছে।

তুষখালি ছোট্ট একটা গ্রাম। ঘুমন্ত গ্রাম। গ্রামে ছেলেদের একটা ক্লাবঘর মত ছিল। মোহনদার পরামর্শেই শক্তিবাবু গ্রামের ছেলেদের ডেকে এনে বললেন তোমাদের এখানেই এসেছি আশা করি তোমরা এই কাজে সাধ্যমত সহযোগিতা করবে।

ক্লাবের বইপত্র কেনার জন্য তখনকার দিনে হাজার টাকা দিলেন। ছেলেরাও করণীয় একটা কাজ পেয়ে গেল। একমাস শুটিং করার পর বাদ দিয়ে আবার একমাস পুরো শুটিং করেছিলেন। ছেলেরাই সব সহযোগিতা করে ভিড় সামলে নির্বিঘ্নে শুটিং এর ব্যবস্থা করেছিল। পুলিশও ছিল— সে নামকা বাস্তে। সব কাজ তুষখালির ছেলেরাই করেছিল। মনোজের ছিল ওদের সঙ্গেই যোগাযোগ ক্রাউডের দরকার। বাঁধ বাঁধার কাছে ঝুড়ি কোদাল সমেত লোক চাই, শ দুই মানুষকে তারাই ফিট করে দিল। মনোজ পেল বাহবা।

আমিও গাড়িতে নাকমুখ বেঁধে মাঝে মাঝে যাই ওদের ক্যাম্পে দু'চার দিন থাকি।

মূল বাংলোটা ছিল 'ই সেপের' ইংরাজী 'ই' অক্ষরের মাঝের ঠ্যাংটা বাদ ছিল। তিনদিক ঘরে ঘেরা বাংলো, মাঝখানে একটা বটগাছ, এদিকে খালের বিস্তার, ভেড়ি বাঁধ দিয়ে সীমা রেখা টানা। মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় দুটো টেবিল আর খান দশেক চেয়ার পাতা।

তখন জানুয়ারি মাস। ভোর পাঁচটাতেই ক্যানটিনের বয়রা ঘরে ঘরে বেড-টি ভরমেটরিতেও বেড-টি চলে যায়। এত লোকের জন্য প্রিভি বাথরুম করা হয়েছে। ওরা ছ'টার মধ্যে বাথরুম, স্নান সেরে তৈরি হয়ে যায়। শুটিং এর জন্য একটা লঞ্চ ভাড়া করা হয়েছে। এছাড়াও মোহনদার লঞ্চও রয়েছে। আর দু'তিনটে বড় ডিঙিও রাখা আছে যাতায়াদের জন্য। গাড়ির কোনও ব্যাপার নাই। সবই এখানে জলপথ। বাহন বলতে ওই।

কলকাতার কয়েকজন কর্মীকেও দেখলাম। তারাও বহাল তবিয়তে বাদাবনের ক্যাম্পে রয়েছে, বোম্বাইওয়ালাদের দলে ভিড়ে গেছে সহজেই। ছ'টার মধ্যে শিল্পীরাও তৈরি। মেকআপ ম্যানরা বসে গেছে এখানেই শিল্পীদের মেকআপ করতে।

মেকআপ শেষ করে সাতটার মধ্যে সকলেই লঞ্চে উঠে পড়ে, ক্যামেরা রিফ্লেকেটার ওসবও তোলা হয়ে গেছে। ওরা যাত্রা করলো লোকেশনে । কোনদিন ওপারে সন্দেশখালিতে, কখনও রামপুরার হাটে, কখনও বাদায় কোন ভেড়িতে।

আবার ক্যাম্পের আশপাশেও শুটিং হয়। সেদিন পায়ে হেটেই যাতায়াত করে সকলে ক্যাম্পে মাঝে মাঝে যাই।

সাধারণত সকাল থেকে বেলা একটা অবধি কাদায় জলে মাঠে শুটিং চলে। একটাই লঞ্চ। কয়েকটা গার্ডেন আমব্রেলা বসাতে হয় মাঠে। আবাদ অঞ্চলে দু'চারটে বড় শিরীষ, কৃষ্ণচূড়া ছাড়া কোন গাছ ভালো হয় না। তাই যত্রতত্র ছাওয়াও

মেলে না। তাই ওই ছায়াহীন রুক্ষ কোন বাদায় ওই ভাবে ছায়ার সৃষ্টি করে হাত পা ধুয়ে ওখানেই লাঞ্চ প্যাক তাই সকলে খেয়ে আবার কাদায় নামে। সূর্য পাটে যাবার আগে যতটুকু আলো থাকে শুটিং হয়, তারপর ক্যাম্পে ফিরে স্নান করে এবার ওই টেবিল ঘিরে আমাদের আড্ডা বসে। পান ভোজনও করেন কেউ কেউ। হাসনাবাদ থেকে গোসাবা অবধি লঞ্চ যায়, যাত্রীবাহী লঞ্চ। মনোজ ওই লঞ্চের সারেংকে ফিট করেছে, রোজ হাসনাবাদের বরফ কল থেকে একটা বড় বরফের স্ল্যাব চটে মুড়ে কাঠ গুড়ো দিয়ে এনে সে নামিয়ে দিয়ে যায়, ওটা থাকে বাংলোর নীচে। সন্ধ্যায় ওই বরফটা এদের পানীয়ের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। শক্তিবাবু, উত্তমবাবু, উৎপলবাবু, চিফ ক্যামেরাম্যান আলো দাশগুপ্ত, অসিত সেন, অনিল, আমি গেলে আমিও ওদের আড্ডায় জমে যাই। মাঝে মাঝে শর্মিলা ঠাকুরও এসে বসেন।

শর্মিলাকে নিয়ে মাঝে মাঝে মজাও করা হয়। শর্মিলা শুটিং-এর পর এসে নিজের ঘরে মেকআপ তুলে স্নান করবে। কাজের লোক টেকচাঁদকে একবার বলে—এটা আনতে, তারপর আবার ডেকে বলে আর কিছু আনতে। সে চলে যাচ্ছে শর্মিলার আবার কিছু মনে পড়ে যায়, সেটার ফর্দ করেই মনে পড়ে অন্যটার কথা, আবার ডাক পড়ে-টেকচাঁদ।

টেকচাঁদ তো মেমসাহেবের বরাতের ঠ্যালায় মাকুর মত যাতায়াতই করছে, আবার আসে সে পরের হুকুম শুনতে।

এটা প্রায়ই রোজকার ঘটনা। তাই শর্মিলা টেকচাঁদকে ডাকলেই, এদিক থেকে উৎপলবাবু হাঁকেন টেকচাঁদ। উত্তমবাবু থাকেন একনম্বর রুমে, তিনি ডাকেন—টেকচাঁদ-অনিলও সাড়া তোলে—টেকচাঁদ। শক্তিবাবুও বাদ যান না। ফলে টেকচাঁদের অবস্থা কাহিল ব্যাপারটা শর্মিলারও বুঝতে বাকি থকে না। সেও তারপর সামলে নেয়।

তাই নিয়েই হাসাহাসি।

বৈকালে শুটিং-এর পরও স্টাফদের ক্যানটিন থেকে স্ন্যাকস দেওয়া হয়, বাবুদের টেবিলে কিছু আসে, আড্ডা জমে ওঠে। আমি অনিল এখানে বৈষ্ণব, বাকিরা সকলেই কম বেশি শাক্ত।

ওই আড্ডাতেই ছবির কাজ, চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা হয়। শুটিং করতে করতে দেখা যায় চিত্রনাট্যে কিছু সংযোজন প্রয়োজন নাহলে চরিত্র বিকাশে ঘটনায় বর্ণিত রি-অ্যাকশন ঠিক আসছে না। সেইমত দু'একটা সিনও লিখতে হয়।

এখনও শেষ নিয়ে পাকা সিদ্ধান্ত কিছু হয়নি। শক্তিবাবু তার মতেই অনড়, আমিও তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। তিনি চেষ্টা করেন আমাকে বোঝাতে, মধুকে সমাজে ফিরিয়ে আনতেই হবে। মেঘে ঢাকা তারা নিয়ে যা ঘটেছিল এখন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। তাই নিয়ে শুটিং-এ যাবার আগে সকালে বটতলায় আমার আর শক্তিবাবুর মধ্যে আলোচনা চলে রোজই।

তারপর দুজনে লঞ্চে উঠে পড়ি আলোচনা মুলতুবি রেখে। যেদিন ওই আলোচনা হয় না দুজনে চুপচাপ উঠে পড়ি।

সেদিন উত্তমবাবু বলেন আমাকে—কই আজ আপনাদের বটতলার নাটক তো হল না।

ব্যাপারটা উনি লক্ষ করতেন।

যেদিন কাছাকাছি শুটিং থাকত, উত্তমবাবুর কাজ দেরিতে শুরু হবে সেদিনও উত্তমবাবু ভোরেই উঠতেন। হ্যাফপ্যান্ট শার্ট আর কেভস্ পরে তিনি একাই, কোনদিন আমাকে নিয়ে মর্নিংওয়াকে বের হতেন ভেড়ির পথ ধরে। এখানে কেউ তাকে বিরক্ত করত না। মুক্ত পরিবেশে সাধারণ একজনের মতই অবাধ মুক্তির আনন্দে ঘুরতেন, শহরে যা কোনদিনই সম্ভব ছিল না। তিনিই বলতেন শহরে ছক বাঁধা বন্দি জীবনে হাঁফিয়ে পড়েছি, এই মুক্ত প্রকৃতির মাঝে এসে অবাধ মুক্তির সন্ধান পেয়েছি।

উত্তমবাবুর কয়েকজন গেস্ট প্রায়ই থাকত। ক্যানটিনে বলা থাকত তাঁর গেস্টদের কথা। তারা আর কেউ নয়, স্থানীয় কোন দুঃস্থ বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা। মর্নিংওয়াকে যাবার সময় তাদের সঙ্গে দেখা হত, উত্তমবাবু তাদের কাউকে কাউকে দুপুরে খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আসতেন।

সুটিং-এ ভিড় এবার শুরু হলো দু'একদিনের মধ্যেই। দূর দূরান্ত এমনকি জলপথে বাংলাদেশ থেকেও নৌকা ভর্তি মানুষ আসত। সারা গাং ভরে যেত লোকের ভিড়ে, গ্রাম উপছে পড়ত মানুষের ভিড়ে।

তুষখালিতে কোন দোকান পশার ছিল না, ছোট্ট ছড়ানো ছিটানো জনবসত, সেখানেই এখন মেলা বসে গেল। ডাবের দোকান, কোল্ড ড্রিংক্স, চা-খাবারের দোকানও বসে গেল উৎসাহী ব্যবসায়ীদের চেষ্টাতে। গ্রামের সব মানুষের বাড়িতে এসেছে শুটিং দেখতে তাদের দূর-দূরান্তরের আত্মীয়-স্বজনরা। সারা গ্রামে উৎসবের মেজাজ। ভিড় প্রচুর কিন্তু কোন গোলমাল নেই। সরে যেতে বললে তারাই লোকজন সরায়, গ্রামের ছেলেরাও ইউনিটের লোকজনদের মতোই হয়ে গেছে।

শুটিং রেঞ্জটা ওরাই দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখে। সেদিন শুটিং চলছে তুষখালি গ্রামেই জমিদারের পরিত্যক্ত কাছারি বাড়িতে। এর আগে বোম্বাই-এর স্টুডিওতে কিছু শুটিং হয়েছে সেই সব শুটিং-এর পর এখানে এসেছেন ওরা।

শুটিং চলাকালীন কিছু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। শক্তিবাবুও সহকারীদের কী বলছেন, সেটে রয়েছে শর্মিলা ঠাকুর গ্রাম্য শিক্ষিকার পোষাকে। শর্মিলা ভিড়ের মধ্যে একটি তরুণের দিকে বার বার আঙুল দেখিয়ে কী যেন বলার চেষ্টা করছে। আমি শুটিং ছেড়ে তখনও যাইনি। ভেড়ির ওপর থেকে দৃশ্যটা দেখছি, শর্মিলা কী

যেন বলতে চায় ওই ছেলেটির ব্যাপারে। ছেলেটির হাতে একটি সাধারণ ক্যামেরা, কাঁধে ব্যাগ। উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবীর দল ভেবে নেয় ছেলেটি শর্মিলার দিকে নিশ্চয়ই অপমানসূচক কোন কথা বলেছে। তারাও এবার ধরতে যায় ছেলেটিকে রে রে করে। ছেলেটিও বিপদ বুঝে ভিড় ঠেলে বের হয়ে সোজা ভেড়ি ধরে দৌড়তে থাকে, আর উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকের দল কিছু স্থানীয় মানুষও তাকে তাড়া করে পিছনে। ছেলেটি এবার প্রাণভয়ে দৌড়ছে, কোনমতে পালাতেই হবে। কিন্তু এতো দ্বীপভূমি, ওদিকেই গভীর চওড়া খাল। পার হবার জন্য খেয়া আছে, নৌকা তখন ওপারে, ফলে ধরা পড়ে যায়।

ওরাই ছেলেটিকে দু'চার-ঘা দিয়ে টেনে আনে গুটিং-এর কাছে। তাদের এলাকায় অতিথিদের অপমান করবে এটা এখানের মানুষ সহ্য করবে না। তাই দিদিকে কী বলেছে তার বিচার চাই।

গোলমাল দেখে এগিয়ে গেলাম। তুষখালিতে যাতায়াত আমার অনেকদিন থেকেই, ছেলেরাও আমাকে চেনে। তাদের হাত থেকে ওই ধরাপড়া ছেলেটিকে বাচাঁই। ছেলেটি বলে কাতরস্বরে —আমি কিছুই করিনি, একটা ফটো তুলতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন, ওরা তাড়া করল।

শেষ অবধি শর্মিলাই আসল ব্যাপারটা বলেন। ছেলেটির কাঁধে রয়েছে একটি খয়েরি রং-এর শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। ওই ধরনের একটা ব্যাগই শর্মিলার বোম্বাই-এর শটে ছিল তার কাঁধে। আজ তার পরের শট। ওই ব্যাগটা কন্টিনিউটি হয়ে গেছে আর এরা সেই ব্যাগটাকেই আনতে ভুলে গেছেন। তাই শট নিতেও তাদের অসুবিধা হচ্ছিল। এখানে এই মুহূর্তে তেমনি ব্যাগ কোথায় মিলবে। শর্মিলা সেই সময় ওই ছেলেটির কাঁধের ব্যাগটার দিকেই ওদের নজর আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছিলেন। তার বার বার ওই ইঙ্গিতেই উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকরা ওকে তাড়া করে কোন বেয়াদবি করেছে ভেবে।

ছেলেটি ওই ব্যাগটা দেয় স্বেচ্ছায়, গোলমালও মিটে যায়। ছেলেটিকে ছবি তোলার অনুমতিও দেওয়া হল।

আমি মাঝে মাঝে যাই, দু'চার দিন থাকি, সেবার যেতে আমাকে উৎপলবাবুর ঘরেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। উৎপলবাবু ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষ, প্রচুর পড়শোনা, রাজনীতিতে তিনি কিছু সময় দিতেন। মোহনদার ছোটভাই সনৎবাবু আমার বন্ধু। ওর চেষ্টাতেই সুন্দরবনে এত বড় বাংলো সব ব্যবস্থা হয়েছিল মোহনদাকে ধরে। সনৎও মাঝে মাঝে গেলে আড্ডায় বসত, সে ছিল কট্টর সি-পি-আই আর উৎপলবাবু ছিলেন তখন এম-এল পন্থী। দুজনের তর্ক বাধিয়ে দেওয়া হত। তারপর উৎপলবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারী করতেন আর স্ট্যালিন-এর

রাজনীতিকে নস্যাৎ করে নাটকীয় ভঙ্গিতে ভাষণ দিতেন, যেন মঞ্চের কোন নাটকেই অভিনয় করছেন।

'উত্তমবাবু নীরবে হাসতেন, অনিল মাঝে মাঝে ফোড়ন দিত, ততই নাটক জমত।'

উৎপলবাবুর সঙ্গে সাহিত্য-নাটক নিয়ে আলোচনাও খুব হৃদয়গ্রাহী হত। বই ছিল সঙ্গী। কিন্তু একরাত্রি তার ঘরে থাকার পর দিনই আমিই এসে আশ্রয় নিলাম শক্তি ফিল্মস্-এর বাংলো ছেড়ে পুরোনো লগ কেবিনে। উৎপলবাবুর কণ্ঠস্বর যেমন সতেজ উদার ছিল, নাসিকা গর্জন ছিল তার চেয়েও সোচ্চার। সে রাতে ঘুমুতে পারিনি।

সারা ইউনিট একমন একপ্রাণে কাজেই মেতেছিল। বৈকালে শুটিং-এর পর আড্ডায় বসেছে সকলে। উত্তমবাবুই বলেন চলুন-আজ সন্ধ্যায় কিছু শুটিং এগিয়ে নিন। তবু কিছুটা কাজ এগিয়ে থাকবে। লঞ্চের সিনগুলোই করা যাক।

অমানুষে একটা সিকোয়েন্স আছে—মফস্বলের এক মহিলা রোগীকে দেখতে যেতে হবে। ডাক্তারের শরীর খারাপ। তার বোন শর্মিলাই লঞ্চে যায় সেই মহিলাকে দেখতে। ফেরার জন্য যাত্রীবাহী লঞ্চ নেই। মহিম ঘোষালের লঞ্চেই ফিরতে হয়। সেখানে দেখে সে মধুকে। মধুকে সে ভুল বুঝে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সেই বখাটে মধুকে দেখে লঞ্চে। আর ভাগ্যক্রমে লঞ্চ খারাপ হয়ে যায়, একটা রাত্রি আটকে পড়ে ওরা একই লঞ্চে। সেই রাত্রিতে শর্মিলা নতুন করে চেনে মধুকে।

এই ভোরেই লঞ্চে—কি আশায় বাঁধি খেলাঘর গানটা রয়েছে। শক্তিবাবু প্রথম থেকেই বলেন এই সিচুয়েশন ফোর্সড। এটা আপনি ঠিক লিখেননি, অহেতুক সুযোগ নিয়েছেন, কয়েক ঘণ্টার যাত্রাপথে রাতভরের নাকি স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

শক্তিবাবু সব কিছুরই চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে চান। তাই এই সিচুয়েশনে তার অমত ছিল। আমি বলি।

—এটা শহর বা গ্রাম হলে যা বলছেন সেটা মানতাম। কিন্তু আবাদ অঞ্চলের জীবন যাত্রায় সবই অনিশ্চিত একটা রাত পথে কোথাও আটকে যাওয়া এখানের অতি স্বাভাবিক ঘটনা। আমি সেই পরিস্থিতি বুঝেই এই ঘটনাকে কাজে লাগিয়েছি এখানে এইটাই স্বাভাবিক ঘটনা। শক্তিবাবু বলেন ঠিক মানতে পারছি না।

এর কিছুদিন পরই আমি সন্ধ্যার মুখে ক্যাম্পে গেছি। ক্যাম্প ফাঁকা। এদিকে মোহনদার ক্যাম্পে মোহনদা রয়েছেন ওর লোকজন লঞ্চটাও রয়েছে, মোহনদা বলেন ওরা সব শুটিং করতে গেছে।

দূরে কোথায় লোকেশন থাকলেও সাতটা আটটার মধ্যে ফিরবেন। কিন্তু রাত্রি দশটা বেজে গেল তখনও ওদের লঞ্চ ফেরেনি। চিন্তায় পড়েন মোহনদা। লঞ্চে

পুরো স্টাফই রয়েছে, উত্তমবাবু, উৎপলবাবু, অনিল, শর্মিলা, শক্তিবাবু সকলেই রয়েছেন।

রাত্রি এগারোটা বেজে গেল তখনও দেখা নাই। জলের পথ, মারমুখী গাং, ওদিকে বাংলাদেশ বর্ডার, মাঝে মাঝে গাং-এ ডাকাতিও হয়। কে জানে কী হল।

মোহনদাই বলেন তোমরা আমার লঞ্চ নিয়ে বের হয়ে পড়ো, বড় গাং ধরেই গেছে ওরা বনের দিকে।

সেইরাতে কয়েকজন পুলিশ, কিছু গ্রামের ছেলেদের লঞ্চে নিয়ে বের হলাম। সোজা ঘণ্টা তিনেক এসে বোলা রায়মঙ্গলের মোড়, বিস্তীর্ণ জলসীমা এদিকে বাঘনা ফরেস্ট অফিস তারপরই আদিম অরণ্য। মাছ ধরার নৌকা থেকে তারা বলে শুটিং পার্টি সন্ধ্যাতক এখানে ছিল তারপর ওরা আর বড় গাং দিয়ে ফেরেনি— মোল্লাখালির খালের দিকেই গেল।

তখন রাত তিনটে বাজে। ওদের পাত্তা পেয়েছি। ওটা ছোট গাং এর ঘুর পথ। রাত্রে সাবরং ওই সব যাত্রীদের নিয়ে বড় গাং-এ যাবার ঝুঁকি নেয়নি। ওই পথেই গেছে নিরাপত্তার জন্য।

আমার বড় গাং ধরেই ফিরছি। ওই মোল্লাখালির খালও আমাদের ক্যাম্পের মাইল খানেক নীচে এসে এই গাং এই পড়েছে।

ফেরার পথে দেখা যায় ওদের লঞ্চ সেই খাল দিয়ে আসছে। ওরা ওই ঘুরপথে গিয়ে মোল্লাখালির হাটতলায় পৌঁছেছে। রাত্রি দশটা নাগাদ, লঞ্চে খাবার নাই জলও ফুরিয়ে আসছে। তাই হাটতলায় নেমে দোকানদারদের ডেকে তুলে কিছু রসগোল্লা আর মুড়ি মাত্র পেয়েছে, তাই দিয়ে রাতের ডিনার সেরে জল খেয়ে ফিরছে রাত কাটিয়ে ভোরবেলায়। দেখে আমরা ততক্ষণে সার্চপার্টি বের করেছি। দুটো লঞ্চ এসে ঘাটে লাগল। ক্লান্ত বিপর্যস্ত শিল্পী, স্টাফরা রাতভর ধকলের পর নেমে গেল।

শক্তিবাবুও নামছেন আমি বলি

—শক্তিবাবু দেখলেন তো এখানের জীবন। কে কোথায় কখন আটকে পড়ে তার ঠিক নেই। এখানে এমন ঘটনাই স্বাভাবিক।

শক্তিবাবু বলেন তাই দেখছি।

ওই দুর্ভোগের সুফল কিন্তু ফলেছিল। এই কষ্টের মধ্যেই ওরা সেদিন বিপদসঙ্কুল গাং-এ কি আশায় বাঁধি খেলাঘর গানটা পিকচারাইজ করেছিলেন যা ওই ছবির সম্পদ হয়েছিল।

অমানুষ ছবিতে উত্তমবাবু, উৎপলবাবু আর অনিল তিনজন ছিলেন মুখ্য ভূমিকাতে, অনিল প্রায়ই অনুযোগ করত আমাকে কী রোল দিলে দাদা, দুই দিকে দুই উদোম পাগল মাঝখানে আমি। একেবারে স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিচ্ছে।

আমি বলতাম অনিল, তুমিই কমট্রোলিং ফ্যাক্টর। তোমাকে রাশ টেনে রাখতে হবে। তুমি রেডি থাকো দেখবে তোমার চরিত্র ঠিক ঠেলে বের হবে। অনিলও শক্তিমান অভিনেতা। ও সে কাজটা ঠিকমতো করেছিল। তার অভিনয় ছিল খুবই ব্যালানস্। ভারসাম্য সে ঠিক বজায় রেখেছিল।

উৎপলবাবুও চেষ্টা করেছিলেন তার অভিনয়ে লেংড়ে চলার ভঙ্গিতে কথাবলার ভঙ্গিতে একটা চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে। তা পেরেছিলেন। ভিলেন চরিত্রে একটা নতুন মাত্রা তিনি এসেছিলেন ওই ছবিতে। উত্তমবাবু ছিলেন নিষ্ঠাবান অভিনেতা। সেদিন ক্যাম্পে সন্ধার আড্ডায় জানাই, কাল ফিরতে হবে। শক্তিবাবু বলেন— আপনি তো বসন্তের কোকিল, নিজের খুশিতে আসেন যান আপনাকে বাধা কে দেবে?

উত্তমবাবু হঠাৎ বলেন কাল আপনার না গেলেই নয়?

বলি— তা নয়।

উত্তমবাবু বলেন তাহলে কাল থেকেই যান।

আমিও রাজি হয়ে যাই। উত্তমবাবু বলেন এতদিন ছবির ভিতরের অংশগুলো স্যুট করা হয়েছে। কাল বই এর ফাস্টসিন, মধুর প্রথম ইনট্রোডাক্টারি সিনটা দেওয়া হবে। কাল আপনিও দেখুন। পরদিন সকালে ওপারের সন্দেশখালির দিকের গাং-এ অমানুষ-এর প্রথম মধুর বেলা দুটোকে নিয়ে নৌকায় করে আসার দৃশ্যটা টেক করা হচ্ছে।

বিশাল গাং, দুই বেলা তরুণঘোষ আর সুব্রত মহাপাত্র ডিঙ্গি নিয়ে চলেছে, পাটাতনে শুয়ে আছে মধু, পরনে রংজ্বলা একটা প্যান্ট, লাটপাট একটা জামা—মুখে খেজুর পাতার একটা টুপি ঢাকা।

আমাদের কথায় এবার টুপিটা সরিয়ে নৌকায় উঠে দাঁড়ায় মধু। লঞ্চের সামনের ডেকে ক্যামেরা, পাশে শক্তিবাবু, আমিও লঞ্চের ডেকে। প্রথম সট দিয়েই নৌকার ওপর থেমে দণ্ডায়মান অবস্থায় উত্তমবাবু আমাকেই প্রথম ওঠেন—ঠিক ঠিক মনে হচ্ছে, মিলছে আপনার কল্পনার মধুর সঙ্গে?

আমি সেদিন উত্তমবাবুর সার্থক চরিত্র রূপায়ণের মূলতত্ত্ব কি সেটা কিঞ্চিৎ অনুভব করেছিলাম। লেখকের কল্পনাকেই সার্থক রূপ দিতে চেষ্টা করতেন তিনি। সেদিন উত্তমবাবুকে নতুন করে চিনেছিলাম। তিনি ছিলেন মহান শিল্পী। তারপরেও অনেককে দেখলাম তার ধারেকাছে পৌঁছাবার যোগ্যতাও কারো নেই। কথাটা অপ্রিয় হলেও কঠিন সত্য।

সাহিত্য আর সিনেমার ভাষা আলাদা। উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব একটা স্বাধীনতা থাকে, গ্রন্থকারের নিজের মতো প্রকাশ করার সুযোগ সেখানে থাকে। কিন্তু সিনেমার

দর্শক সব শ্রেণীর মানুষ তাই সেখানে বাঞ্ছাপূরণের প্রশ্ন থাকে। দর্শক চায় সুখী সুন্দর পরিসমাপ্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেঘেঢাকা তারাতেও নীতা মরেছিল কিন্তু নীতার সংগ্রামী মানসিকতার মৃত্যু ঘটেনি তা দেখিয়েছিলাম, অর্থাৎ পজেটিভ এ্যাপ্রোচ ছিলই—এখানেও তাই শেষ অবধি মধুর পজিটিভ পরিণতিটাই মেনে নিয়েছিলাম শক্তিবাবুর কথাতে। সেইমতো করেই শেষ দৃশ্য লেখা হল।

আর উত্তমকুমার শেষ দৃশ্যে অভিনয় করে সেই একগুণ ভাবকে চারগুণ করে বিস্ফোরক অভিনয় করেছিলেন। আর তা সম্ভব হয়েছিল উত্তমবাবু বলেই।

তিনি যখন শুটিং করতেন সেই চরিত্রের মধ্যে ডুবে যেতেন। আর একটা দিনে একটা ছবিতেই অভিনয় করতেন আরো এক সিফট—দরকার হলে দেড় সিফ্‌টও আর প্রায় বারো ঘণ্টা।

এখন দেখি কোনো নায়ক এলেন একটা সেটে। এখানে ওর জমিদারের ছেলের চরিত্র, এসেই মেকআপ নিচ্ছেন আর দু'একজন স্তাবক, অন্য প্রযোজকদের গন্ধই শুনছেন, কথা বলছেন, এ ছবির পরিচালককে বললেন—আমাকে আজ বেলা দুটোয় ছেড়ে দিতে হবে।

পরিচালকও হন্তদন্ত হয়ে তার প্রোগ্রাম বাতিল করে হিরোকে নিয়ে দমাদ্দম শট নিতে শুরু করলেন। হিরোরও কিছু মনে নেই এ চরিত্রের ব্যাপারে। সহকারীর পড়া ডায়ালগ সেও পাখির মতো উগরে দিয়ে দুটোতে উঠলেন আর এক পরিচালকের ফ্লোরে, এদের কাছে পুরো সিফ্‌টের পয়সা নিয়ে হাফ কাজ করেই। সেখানে ওর এক প্রতিবাদী তরুণের ভূমিকা। জমিদারের বখাটে ছেলে হল এবার প্রতিবাদী আদর্শবাদী তরুণ। মেকআপ ম্যান দাড়ি লাগিয়ে আর সেল ফ্রেমের চশমা পরিয়ে তাকে বানিয়ে দিল। এখানের পরিচালককেও বললেন ছ'টায় ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু।

হিরো এসেছেন তাতেই ধন্য পরিচালক। তিনিও এবার আদর্শবান যুবককে নিয়ে ঘণ্টা কয়েক ধস্তাধস্তি করে কিছু শট নিলেন। হিরো এখানেও অর্ধেক কাজ করে পুরো রোজ নিয়ে গাড়িতে উঠে এবার অন্য এক পরিচালকের সেটে গিয়ে দর্শন দিলেন সেখানে সাতটা থেকে রাত এগারোটা অবধি সাজলেন কোনো আদর্শ প্রেমিক। প্রেমিকাকে ঘাড়ে তুলে না হয় লুকোচুরি খেলে রাম্মো সাম্মো নেচে প্রেমের গান গেয়ে প্রণামী কুড়িয়ে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরলেন।

তার লাভ হল একদিনে তিনদিনের মজুরির মোট টাকা। কিন্তু তিনটে চরিত্রের কোনোটাতেই তিনি কোনো ছাপই রাখতে পারলেন না। ফলে তিনটে ছবিই ডাব্বা হয়ে গেল। প্রযোজক দোষ দেন পরিচালককে, না হয় কাহিনীর চিত্রনাট্যকারকে বলে—কিৎসু জানে না।

বাংলা সিনেমায় কাহিনী, চিত্রনাট্যকরের অবস্থা রাজার বাড়ির সানাইওয়ালার মতো. রাজার ছেলে হয়েছে। আনন্দে রাজা রাজ্যের সব বাদ্যকরদের ডেকে এনে বাদ্যিবাজনা করলেন। বাদ্যকরদের যে যার যন্ত্র ভর্তি করে টাকা-পয়সা নিতে বললেন। ঢাকী ঢুলি কাসিদারও কিছু পেল বেশীই। সানাইওয়ালা তার কি পুরবে? সামান্যই পেয়েছে সে।

এমনসময় খবর এল রাজার সদ্যজাত সন্তান মারা গেছে। রাজামশাই বলেন—ওই বাদ্যকরদের জন্যই ছেলে মারা গেছে। ওই যন্ত্র দিয়েই ওদের পেটাও।

ঢাক-ঢোল কাঁসি দিয়ে আর কি প্রহার করা যাবে, তারা কমের উপরই বেঁচে গেল। সানাই বেশ মজবুত, তা দিয়ে পিটিয়ে সানাইওয়ালাকে সহজেই ক্ষতবিক্ষত করে দিল রাজার লোক।

সিনেমায় লেখকদের অবস্থা তাই-ই। ছবি হিট করলে তখন হিরো-হিরোইন পরিচালক সঙ্গীত পরিচালকরাই সব কৃতিত্বের দাবিদার। ছবির মূল যে কাহিনী, চিত্রনাট্যকার রচয়িতার ভাগ্যে তেমন কিছু জোটে না সানাইওয়ালার মতো সিকি-আধুলিতেই তাকে খুশি থাকতে হয়।

কিন্তু ছবি ফ্লপ করলেই ধর সেই বেঁড়েকে। ওর গল্পে দম ছিল না তাই ছবি ফ্লপ করেছে। কাগজের সুধী সমালোচক তো তাকেই আগে বধ করেন। ছবি সুপার হিট করলে লেখকের নামও মুছে যায়। এই ঘটনা স্বয়ং বিভূতিবাবুর ক্ষেত্রেও হয়েছে। পথের পাঁচালীকে অনেকেই জানেন সত্যজিৎ বাবুরই সৃষ্টি হিসাবে। বিভূতিবাবু সেখানে প্রায় বিস্মরিত।

একে মেনে নিতেই হবে। প্রচার মাধ্যমও এখানে নীরব। আজকের ছবির অভিনয় কাহিনী পরিচালনা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। তবে আগেকার অভিনেতা—আজকের অভিনেতাদের মধ্যে পার্থক্যটা কি দেখেছি তাই বললাম।

উত্তমবাবুকে দেখেছি কাজ পাগল মানুষ। অবসর সময়েও কোনোদিন কাজে নামতেন। অভিনয়ের সময় সব ভুলে গিয়ে সেই চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতেন।

শক্তিবাবুর ইউনিটে তিনজন তাঁর ছবিতে অভিনয় করত। শক্তিবাবু বলতেন আমার তিনজন অভিনেতা আছে। তার সহকারী প্রভাত রায়, প্রডাকশন ম্যানেজার মনোজ অধিকারী আর সহকারী কামেরাম্যান রবীন কর। যে লঞ্চে শর্মিলা আটকে পড়েছিল সেই রাতে—তার সারেং হয়েছিল মনোজ, তার সহকারী প্রভাত রায়, আর খালাসী জীবন কর, ওদের তিনজন লঞ্চ বন্ধ হতে মদের বোতল খুলেছে লঞ্চে, শর্মিলা ভীত। এমন সময় মধু এসে পিটিয়ে ওই তিনজনকে। মনোজকে প্রথম সত্যিই যা মার দিলেন তাতে মনোজও বিপন্ন। সিনটা দারুণ রিয়েলিস্টিক হয়েছিল, সট শেষ

হতে উত্তমবাবু বলেন—লাগেনি তো মনোজ? মনোজ আর কি বলবে গালে তখন পাঁচ আঙুলের দাগ।

তারপর প্রভাতের পালা, যাহোক তার উপর আর ওই পর্বটা চলল না, সিট্‌কে রবীনও বেঁচে গেল।

উত্তমবাবু মারপিটের দৃশ্যটাও রিয়েলিস্টিক করতেন।

আরো একমাস গ্যাপ দিয়ে পুরো দুমাস কাল ওই বাদাবনে ছিল পুরো ইউনিট। জলে কাদায় রোদে হিমে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন সকলেই। ওই গ্রামের আশপাশের গ্রামের মানুষরা দুমাস এক আনন্দের জগতে বাস করেছেন।

এবার বিদায়ের পালা।

ক্যাম্প—ঘর, বাড়ি সব পড়ে রইল। যাবার সময় হল বিহঙ্গের।

ঘরে ফেরার পালা। একটি পরিবার যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কথা হল কাল লাঞ্চ করে ফেরা যাবে বনভয় করে। কিন্তু পথে যদি ঘেরাও হয়ে যাই তাই শিল্পীদের ভোর বেলাতেই ছেড়ে দেওয়া হল। তারা চলে গেলেন।

বাকি ইউনিট বের হল দুপুরে।

পথে মালঞ্চ বেশ বড় গ্রাম। হাটও বসে। সেইখানেই আমাদের গাড়িগুলো সব থামিয়ে দিল জনতা। কিন্তু তারা উত্তমবাবু, শর্মিলা, উৎপল অনিলকে পেলো না।

হতাশ জনতা আমাদের গাড়ির কাছেও আসে। সে গাড়িতে রয়েছি আমি, শক্তিবাবু, আলো দাশগুপ্ত চিফ ক্যামেরাম্যানকে হতাশ হয়ে বলে—এসব বিলকুল ফালতু পার্টি রে ছেড়ে দে—গাড়ি বের হয়ে এলো বলি ফালতু বলেই গণদেবতা এত সহজে ছেড়ে দিল। শক্তিবাবু বলেন তা সত্যি।

ওরা বোম্বাই-এ ফিরে গিয়ে বাকি টুকটাক শুটিং সেরে নিলেন।

ঋত্বিকবাবুর 'সুবর্ণরেখা' ছবিও সুনাম পেয়েছিল কিন্তু অর্থ পায়নি, ঋত্বিকবাবু এর মধ্যে কিছুদিন বাংলাদেশে গিয়ে একটি ছবি করছেন। তিতাস একটি নদীর নাম। অদ্বৈত মল্লবর্মন ছিলেন ওই অঞ্চলের বাসিন্দা। পরে ওকে দেখেছিলাম 'দেশ', পত্রিকার অফিসে, মৃদুভাষী নিরীহ ভদ্রলোক। শক্তিমান লেখক। ওই একটি উপন্যাসেই তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি এর সাফল্য দেখে যেতে পারেননি।

দ্বিতীয় পর্ব

অকালেই তিনি মারা যান। উৎপলবাবু তাঁর এই উপন্যাস অবলম্বনে নাটকও করেছিলেন। সেই নাটকও দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। পরে ঋত্বিক বাংলাদেশের কোনো প্রযোজকের হয়ে এই ছবি পরিচালনা করেছিলেন। এর এডিটিংও সম্পূর্ণ করতে পারেননি। অসুস্থ হয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়।

মোহিনীর ছবি দর্শকরা নেয়নি। অথচ এই ছবির জন্য মোহিনী কত কষ্ট স্বীকার করেছে তা দেখেছি। নানা জনের কাছে টাকা নিয়ে বহুকষ্টে অনেক আশা নিয়ে ছবিটা করেছিল, অর্থাভাবে নানা মানসিক দুশ্চিন্তায় ছবি ঠিকমতো করা সম্ভব হয়নি। তাই বিপদেই পড়ল সে। চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছে। পরিচালক হবার পর যাকে তাকে গান লেখার জন্যও বলতে পারে না। ফলে বিব্রতই হতে হয়েছে।

তখন মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স জাতীয়করণ করা হয়নি। ওই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীদেবেন ভট্টাচার্য মশায়ের ব্যক্তিগত সহকারীর কাজই নিতে হল তাকে আর সুখের কথা দেবেনবাবু কয়েকটা ছবির প্রযোজনা করেছিলেন মোহিনী তাতে গান লিখে আবার সুনাম অর্জন করেছিল।

এখানের পর সে কিছুদিন ডক্টর মেঘনাদ সাহার ব্যক্তিগত সহকারীর কাজও করেছিল।

গানের জগতে তখন গৌরীপ্রসন্নবাবু উঠে আসছেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভালো গান লিখছে মোহিনী যেন হারিয়ে গেল।

গৌরীপ্রসন্নবাবু ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র খুবই সহজ সরল মানুষ। শক্তিবাবু তাকে দিয়েই অমানুষের গান শিখিয়েছিলেন। আমাদের ছেলেবেলায় সারা অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার খুবই প্রাদুর্ভাব ছিল। হাটে গঞ্জে ম্যালেরিয়ার টনিক বিক্রি হত। তখন বিপিনসুধা বলে ম্যালেরিয়ার একটা টনিক বিক্রি করত হাটে গান গেয়ে।

—এ-সে-ছে বিপিন সুধা।

বাজে ওষুধে কাজ হবে না।

সে খসড়াটা গৌরীবাবুকে শোনাতে গৌরীবাবুও চট করে ধরে নেয়। তারপর ওই মধুর মুখে বিপিনবাবুর কারণ সুধা—গানটা লিখে ফেললেন।

পূজার আগেই মুক্তি পেল 'অমানুষ' তারপর তা দর্শকদের চিত্ত জয় করে নিল। 'হাউস ফুল' বোর্ড ঝুলতেই থাকে। পূজার আগে শক্তিবাবু এসে এই অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে গেলেন। হিন্দি অমানুষও বোম্বে কেন সারা ভারতে সাড়া জাগাল। যে উত্তমকুমারকে হিন্দি দর্শক 'ছোটিসে মুলাকাত'-এ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারাই অমানুষে তাঁকে বরণ করে নিল। সারা ভারতবর্ষ তাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান জানাল।

শক্তিবাবু নিউথিয়েটার্স-এর প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান, তাদের ছবিগুলোও দেখেছেন।

বোম্বেতেও তিনি নিউথিয়েটার্স-এর ফণী মজুমদারের সহকারী ছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল নিউথিয়েটার্স-এর বিখ্যাত ছবি 'ডাক্তার' অবলম্বনে নতুন রূপে হিন্দি বাংলা ছবি করা। ওই কাহিনীর লেখক শৈলনানন্দ মুখোপাধ্যায়। তার 'তিন পুরুষ' নামে ওই কাহিনী কোনও পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে নিউথিয়েটার্স এটিকে হিন্দি বাংলাতে ছবি করেন, পরিচালক ছিলেন ফণি মজুমদার।

ডাক্তার-এর চিত্রস্বত্ব ছিল নিউথিয়েটার্স এর কাছে। নিউথিয়েটার্স-এর কর্ণধার শ্রীবি-এন সরকার মশাই-এর ছেলের কাছে তিনি এই স্বত্ব কেনেন।

তখন শৈলজানন্দ রোগ শয্যায়, নিঃসঙ্গ অসহায়। শক্তিবাবু চিত্রস্বত্ব কেনার পর ওর বেলগাছিয়ার বাড়িতে গিয়ে প্রণাম করে তাকে ও আলাদা টাকা দিয়ে তার আশীর্বাদ নিয়ে এই ছবির কাজ শুরু করেছেন।

এর উত্তমকুমারের তখন হিন্দি জগতেও চাহিদা বেড়েছে, তাকেই নায়ক করা হল সঙ্গে রইলেন অশোককুমার ওঁর বাবার ভূমিকায় উৎপলবাবুও বোম্বাই জয় করেছেন অমানুষের। অভিনয়ে তাঁকেও রাখা হল সঙ্গে ওখানের নামী শিল্পীরাও।

বাংলায় তরুণ মজুমদারের ছবি 'বালিকাবধূ' খুবই সুন্দর ছবি। অতীতের একটি যুগের পটভূমিকায় বালক-বালিকার প্রেম নিয়ে কাহিনী।

তখন এক-একটা বাংলা ছবি এক-একটা দিগদর্শনের সাড়া জাগাত। বালিকাবধূ তেমনি একটি চিরকালের ছবি। তরুণবাবুর উপর শক্তিবাবুর খুবই শ্রদ্ধা ছিল। ওই ছবিটিতে তরুণবাবু মহুয়া রায়চৌধুরীকে চিত্রজগতে আনেন। মৌসুমীর এটি প্রথম ছবি। মৌসুমীও তরুণবাবুরই আবিষ্কার।

শক্তিবাবু ওই বালিকাবধূ করতে চান হিন্দিতে। হিন্দি ছবিতে মারপিট অবান্তর ঘটনার সমাবেশ তিনি পছন্দ করতেন না। মনেপ্রাণে তিনি বাঙালি। তাই তার ছবিও হত কাহিনীও চরিত্র প্রধান।

আরাধনা, অনুরাগ, অমর প্রেম (নিশিপদ্ম) এসব ছবি করার সাহস, সাধ্য তার ছিল। তাই 'বালিকাবধূ'ও হিন্দি করতে চাইলেন। জানতেন এ তার সাবজেক্ট নয়, তাই তরুণবাবুকেই অনুরোধ করলেন শক্তি ফিল্মস্ এর ব্যানারে এই ছবি করতে হিন্দিতে।

তরুণবাবুও রাজি হলেন।

আনন্দ আশ্রমের আংশিক শুটিং করার জন্য এলেন কলকাতায়, আবার সেই তুষখালির বাদা, সেই বাংলো ডরমেটরী সবই তখনও মোহনদা টিকিয়ে রেখেছেন। তখন সেখানে অসীম সরকারের একটা ছবির শুটিং চলছিল শক্তিবাবুরা কদিন পর এলেন ওখানে শুটিং করতে।

ওই আবাদে যাবার পথে ঘটকপুকুরের ময়লা খালের ধারে ঘোড়ার গাড়িতে একটা গানের টেকিং করলেন।

শক্তিবাবু তার ছবির শুটিং করতে এখানে আসতেন আর শুটিং শেষ হয়ে গেলে

একটা সমস্যা হত। সহকারী প্রভাত রায় বারাকপুরের ছেলে, জ্যোতি রায়, নদীয়ার, রবীনকর সোনারপুরের, অজয় চন্দ সোদপুরের, ওরা সবাই এত কাছে এসে দুচার দিন ঘরবাসী হতে চায়। তারপর বোম্বে ফিরবে। শক্তিবাবুর ইউনিট ক'দিনের জন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। ওখানে ফিরেই কাজ করা যাবে না। বাবুরা দিন সাতেক পর ফিরবেন। শক্তিবাবু বলতেন।

—আর বাংলায় শুটিং করতে আসব না তোমাদের জন্যে। ওদের ছুটিও মঞ্জুর হত শক্তিবাবু আবার পরের বই এর শুটিং করতে একই আসতেন।

অমানুষ তখন সগৌরবে চলেছে। উত্তরা পূরবী উজ্জ্বলাতে তখন আশী সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। অমানুষের প্লাটিনাম জুবিলী উৎসব হচ্ছে।

সব শিল্পী কলাকুশলীরা এসেছেন। সেদিন উজ্জ্বলা হল কানায় কানায় ভর্তি। শিল্পী কলাকুশলীদের স্মারক পুরস্কার দেওয়া হবে। শক্তিবাবু আমাকে দেখে বলেন—অনুষ্ঠানের পর হোটেলে যাবেন। গাড়ি থাকবে। বাড়ি চলে যাবেন না।

আমিও ঘাড় নাড়ি, শক্তিবাবু আবার অন্যদিকে চলে গেলেন অতিথিদের সঙ্গে কথা বলতে। ব্যাপারটা দেখেছিলেন গিরিজাবাবু ওর ছোট ভাই।

গিরিজাবাবু এবার এসে বলেন আমাকে—দাদা কি বললেন?

—হোটেলে যেতে বললেন অনুষ্ঠানের পর। আমার কথায় গিরিজাবাবু এদিক-ওদিকে চেয়ে বলেন

—আপনি যাবেন না। শুনেছি আজ আপনাকেই টার্গেট করা হয়েছে।

সুন্দরবনের সান্ধ্য আড্ডাতে দেখেছি ওরা এক-এক দিন এক-একজনের পিছনে লাগেন। আপ্যায়নের ঠ্যালায় বেচারার অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে। সেইদিন সেই তাদের টার্গেট। আজ এই উৎসবের পরে হোটেলে বেশ হৈচৈ হবে পার্টিতে, আর একজনকে সেদিন বিশেষ ভাবে আপ্যায়িত করে তাকে নাস্তানাবুদ করে নির্মল আনন্দ উপভোগ করবেন ওরা।

ওদের লক্ষ্য আজ আমিই। গিরিজাবাবু সেটা জানতে পেরে আমার মতো নিরীহ জীবকে সেই রাতে ওই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। আমি পুরস্কার নেবার পরই কাউকে কিছু না জানিয়ে নীরবে কেটে পড়েছিলাম।

পরদিন হোটেলে গেছি বেলা দশটা নাগাদ। তখন ওরা পার্ক হোটেলে উঠতেন। দেখি ড্রইংরুমে উৎসবের শেষ চিত্র, ওরাও একে একে উঠছেন। শক্তিবাবু বলেন

—কাল কোথায় চলে গেলেন? এলেন না।

জানাই, জরুরি কাজ ছিল তাই চলে যেতে হয়েছিল।

আনন্দ আশ্রমের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সেদিন শক্তিবাবু বলেন চা-বাগানের উপর কোনও কাহিনী ভাবুন। শক্তিবাবুর কিছু ছবিতে লোকেশনও একটা মুখ্য ভূমিকা নিত। অমানুষ-এ সুন্দরবনের গাং, আবাদ অঞ্চল একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। তাই এবারও পটভূমির উপরও গুরুত্ব দিতে চান তিনি। বলেন,

—কাজটা তাড়াতাড়ি শুরু করুন।

চা বাগান অঞ্চলের উপর লিখতে গেলে চা বাগানে থাকতে হবে। সেখানের পরিবেশ, তাদের জীবনচর্যা, সমস্যা এগুলোকে দেখতে হবে। চা বাগানের কাজ-এর ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। বিভূতিবাবুর কথা মনে পড়ে। তিনি বলতেন—যা দেখোনি যার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নাই তা নিয়ে লেখা যায় না।

তাই চা বাগানের উপর দিয়ে দার্জিলিং গিয়েই চা বাগান নিয়ে লেখা যায় না। চা বাগানের চা পাতার গন্ধটাকেও জানতে হবে। তাই সেখানে থাকার দরকার।

কি খেয়াল বশে সেদিন ডানকান এগ্রো কোম্পানির অফিসেই গেলাম। ওদের অনেক চা বাগান আছে দার্জিলিং তরাই অঞ্চলে। চা বাগান বিভাগের এক কর্মকর্তা মিঃ ঘোষ, তার সঙ্গে দেখা করার জন্য স্লিপ দিলাম।

কিছুক্ষণ পর ঠাণ্ডা ঘরে ডাক পড়ল। মিঃ ঘোষ বেশ ঘরোয়া মানুষই, কোম্পানি এগ্‌জিকিউটিভের মতো পেশাদারী ভদ্রলোক নন, কথায় বেশ অমায়িক সহজ ভাবেই ফুটে ওঠে। লেখার মশলা সংগ্রহের জন্য চা বাগানে থাকার জন্য অনুরোধ এর আগে কেউ তাকে জানায়নি। তাই একটু অবাক হন।

—লেখার রসদ জোগাড়ের জন্য যাবেন? চা বাগানের উপর লিখবেন?

—সেই রকমই ভাবছি, যদি সাহায্য করতে পারেন। মিঃ ঘোষ সুন্দর সুগন্ধী চাও খাওয়ালেন। তারপর বলেন

—আমাদের বাইশটা চা বাগান আছে ওদিকে। তবে সিনিক বিউটি দুটো বাগানেরই বেশি আমার মতে, একটা মার্গারেট হোপটি সেটা নেপাল সীমান্তে ছ হাজার ফিট থেকে তিন হাজার ফিট অবধি নেমেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে, তবে গর্জের ভাবটাই বেশি। আর সামসিং টি এস্টেট। সেটা তরাই এর মেটেলি থেকে পাঁচ কিলোমিটার একেবারে আকাশ ছোঁয়া ভুটান হিলস্ এর নীচেই। সমতল কিন্তু একেবারে পাহাড়ের নীচেই, একটা নদীও বয়ে গেছে—ওটাও সুন্দর।

বলি। তাহলে ওই সামসিং-এই যদি থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

মিঃ ঘোষ বলেন—টিকিট করেছেন? কবে যাবেন? জানাই—এখনও বুক করিনি। ঠাঁই তো পাইনি তখনও। বলেন, টিকিট বুক করে এসে জানান। সামসিং-এই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দুদিন পরই আমার এই সহকর্মী নৈহাটির দেবু মুখুর্য্যে (এ সাহিত্যিক বন্ধু সমরেশ বসুর শ্যালক) আর কলকতার অলক বসুকেই নিয়ে টিকিট করে এলাম নিউ জলপাইগুড়ি। দেবু অলককে নিয়ে মাঝে মাঝে অরণ্য অঞ্চলে যাই। কখনও বেতলার অরণ্যে, সেবার দণ্ডকারণ্যেরও সাথী ছিল ওরাই। এবার তরাই অঞ্চলেও সঙ্গী হল।

মিঃ ঘোষকে গিয়ে জানালাম রিজার্ভেশন-এর কথা।

মিঃ ঘোষ শুধোন ক'জন যাচ্ছেন?

—তিনজন।

—ভেজ না ননভেজ?

—ননভেজই।

মিঃ ঘোষ একটা চিরকুটে লিখে নেন নিউজলপাইগুড়িতে কবে কখন কোন ট্রেনে নামছি। তারপর বলেন, ঠিক আছে চলে যান। সব ব্যবস্থা থাকবে। ভালো করে জমিয়ে লিখবেন।

আর কোনো কথাই হলনা। কি ব্যবস্থা থাকবে সেখানে। কি ভাবে সামসিং যেতে হবে তাও জানি না। চালসা মেটেলি অবধির খবর জানি তারপর!

যা হয় হবে বেরিয়ে পড়লাম। কালীপূজার রাতেই দার্জিলিং মেল ধরে গিয়ে নামলাম নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে কি ব্যবস্থা থাকার, কি ভাবে যাবো জানিনা। তবু বুক ঠুকে বের হয়েছি যা হয় দেখা যাবে।

স্টেশনের বাইরে এসে এদিক-ওদিকে চাইছি, শিলিগুড়িতে যেতে হবে। দেখি একটি মার্জিত তরুণ এসে দাঁড়ায়। শুধোয় আমাকে—

—আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন? মিঃ রাজগুরু!

—হ্যাঁ।

তরুণটি বলে—আমি সোম, সামসিং চা বাগান থেকে এসেছি আপনাদের রিসিভ করতে। 'চলুন ওদিকে' দেখি একটা দুধসাদা অ্যামবাসাডর উর্দিপরা ড্রাইভার গাড়িতে মালপত্র তুলে রওনা দিলাম শিলিগুড়ির দিকে। শিলিগুড়িতে এসে ব্রেকফাস্ট করার জন্য হিলভিউ হোটেলের রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি। ব্রেকফাস্টের বিল চুকিয়ে দেবার জন্য অলক কাউন্টারের দিকে যাচ্ছে দেখে সোম বলে ওঠে, এখন থেকে আপনারা আমাদের গেস্ট। ওসব আমার উপর ছেড়ে দিন।

শিলিগুড়ি থেকে সামসিং প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার পথ। ভোরে ওখান থেকে আমাদের রিসিভ করার জন্য বের হয়েছে। সোম। আমাদের নিয়ে ফিরল ওরই বাংলোয় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সোম এখানের চ্যার্টার্ড একাউন্টেট। ব্যাচিলার। বাংলোটা প্রায় বিঘে পনেরোর উপর। চারিদিকে কমপাউন্ড ওয়াল। ভিতরে সুন্দর বাগান কয়েকটা আম লিচু আনারস গাছও আছে। দোতলা সাহেবী প্যাটার্নের কাঠের রাজকীয় বাংলো বয় বেয়ারা বাবুর্চি সবই আছে। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট, ইংলিশ ঘাট, ব্রোকেডের পাটা। বাথরুমে গীজার নীচে সাজানো ড্রইংরুম। পুবদিকে তিন পাশে কাঠ ঘেরা সিটিং কাম ডাইনিং। সকালের রোদ ঝলসে পড়ে।

খাবার ব্যবস্থাও থ্রিস্টার হোটেলের মতোই। আর একটা গাড়ি রয়েছে আমাদের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি।

এরপর শুরু হল চা বাগান পরিক্রমা। সহকারী ম্যানেজার সঙ্গে নিয়ে বাগানের সব কাজ প্ল্যাস্টিং প্লাকিং নার্শারীর কাজ রাতে চায়ের কারখানায় চা প্রসেসিং সবই

দেখি। কুলি বারাক সেখানে দুরকম। নেপালী কুলিদের বলা হয় আপথ্যান্ডার, তাদের বসতি আলাদা।

আর চা বাগান পত্তন যারা করেছিল ছোটনাগপুর উড়িষ্যার কুলিদের বংশধররা এখনও আছে। তাদের বলা হয় মাধেশিয়া। তাদের নাচগানও চলে নিয়মিত।

ওদের জীবনযাত্রা। সেখানের বাবু বাসার বাবুদের জীবনও দেখি। আর ঘুরি ওই অঞ্চলে যত্রতত্র। দিন ওদের ম্যানেজার্স বাংলো ক্লাবেও যাই। সেখানের উপর তলার নীচুতলার জীবনযাত্রাকেও দেখি কাছ থেকে। বিচিত্র এক জগৎ। প্রকৃতি এখন নিজেকে মেলে ধরেছে। সামসিং যেন মিনি সুইজারল্যান্ড। পাহাড় পাইন কমলার বন নদী মেঘ সবই বিচিত্র।

দিন-পনেরো কোনদিকে কেটে গেল ফিরে এলাম স্বপ্নজগৎ থেকে। সেই কদিনের অভিজ্ঞতা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। বেশ কিছু লেখায় সেই জগৎ সেখানের মানুষ এসেছিল উত্তরের পাখি, অন্তরঙ্গ অনিকেত ওইসব অভিজ্ঞতার ফসল।

শক্তিবাবুর জন্য লিখলাম অনুসন্ধান।

চা বাগানের এক কর্মীর অন্ধ মেয়ের কাহিনী। অমনি একটি অন্ধ মেয়েকে দেখেছিলাম চা বাগানে। এত সুন্দর জগৎ তার কাছে ছিল অর্থহীন। তবু স্বপ্ন দেখত সে একদিন নতুন করে বাঁচবে। সেই মেয়েটিই হল আমার নায়িকা।

গল্পটার প্রাথমিক খসড়া লিখে পাঠাবার পর শক্তিবাবুর ভালো লাগল, তিনি কিছু সাজেশন দিয়ে ওটাকে এবার চিত্রনাট্যকারে সাজাতে বললেন। সেইমতো সাজিয়ে চিত্রনাট্য পাঠালাম।

এর মধ্যে 'অমানুষ' সেবার অল ইন্ডিয়া নেপাল সিলোন সায়েন্স ক্লাবের নির্বাচনে সেরা কাহিনী চিত্রের সম্মান লাভ করেছে। দিল্লিতে তালকাটরা স্টেডিয়ামে ওদের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে যেতে হবে। শক্তিবাবু পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরিচালক, আমি শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার, উত্তমবাবু শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্যামল মিত্র শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক-এর সম্মান পেয়েছি। সেই অনুষ্ঠানে যেতে হবে।

বোম্বাই থেকে শক্তিবাবুরা আসবেন, শ্যামলবাবু আগেই চলে গেছেন। উত্তমবাবু যেতে পারছেন না। শক্তিবাবু দিল্লি থেকে আমাকে বোম্বাই যেতে বলেছেন। তাই ওই লায়ন্স ক্লাবকে জানিয়েছি। ওরা আমার জন্য ক্যালকাটা টু দিল্লি দিল্লি টু ক্যালকাটা না করে যেন দিল্লি টু বোম্বাই আমার টিকিট করে দেন প্লেনের।

এর আগে সর্বভারতীয় কোনো পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যাইনি। দিল্লির এয়ারপোর্টে নামতে দেখি লায়নরা, সিংহ নয়, লায়ন্স ক্লাবের মেম্বাররাও রয়েছেন। ওদিকে বোম্বাই থেকে প্লেন ভর্তি শিল্পী কলাকুশলীরাও এসে নেমেছেন। শক্তিবাবু, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, ধর্মেন্দ্র, হেলেন, শচীন, আমজাদ, দেবেন বার্মা, হেমামালিনী, রীনা রায়, কমলেশ্বর, বি-আর-চোপরা, রামানন্দ সাগর আরও অনেকে এসেছেন।

ওরা আমাদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে তুললেন হোটেল কুতব-এ। ফাইভস্টার হোটেল। তেমনি সাজানো. ছিমছাম আমাকে দিল শ্যামল মিত্রের পাশের ঘরেই। তার পাশে আমার হিন্দি সাহিত্যিক বন্ধু কমলেশ্বর। উনিই অমানুষ-এর হিন্দি সংলাপ রচয়িতা।

শ্যামল গুপ্তকে তখন লায়েন্স-এর কর্তারা পাকড়েছেন এ্যাওয়ার্ডের সময় প্রতিটি পুরস্কার প্রাপকের আসার সময় তার সম্মানে একদিন মিউজিক বাজানো হবে।

দিল্লির শিল্পীদের নিয়ে শ্যামলবাবু সেই মিউজিক কম্পোজ করতে ব্যস্ত। বলি শ্যামলবাবু, ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে এ দেখছি তাই।

দুপুরে সেদিন হোটেলে বুফে ডিনার। বিরাট হলে ঝকঝকে টেবিলে রকমারি খাবার সাজানো নীচে বার্নারে অল্প আগুন সেগুলোকে গরম করে রেখেছে। আমি বোধহয় হোটেলে ধুতি পাঞ্জাবী পরা একজন। বাকি সবাই সাহেবী পোশাকেই ঘুরছেন। আর দেখলাম ঋষিদাকে—তিনিও ধুতি পাঞ্জাবীই পরেছেন। খাবারের টেবিলে দেখি আস্ত একটা মাছ, চকেলেট রং-এর মশলায় ঢাকা, চেনা অচেনা নানা খাবারই রয়েছে।

একজন বেয়ারা বলে—দাদা। ওই মাছ খেতে পারবেন না। আঁশটে গন্ধ হবে।

দেখি সে বঙ্গসন্তান একা সেই-ই নয় বেশ কয়েকজন বঙ্গসন্তান ওই পোশাকে ঘুরছে। ওরাই বলে আপনি একটু বসুন। রাইখয়রা টাইপের মাছ আছে—ঝাল করে আনছি।

ওরা বেশ বড় একপ্লেটে সুদর্শন গোটা চারেক ভালো সাইজের মাছের ঝালও এনে দেয়। চেনা সবজী ডাল বাসমতি চালের ভাত ওই মাছ মন্দ জমবে না। আর একটা প্লেটে দুপিস বড পোনামাছ ভাজাও এনে দেয়।

খাঁও বেশ ভোজনবিলাসী। সেও এর মধ্যে গাদা খানেক খাবার বুফে টেবিল থেকে এনে আমার ওই মাছের ঝালের ধনেপাতা ইত্যাদির সুবাস শুঁকে বলে উ বড়িয়া মছলি হোগা থোড়া দিজিয়ে।

দাদা। ই তো টেবিলমে হ্যায় কেহি। খাস চীজ মালুম! বলি এটা ওরা দিলেন।

আমজাদও ভাগ বসিয়ে বেশ তারিফ করে খেলা সেই মাছ। বলে বাঙালি লোক মছলি বহুৎ বড়িয়া পাকাতা হ্যায়। মজা আগিয়া। বলি বাংলা মুলুকে এলে মাছ খাওয়াব।

দিল্লির তালকাটরা স্টেডিয়াম আমাদের নেতাজি ইনডোর-এর মত ছাঁচেই তৈরি। তবে কিছু ছোট, আর শহরের মধ্যে তাই ডানসমাবেশও হয় প্রচুর।

দিল্লি রাজধানী হলেও সেকালে কোনো ফিল্ম স্টুডিও গড়ে ওঠেনি। এখন টিভির জন্য দিল্লির পাশে নয়ডাতে টিভির জন্য কিছু কাজ হয়। স্টুডিও হয়েছে। তবে ফিচার ফিল্মের কোনো স্টুডিও নেই। তাই দিল্লির মানুষের ফিল্মের উপর শিল্পীদের জন্য মাতামাতি কিছু বেশিই।

তালকাটরা স্টেডিয়াম ঠাসা দর্শকের ভিড়ে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। কাহিনীচিত্রের পুরস্কার নিতে গেলাম ওরাই বলেনই অ্যাওয়ার্ড হর সাল কলকাত্তামেই যাতা হ্যায়।

অর্থাৎ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তখনও বাংলা ছবির রমরমাই বেশি। একালের মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির কাহিনীই তখন যেতো বোম্বাই, মাদ্রাজে। এর আগের বার ওই পুরস্কার নিয়েছেন আশুতোষবাবু। তার আগে পেয়েছিলেন নৃপেন চাটুয্যে মশায়, আমার পরের বার বিনয় চাটুয্যে।

কিন্তু বাংলা কাহিনীর সেই স্বর্ণযুগ হারিয়ে গেল। বাংলায় যদি ভালো কাহিনীর সার্থক চিত্ররূপ না হয়, সর্বভারতীয় থেকে সে ঠাঁই পাবে না

বাংলা চিত্র জগৎ এখন বোম্বাই, মাদ্রাজ এমনকি বাংলাদেশের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে এনে বাঙালি দর্শকদের গেলাতে চাইছেন। যারা বাংলা সাহিত্য থেকে গল্প নিয়ে এক-আধটা ছবি করতে বাধ্য হচ্ছেন প্রযোজকের চাপে পড়ে তারা নিজেরা চিত্রনাট্য ঠিক করতে পারেন না, বংশবদ পেটোয়া কোনো যাত্রাদলের পালাকারকে ডেকে এনে সাহিত্য থেকে চিত্রনাট্য করান। সাহিত্যের সূক্ষ্ম রসবোধ সিনেমার ভাষা যার জানা নেই, হিন্দি তিনটে ক্যাসেট দেখে যিনি গল্প খাড়া করে যাত্রার সস্তা সেন্টিমেন্ট আর মেঠো ডায়ালগ দিয়ে ছবি লেখেন তাঁর হাতে সাহিত্যের রসোত্তীর্ণ কোন গল্পের কি চিত্রনাট্যরূপে হবে? যারা যোগ্য লোকের উপর সেই ভার দেন না। ফলে মুড়ি-মিছরি একাকার হয়ে যায়, সে ছবিও জমে না।

তেমনি এক প্রাজ্ঞ পরিচালক আমাকে জানালেন—সাহিত্য থেকে গল্প নিয়ে সিনেমা করা যায় না। তার জন্য গল্প মনের মতো বানিয়ে নিতে হবে।

বাংলা ছবির সাফল্য গৌরবের ইতিহাসকে এরা নিজের অজ্ঞতার দাপটে বদলে দিতে গিয়ে আজ বাংলা ছবির সর্বনাশ ডেকে এনেছেন।

আজ অগ্রদূতের ঘরওয়ানা, তপন সিংহ তরুণ মজুমদারের ঘরওয়ানার ছবি করার উত্তরসূরি কেউ নাই। আজকের এরা—স্বয়ম্ভু, পাতাল ফোঁড় শিব। ঠেলে গজিয়ে উঠেছেন অধিকাংশই না হয় তালিম যা পেয়েছেন। মেঠো কোনো গুরুর কাছেই।

দুচারজন সত্যিকার কাজ জানা কোনো ঘরওয়ানায় তালিম পাওয়া তারাই দুচারটি ভালো ছবি করার চেষ্টা করছেন এইটাই আশার কথা।

অনুষ্ঠানের পর উৎসাহী দর্শকদের ভিড় থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফেরাই মুস্কিল। আমরা স্টেডিয়ামের ঘরে বন্দী। শেষে পুলিশই কোনোমতে পথ করে দেয়া। গাড়িগুলো বের হয়। কোনো উৎসাহী হবু গীতিকার তো আমার গাড়ির মধ্যেই তার গানের একটা বাঁধানো খাতা গছিয়ে দিল। দেখি হিন্দিতে লেখা কবিতা।

আমি চালান করে দিলাম কমলেশ্বরজীকে—শায়েদ আপ্‌কা কাম আয়েগা। রাতে হোটেলের নীচের হল পার্টি। হলের আলোগুলো খুবই কমানো। আলো-আঁধারির

পরিবেশ। ওদিকে কাঠ জ্বেলে মাংস ঝলসানো হচ্ছে। ওরা বলেন বারবিকিউ। আর সকলের হাতেই রঙিন পানীয়ের গ্লাশ। ওই বিগলিত স্বর্ণ রং পানীয় ছাড়া এদের পার্টি জমে না। আমি ওরসে বঞ্চিত। তবু হংস মধ্যে বকো যথা না হয়ে হৃষিকেশবাবুর পরামর্শে একটা গ্লাশ হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করি।

এক ফাঁকে সেটা কোনো টেবিলে নামিয়ে ভারমুক্ত হই। আর দেখি অন্য কোনো রসিক ব্যক্তি সেই বেওয়ারিস পানীয়ের গ্লাশটা তুলে নিলেন।

পরদিন বেশ দশটার ফ্লাইটে আমিও ওদের সঙ্গে বোম্বাই চলেছি অনুসন্ধানের কাজ করতে। প্লেনের অর্ধেকই বোম্বাই-এর বলিউডের মানুষজন। ওদের হাতে সেই অ্যাওয়ার্ড। প্লেন ছাড়ার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, প্লেন ছাড়ে না। প্লেনের মধ্যে কোপাইলট, স্টুয়ার্ট এবার হোস্টেসলরা ব্যস্ত হয়ে আনাগোনা করছে। কী যেন গুনছে, তবু হিসাব মেলে না।

শোনা গেল, একজন প্যাসেঞ্জারের মাল প্লেনের হোল্ডে তোলা হয়েছে কিন্তু সেই প্যাসেঞ্জারকে বার বার লাউঞ্জে কল করার পরও প্লেনে আসেনি। তাই প্লেনের হোল্ড খুলে সব লাগেজ বের করা হবে প্যাসেঞ্জরেরা নিজের নিজের লগেজ আইডেনটিফাই করলে তাদের মাল তুলে সেই গরহাজির যাত্রীর মাল ফেলে রেখে প্লেন ছাড়বে। তাই যাত্রীদের প্লেন থেকে নামতে হবে।

ঘণ্টাখানেক দেরি হবে। হাঙ্গামাও। এমন সময় দেখা যায় এক মূর্তি হাঁপাতে হাঁপাতে প্লেনের দিকে আসছে। ইনিই সেই জন যার জন্য আমরা প্লেনে আটকে আছি হাইজ্যাক করা প্লেনের যাত্রীদের মতো। সে বেচারা মালপত্র প্লেনে দিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে লাউঞ্জে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এইবার নিদ্রাভঙ্গ হতে প্লেনে এসেছেন।

যাক এবার নির্বিঘ্নে প্লেন ছাড়ল। পাশাপাশি তিনটে সিটে আমি মারাঠী, হিন্দির অভিনেতা শচীন ও তখন শক্তি ফ্লিমস-এর বালিকা বধূতে কাজ করছে। আর আমজাদ খাঁ সাহেব। আমজাদ তখনও এত মোটা হয়নি। একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টের পর ওর কি গণ্ডগোল হয় তারপর থেকেই মোটা হতে আরম্ভ করে।

তখন একটু ভারি চেহারা। ছবিতে দুর্দান্ত ভিলেন—কিন্তু আসলে শান্ত নিরীহ ষোলআনা ভদ্রলোক। হিন্দি ছবির আর এক দুর্দান্ত ভিলেন অম্বরীশ পুরীকেও দেখেছি। উনি প্রখ্যাত অভিনেতা মদনপুরীর ভাই। বোম্বের রাস্তায় যেখানে গাড়ি চলে ভালো গতিতেই, সেখানে ড্রাইভার গাড়ির গতি তুললেই অম্বরীষ পুরী সাবধান করেন—সামালকে! তাই ফিল্মলাইনে প্রবাদ আছে অম্বরীশ পুরীর গাড়ি বোম্বের রোডের তামাম গাড়িকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

এ সেই ঢাকাই কুট্টির গল্পের মতই। তার ঘোড়া জোরে ছুটতে পারে না। অন্যসব গাড়ি তার গাড়িকে পিছনে ফেলে যায়, যাত্রীরা তাড়া দিলে বলে—আমার ঘোড়া বাঘের বাচ্চা মিঞা, দ্যাখছেন না হক্কলেরই তাড়াই নিই যাইত্যাছে।

অম্বরীষ বাবুর গাড়িও তাই করে বোম্বাই-এর রাস্তায়।

আমজাদ খাঁয়ের মাথা ধরেছে। এয়ার হোসট্রেসকে আমি, শচীনও বলে মাথা ধরেছে।

আমাদেরও একটা করে অ্যাসপ্রো দেয়, দুজনের দুটো আর খাঁ সাহেবের একটা তিনটে অ্যাসপ্রো গিলে চা খেয়ে আমজাদ খাঁ ধাতস্থ হল। বলে হম সব জুট থোড়া জ্যাদা খাতা হ্যায়।

আবার সেই হোটেল ওরিয়েন্টাল প্যালেস এই উঠেছে। এর মধ্যে হোটেলের মালিক সর্দারজীও চিনেছে আমাকে। তরুণ সর্দারজী শক্তিবাবুর ছেলের ক্লাশফ্রেন্ড। হোটেলের ম্যানেজার স্টাফরাও অমানুষ দেখে মুগ্ধ। এবার উষ্ণ অভ্যর্থনাই পেলাম। আমি জানাই— সর্দারজী, রুম নাম্বার ফোর জিরো সেভেনই চাহিয়ে। ওই ঘরে বসেই অমানুষ লিখেছিলাম, তাই ওই ঘরটা এবারও চাই। ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

শক্তিবাবুর বেশ কয়েকখানা গাড়ি। ড্রাইভারও তিনজন। গিরিজাবাবু নিজেই ওর গাড়ি চালান। ওর বাহন একটা জার্মান ভক্সওয়েগন। শক্তিবাবু একটা জসুন কখনও বড় ভক্সহল গাড়ি ব্যবহার করেন। ওর খাস ড্রাইভার বাহাদুরও সেলাম করে।

—আইয়ে সাব।

বাহাদুর নেপালের লোক, এখন বোম্বাই-এ বসবাস করে। শক্তি ফিল্মস্ ওকে কোন সরকারি চালে একটা ঘর কিনে দিয়েছে। খুষ দিল আদমী ওই বাহাদুর। একটু বারজা অর্থাৎ দিশি পান করে বৌকে মাঝে মাঝে দু-একটা দেয়—আর বৌও চলে আগে সিধে শক্তিবাবুর কাছে ওর নামে নালিশ জানাতে।

শক্তিবাবু ধমকান—তেরেকো লাথ মারকে ভাগা দেগা।

বাহাদুর চুপ করেই থাকে। এমন নাটক মাঝে মাঝে হয় আবার ঠিকও হয়ে যায়।

তখনও হোটেলের আশপাশে কিছু গুজরাটিদের খাবারের দোকান ছিল। যেদিন স্টুডিওতে না যেতাম, ওইসব দোকানেই লাঞ্চ করতাম মাদ্রাজী থালির দোকানও ছিল। বোম্বেতে থাকতাম ঘার অঞ্চলে। হোটেলেও খাবার ব্যবস্থা ছিল। ওরা ভাতের সঙ্গে জিরে ফোড়ন দিত, তরকারী যা করত তাও কেমন পাঞ্জাবী ধরনের। ঠিক পছন্দ হত না। আর দামও বেশি।

অবশ্য ওসব বিল মেটাত শক্তি ফিল্মস্ এছাড়া হাতখরচা হিসাবেও একটা বরাদ্দ থাকত। তাই বাইরেই ওর মধ্যে দেখেশুনে পছন্দমত লাঞ্চ করতাম। বাইরের রেটও কম। খাবারও ভালো। মাদ্রাজী থালিতে নাপিতের ছোট্ট বাটির মত অনেক বাটিতেই কী সব দিত। আর পাঞ্জাবী দোকানে ছিল মেথি ভাজার প্রাধান্য।

সেবার বোম্বেতে রয়েছি আমি আর পাশেই হোটেল ময়ূরে রয়েছে আমার সাহিত্যিক বন্ধু প্রফুল্ল রায়। ও একটা ছবির কাজে ওখানে রয়েছে। দুপুরে দুই বঙ্গ সন্তান বের হতাম লাঞ্চ করতে। প্রফুল্লের পছন্দ ছিল পাঞ্জাবী খানা। তাই দুজনে দিন সাতেক পাঞ্জাবী লাঞ্চ করার পর দেখা গেল গা দিয়ে মেথি ভাজার গন্ধই যেন বের

হচ্ছে। প্রফুল্লবাবু বলে—আর নয়। অন্য দোকান ফিট করতে হবে। এবার গুজরাতি খানাই চলুক।

এর মধ্যে অশোককুমারের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছি। বোম্বাই-এ একটা ছবি হিট করলে তার ফলও মেলে। এখন দেখি আমাকেই চেনেন স্বীকৃতিও দেন। পরের কি ছবির জন্য লিখছি খোঁজখবর নেন।

অমানুষ-এর মধ্যে বোম্বে ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনেও শ্রেষ্ঠ কাহিনীর জন্য পুরস্কৃত হল। বিশাল সম্মুখানন্দ হল—আমাদের রবীন্দ্র সদনের তিন গুণের চেয়েও আকারে বড়। চার হাজার সিট। সেখানেই পুরস্কার নিয়ে এলাম।

অমানুষ-এর জন্য দিল্লি বোম্বাই থেকে পুরস্কার পেয়েছি কিন্তু মেঘে ঢাকা তারা কোনো পুরস্কার পায়নি এখানে, 'অমানুষ'ও কোন পুরস্কারই পায়নি বাংলায়। সেই বৎসরগুলোতে যে সব ছবিকে এখানের তৎকালীন পুরস্কারদাতারা পুরস্কৃত করেছিলেন আজ সেই ছবিগুলো অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। কিন্তু মেঘে ঢাকা তারা—অমানুষ আজও সগৌরবে বেঁচে আছে। তাই আমার মনে হয়েছিল পুরস্কারদাতাদের ছবির মান নির্ণয়ের মাপকাঠিতেই বোধ হয় কোনো গোলমাল ছিল সেটা ইতিহাসই প্রমাণ করেছে।

অনুসন্ধানের কাজ চলছে। এর মধ্যে তেরই জানুয়ারি এসে গেল। শক্তিবাবুর জন্মদিন। সেদিন শক্তি ফিল্মস্ এর স্টাফরা সমবেত ভাবে স্টুডিওতে শক্তিবাবুকে সম্বর্ধনা দেয় পার্টিও দেয় ছোটখাটো। শক্তিবাবু সেদিন সব স্টাফদের সঙ্গে হাত মেলান আর তাদের হাতে বিশেষ একমাসের বোনাসের একটা খামও দেন।

সেদিন ড্রাইভার বাহাদুরও এক মাসের পাগড় বেশি পেয়েছে। পার্টিতে দিল খুষ। আমাকে পৌঁছে দিতে আসছে হোটেলে। সিংকিং রোড খুবই বাজে রাস্তা। বাহাদুর খুশ মেজাজে গাড়ি চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে দুহাত ছেড়েই সঙ্গীতচর্চাও করছে। মেরে জিন্দগী এক কাটি পতঙ্গ। কাটিপতঙ্গ ছবির হিটগান—অর্থাৎ আমার জীবন এক ভৌ কাট্টা ঘুড়ির মতই আসমানে ভেসে চলেছে। তার ঠিকানা জানা নাই। শুধোয় কত পেলে বাহাদুর বোনাস।

বাহাদুর বলে এক মাহিনাকা পাগড়, সাব আউর কুছ দেনা—বলি বাড়িতে টাকাটা গিয়েই দিও ঘরবালীকে! —ঘরবালী! ওর হিয়া!

কেন শক্তি সাহেবের কাছে যে যায় নালিশ করতে? বাহাদুর বলে রং-এর ঘোরে—ওতো টেমপুরারী হিঁয়াকা, আসলি ঘরবালিতে দেশমে ভি বহুৎ ঝামেলা করছে। ইস্‌কো ভি ভাগা দেগা। বেশ হিসেবী করিতকর্মা লোক বাহাদুর। এখানে টেমপুরারি ঘরবালিও গুটিয়ে নিয়েছে। এবার তাকেও ছুট্টি করে দেবে। সেই খুশিতে গাইতে থাকে এবং কাটিপতঙ্গ বলি—আমার জিন্দগী এখনও কাটিপতঙ্গ হয়নি বাহাদুর। ভো কাট্টা হবার সাধ আমার নাই স্টিয়ারিং ঠিক্‌সে পাকড়ো! বাহাদুর বলে—ফিরি মৎ কিজিয়ে সাব? লেকিন একঠো বাত আবার কি হল? —ওহি

টেমপুরারী জানানাকো বাত বড় সাহেবকে মৎ বোলনা। ওকেও আশ্বাস দিই—ফিকির মৎ করনা।

বোম্বাই-এর ফিল্ম জগতের অনেকেই শহরের বাইরে চাষের জন্য কারো বা চাষবাস মুরগী খামারের ফার্ম আছে। অশোককুমারের মুরগী খামার, চাষের ফার্ম বিশাল। ওর মুরগী খামার, মুরগীর খাবার তৈরির কারখানা ছিল নাকি মহারাষ্ট্রের এক নম্বরে। তেমনি শক্তিবাবুর ও বিরাট মুরগীর ফার্ম লাগোয়া চাষের জমিও আছে।

এছাড়াও শক্তিবাবু, রাজেশ খান্না আর কোন পার্টনারের বোম্বাই-এর ওর্লিতে বড় হোটেলও ছিল। হোটেল হিলটপ। ওর্লি-র দিক থেকে শক্তিবাবু এখন তার অফিস এনেছেন নটরাজ স্টুডিওর লাগোয়া স্বামী এয়ার কনডিশনড স্টুডিও বিলডিং আন্ধেরীতে। আমার পক্ষে এত দূরে থাকা সম্ভব নয়, তাছাড়া হোটেল হিলটপের পরিবেশও আলাদা। বেশির ভাগ কাস্টমার হচ্ছেন সমুদ্রের মধ্যে যেখানে সমুদ্র থেকে তেল তোলা হচ্ছে সেই বোম্বে হাই-এর তেল কোম্পানির লোকজন অফিসার আর বেশ কিছু আরব, কুয়েত, বাহরিন মুলুকের শেখেরাই বেশি। ওই পরিবেশে কাজ করা যাবে না। শক্তিবাবুকেও হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে কাজে বসতে হয়, তাই কাছাকাছি খার অঞ্চলেই থাকি। এখানে বেশ কিছু বাঙালিও রয়েছে। খার, বাজারের মাছওয়ালী তরকারী বিক্রেতারাও তাই বাংলা বোঝে, কম বেশি বলতেও পারে।

কাছেই অভিনেতা, বোম্বে প্রবাসী বাঙালিদের এক জনপ্রিয়, ব্যক্তি মানিক দত্তও থাকেন, তাঁর স্ত্রী বিখ্যাত অভিনেত্রী অনীতা গুহ। ওদিকে থাকেন হেমন্তবাবু রাখী, কাছেই রামকৃষ্ণ মিশন।

প্রথম দিকে অমানুষ-এর সময় তখন শচীন দেববর্মন থাকতেন কাছেই নিমখানা মাঠের ধারে। গৌরীপ্রসন্নদার সঙ্গে মাঝে মাঝে ওর সেই বাড়িতে গেছি। রাহুল তখন কিশোর মাউথ অর্গান বাজাত। শচীন কত্তা বলতেন পোলাডার কিছুই হইব না। রাহুল কিছুদিন আগে কলকাতায় তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনের পাঠ শেষ করে বোম্বাই গেছে।

শচীন কত্তা সকালে উঠেই বারকয়েক নিমখানার মাঠে এদিক-ওদিক পায়চারী করতেন। তারপর পায়চারী শেষ করে পার্কের রেলিং-এ বাঁধা একটা গরুর কাছে এসে দাঁড়াতেন। অবশ্য একা শচীন কত্তাই নন, গো-মাতাকে ঘিরে তখন পায়চারী শেষ করে অনেক পুণ্যার্থী গুজরাতি, মারাঠি স্ত্রী পুরুষই মজুত রয়েছেন গো-মাতার সেবা করার জন্য। নধর ওই অঞ্চলের গরু, গরুর মালিক বেশ হুঁশিয়ার ব্যক্তি। বোম্বেতে ঘাসও অমিল। চারদিকে রুক্ষ পাহাড়। কোন উপত্যকায় ঘাস কিছু হয়, সেইসব ঘাসও বেশ দামি। পালংশাকের ছোট আটির মত এক আটটি ঘাসের দামই আট আনার মত।

সেই গরুওয়ালা বোঝা বেঁধে সেই ঘাসের আটি রেখেছে ওদিকে-গো-মাতার

সেবক- সেবিকারা সেই ঘাসের আটি কিনে গরুকে খাইয়ে পুণ্য অর্জন করে গোমাতাকে নমস্কার করে চলে যাচ্ছে। এবার শুরু হবে দিনভর তাদের রোকড়াকা ধান্দা। অর্থাৎ টাকার ধান্দা।

শচীন কর্তাও গোমাতার সেবা করে বাড়িতে চললেন। গরুওয়ালা ঘাস বেচেও করল আর পরের পয়সায় তার গরুর খাবারও জুটে গেল।

পাশেই থাকেন কবি হীরেন চট্টোপাধ্যায়। ইনি সরোজিনী নাইডুর ভাই। হায়দ্রাবাদ প্রবাসী বাঙালি। অনেক ভালো কবিতা লিখেছেন—তখন বয়স হয়েছে। সত্যজিৎবাবু এঁকে অনেক ছবির বিশেষ ভূমিকায় নামিয়েছিলেন। হীরেনবাবুর স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত 'বোটম্যান বয়' আন্তর্জাতিক মানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

তার পাশেই থাকতেন কৃষাণ চন্দর। প্রখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক। নামকরা গীতিকার কবি মুকুল দত্ত থাকেন কাছাকাছি। বিশিষ্ট ভদ্রলোক বহুদিন বাংলা ছাড়া। তবুও বাঙালি কালচার বাংলা সাহিত্য কবিতার সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগ। বাংলা ছবির অন্যতম সফল গীতিকার। বাংলা সিনেমার বহু সুপারহিট গান তার লেখা। পরে নিজে ছবি পরিচালনা করেছেন। চিত্রনাট্যও লিখেছেন।

এছাড়াও প্রায়ই যাতায়াত ছিল। কিষণ চন্দের পাশের বাড়িতেই থাকতেন পরিতোষ মজুমদার। ইনি দীর্ঘদিন জার্মানিতে থেকে বোম্বাই-এ ফিরে ওখানের ডোম্বিভ্যালীতে একটা কাটিং টুলস্-এর কারখানার পত্তন করেছেন। পেশায় ইনজিনিয়ারিং নেশায় সাহিত্যিক।

জার্মানির পটভূমিকায় বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তখন ওই হোটেলে আমি নিঃসঙ্গ অবস্থায় 'অমানুষ'-এর কাজ করছি স্টুডিওতে গেলে তবে বাঙালির দেখা পাই। বেশির ভাগ সময় হোটেলেই বন্দী থাকি. হঠাৎ পরিচয় হয়ে গেল ওর সঙ্গে।

একই প্রকাশনের ঘরে দুজনের বই রয়েছে। নাম জানি—চিনি না। নিজেই যেতে আলাপ করলেন নিঃসঙ্গ প্রবাসে বাঙালির দেখা পাওয়াই মুস্কিল। কাছেই থাকেন নিয়ে গেলেন জিমখানা মাঠের ধারে তার বাসায়।

বোম্বাই-এর দেশলাই বাক্স মার্কা ফ্ল্যাট নয়, একতলার পিছন দিকে বাংলো টাইপের এক বয়স্ক পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীর বাড়ি। পিছনে বেশ ফাঁকা উঠান. বাঁধানো। ওদিকে কয়েকটা আম, নারকেল গাছ। সবুজ কিছু রয়েছে। বেশ নিরিবিলি। পরিতোষবাবুর স্ত্রী কল্যাণীও এগিয়ে এলো, ওদের একটি বাচ্চা, রাজা। মনে হল মরুভূমির ঊষরতার মাঝে যেন এক ফালি মরুদ্যানের স্নিগ্ধতা পেলাম। সহজেই আপনজন হয়ে গেলাম তাদের। দিনভর কাজ করি পরিতোষবাবুও ব্যস্ত। রাত আটটার পর বেশ আড্ডাও জমে ওর ওখানে।

ক্রমশ খার অনেক বাঙালির সঙ্গে পরিচয় হল। তবে পরিতোষবাবুর বাড়ির

আড্ডা খাওয়া-দাওয়ার জন্যই বোম্বাই-এ গেলে খার-এর হোটেলেই থাকি। এখন আর নিঃসঙ্গ বোধ হয় না। কাজ আড্ডা সাহিত্যচর্চা দলবেঁধে বেড়ানো সবই হয়।

অনুসন্ধান-এর কাজ চলছে এই সময় শক্তিবাবু বাইরের প্রযোজকের ছবিও করতেন তারই স্টুডিওতে নিজের স্টাফদের নিয়ে। তখন মেহবুবা ছবির শুটিং চলছে। রাজেশ খান্না নায়ক।

রাজেশ খান্না তখন বোম্বাই চিত্রজগতের অন্যতম সেরা নায়ক। শক্তিবাবুই রাজেশ খান্নাকে নিয়ে বেশ কিছু ছবি করেছেন অমর প্রেম করেছিলেন অনুরাগের আগে।

বাংলা নিশিপদ্মের হিন্দি রূপ দিয়েছিলেন। রাজেশ করেছিলেন উত্তম কুমারের চরিত্র। দেখেছিলাম রাজেশ খান্না উত্তমকুমারেকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। অমানুষ-এর শুটিং-এর সময় রাজেশজীকে উত্তমবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখেছি। শুনেছি অমরপ্রেম করার আগে শক্তিবাবু একটা নিশিপদ্মের প্রিন্ট নিয়ে গিয়ে নিজেদের স্টুডিওর প্রজেকশন রুমে বার বার দেখেছেন রাজেশজীকেও দেখিয়েছেন। রাজেশ খান্না উত্তমবাবুর অভিনয়ের গভীরতা—সেই অভিব্যক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান।

তখন থেকেই উত্তমবাবুকে শ্রদ্ধার আসনে বসান।

সারা সপ্তাহ কাজ করি। বোম্বাই-এর লেখকদের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছি। শক্তি ফিল্মস্-এর লেখার কাজ করতেন প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক গুলশান নন্দা। ইনি পাঞ্জাবের লোক, বর্তমানে ওর দেখা পাকিস্তানে পড়েছে এখন উনি বোম্বাই প্রবাসী। হিন্দি উর্দু দুটো ভাষাতেই লেখেন। হিন্দির জনপ্রিয় সাহিত্যিক। এর বহু উপন্যাস হিন্দিতে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। শক্তিবাবু ওর গুণমুগ্ধ পাঠক। ওর কাটিপতঙ্গ আজনবী। উনিই অবাক করেছেন। গোল গোল চেহারা—মিষ্টভাষী মানুষ তাই দরদী কথা সাহিত্যিক তিনি।

দেখেছি আর এক বিদগ্ধ পণ্ডিতকে। সৌম্য চেহারা পরনে শাহী আমলের জোব্বা, কোমরে জরির বটুয়া বেনারসী পান খুশবুদার জর্দার সুবাস ছড়িয়ে আসতেন ডঃ রাহী মাসুম রেজা। তিনি ছিলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ উর্দু সাহিত্যিক। মহাভারত গীতাও মন দিয়ে পড়তেন। বহু সফল ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্যকার মহাভারত সিরিয়াল মূলত ইনি লিখতেন বেশিরভাগ। কমলেশ্বরজীও আসতেন স্টুডিওতে।

শক্তি ফিল্মস্-এর কোনো ছবির চিত্রনাট্য লেখা হবার পর আমরা তিনচার জন বসতাম শক্তিবাবুও থাকতেন। সে গুলশনজীর হোক আমারই হোক রাহী সাহেবেরই হোক সকলেই তার সেই চিত্রনাট্যের আলোচনায় যোগ দিতাম। নিজেদের মতামত প্রকাশ করে সেই চিত্রনাট্য, কাহিনীকে আরও সার্থক করা যায় কি ভাবে তার আলোচনাই হত। ফিল্মের চিত্রনাট্য কাহিনীর সার্থক উত্তরণের জন্য সবরকম চেষ্টা করতেন। এর জন্য স্টোরি ডিপার্টমেন্টও রাখতেন। সকলে মিলে একটা সুন্দর টিম গড়া হত।

দেখেছি বোম্বাই-এর লেখকরা কাজও পান আর অর্থও ভালো পান সর্বভারতীয় হিন্দি ভাষার লেখক বলে তাদের তুলনায় আঞ্চলিক ভাষার লেখকরা অনেক বেশি পরিশ্রম করে ভালো লিখেও তেমন অর্থ পান না। কারণ তাঁদের বাজার সীমিত। হিন্দি লেখকরা বোম্বাই-এর হিন্দি ছবি মাদ্রাজে তৈরি হিন্দি ছবিতেও লিখতে যান। পয়সাও পান।

তারা কম লিখে বেশি পান। তাই কিঞ্চিৎ আয়েসী। তারা দিনে ঘণ্টা চারেক লিখেই দম নেন। একটা চিত্রনাট্য কাহিনী লিখতে চার-পাঁচ মাস সময় নেন। তার তুলনায় আমরা অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারি।

ফাস্ট আর আমার বোম্বাই-এর কাজ শেষ করতে পারলে দুটি, তাই তাড়াতাড়ি কাজ করি।

সপ্তাহভর কাজ করি, শনিবার বৈকালে, কখনও রবিবার সকালে বের হই শক্তিবাবুর সঙ্গে ওর ফার্মে। খার থেকে বের হয়ে আসি চেম্বুরে। সেখানে ইউনিয়ন পার্কে অশোক কুমারের বাড়ি। দাদামণির ফার্মও শক্তিবাবুর ফার্মের পাশেই। তাই দাদামণিও আমাদের সঙ্গী হন। তখন আনন্দ আশ্রম কলকাতায় রিলিজ করেছে। তিনি কলকাতার দর্শকদের মতামতের খোঁজখবরও নেন।

'আনন্দ আশ্রমে' দেখেছিলাম দুই তাবড় অভিনেতার অভিনয়। এদিকে বাবার ভূমিকায় অশোক কুমার, ওদিকে ছেলের ভূমিকায় উত্তমবাবু, অশোক কুমার বলতেন বাংলার ব্যাপারে আপনি আমায় একটু দেখাবেন উত্তমবাবু।

উত্তমবাবু বলেন সেকি!

অশোক কুমার বলেন হিন্দির ব্যাপারে নেবে, বাংলার ব্যাপারে আপনিই মাস্টার!

দাদামণি থাকেন চেম্বুরে ওখানে ওর বিশাল বাংলো। বেশ কয়েকটা তাগড়া কুকুরও মজুত। ভীষণ দর্শন তারা দাদামণির কুকুরের প্রতি অসাধারণ প্রীতি, অভিজ্ঞতাও বিচিত্র। সে সব পরে জানাব।

গাড়িতে দাদামণিকে তুললাম। সামনের সিটেই বসেন উনি। অবশ্য এক পাটি ফলস্ বাধানো দাঁত মাঝে মাঝে লাগান তাতে মুখের আদল এমন বদলে যায় যে চেনাই যায় না। সেই পাটিটা লাগিয়ে বেশ আয়েস করে বসেন। বলেন—বুঝলে ফ্যানদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই অস্ত্রটা আমি আবিষ্কার করেছি। কেউ আর জ্বালাতন করে না।

গাড়ি চলেছে চেম্বুর ক্রিকের টোল গেট পার হয়ে পাহাড়গুলোর দিকে। সমুদ্রের খাড়ির এদিকে পাহাড় আর পতিত জমি, দূরে সমুদ্র। দু'একটা মাছ মারা সম্প্রদায় কোলিদের বাস। এখন শহর বাড়ছে, ক্রিকের এপারেও গড়ে উঠছে ঘন বসতি, তিনচারতলা ফ্ল্যাট বাড়ি। স্রেফ কনক্রিটের পিলারের উপর ব্লাবের দেওয়াল পিস পিস করে ফ্রেমে তুলে কনক্রিটের পিলারের খাঁজে সেট করে ঘরের খাঁচা হয়ে যাচ্ছে।

ওই সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় কতদিন ওর পরমায়ুকে জানে। তবু ওতেই মানুষ থাকছে। ওদিকে বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে গড়ে উঠছে সহকারী অফিস বিলডিং।

এই সেই নিউ বোম্বে বড়িরা ওদিকে ভোম্বুভ্যালি অবধি চলে গেছে। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে চলেছি। পাশে দু'একটা কারখানা, এখানের কলকারখানা গুলোও বেশ ছিমছাম, গাছপালা দিয়ে সাজানো। আমাদের বাংলা মুলুকের মত দৈন্যদশাগ্রস্থ নয়।

বেশ কিছুটা এসে একটা বড় গ্রামই পড়লো, পানভেল, দোকান পশার রয়েছে, এদিকে রুক্ষ ধূ ধূ প্রান্তর, দূরে পাহাড়শ্রেণী, পানভিসের বাজারে গাড়ি থামাতে দাদামণি আমাকে বলেন।

—পান সিগ্রেট যা কেনার কিনে নিন দুদিনের মত।

কল্যাণ থেকে পানভিল হয়ে উড়ান অবধি একটা রেললাইন গেছে। তখনও এই লাইনে কয়লার ইঞ্জিন চলত। বোম্বে সিনেমার বহু রেলগাড়ির সুটিং হত এই লাইনেই এদিকের স্টেশনগুলোও ফাঁকা প্লাটফর্মে গাছগাছালি আছে। ওই লাইন সমুদ্রের ধার অবধি চলে গেছে। ওই সমুদ্রতীর থেকে বোম্বেহাই-এর তৈলকূপগুলো কাছে পড়ে।

পাহাড়ের কাছে এসে গেছি। পানভিল থেকে একটা রাস্তা পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বুক চিরে চলে গেছে গোয়ার দিকে, অন্যটা গেছে পুনা হয়ে দক্ষিণ ভারতের দিকে। এইটা দিয়েই দক্ষিণ ভারতে যাতায়াত করে ট্রাকের বহর। গাড়ি।

আমরা পুনা রোড ধরে চলেছি। দূরে ম্যাম্বারণ হিল স্টেশনের পাহাড় শ্রেণী। ওই দিকেই তখন মিঠুন ফার্ম করেছে, বাপী লাহিড়ীরও ফার্ম রয়েছে কাজতে বলে একটা গ্রামে।

ওদিকে পানভিল পুনা রোডে আলিবাগের কাছে রাখীর ফার্ম। ওর ফার্মে ধান চাষ হয়, পুকুরও আছে। আর প্রচুর বিখ্যাত এলফ্যানসো আমগাছও লাগিয়েছে। চাষ আবাদ হয়। এক একটা বাংলোও করে রেখেছে, মাঝে মাঝে বোম্বাই-এর ইট-কাঠ-এর রাজ্য ছেড়ে সবুজ প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে বাস করে।

পাহাড়ঘেরা সবুজ উপত্যকা খাপৌলি। ছোট সহরই। কলকারখানাও আছে, শক্তিবাবু আগে একালের মিশনারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সামনেই উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে বিশাল তিন-চারটা জলের পাইপ নেমেছে, পাহাড়ের উপরের বিশাল জলাধার থেকে পাইপে কারে ওই উদ্ধতা থেকে জল এসে নীচে হাইডেল পাওয়ার প্ল্যান্ট গড়েছে টাটা কোম্পানি।

সেই জলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। আর মেকারটার থেকে বের করে সেই জলধারা ক্যানেল করে এসে সারা উপত্যকায় চাষ করা হচ্ছে। ধান আনাজপত্র সবই হয়। চিরসবুজ রক উপত্যকা। পাহাড়ের গায়ে টাটা হাইডেল প্ল্যান্টের কর্মীদের কলোনি। একেবারে ছবির মত সাজানো ছোট হিল কলোনি।

এখান থেকেই পাহাড়ের পথ শুরু হল। ঘাট রোড, এই পাহাড় শ্রেণীর বুক চিরে রেলপথও গেছে। পুনা যেতে এই পাহাড়ের মধ্যে প্রচুর টানেল পড়ে।

রাস্তা ভালোই তবে একজায়গার পথ খুবই বিপজ্জনক। গাড়ি সেখানে গড়িয়ে নেমেই বাঁক নেয়। ঠিকমত বাঁক নিতেন পারলে সিধে তিন-চারশো ফিট নীচে চলে যাবে। তবে এখন সেই পথটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই বিপজ্জনক ঘাটকে এড়াবার জন্য।

খান্ডালা প্রায় আড়াই হাজার ফিট উপরে। সুন্দর সাজানো ছোট একটি হিল স্টেশন চারিদিকে পাহাড় কিছু সবুজ গাছপালা, পাহাড়ের গায়ে এদিক ওদিকে সাজানো বাংলো, হোটেল সবই আছে। এখাসের মানুষ সব কিছুই সাজিয়ে রাখে। এরা গড়তে জানে গড়তে চায়। আমাদের মত সাজানো জিনিসকে জবরদখল করে ভেঙে শেষ করে দিতে চায় না।

বাইরে দেখে মনে হয় বাঙালির স্বভাবই যেন সর্বনেশে। আমরা যত না গড়েছি ধ্বংস করেছি তার থেকে বেশি। আর এটার সূত্রপাত হয়েছে মানুষকে নিয়মনীতি না মেনে পাইয়ে দেবার প্ররোচনা থেকেই। অবহেলা ফাঁকি যেন একটা জাতির মজ্জায় ঢুকেছে। তাই কল্যানী ধ্বংসের পথেও ওরা ডজনখানেক কল্যাণী, দুর্গাপুর গড়ে চলেছে।

খান্ডালার হোটেল ময়ূর-এ তখন চিন্টুকাপুর, রাজকাপুর অন্যরা কোন ছবির শুটিং-এর জন্য রয়েছেন বোম্বাই-এর যত ছবিই হোক কাশ্মীরের পটভূমিকায় তার ঝড়তি পড়তি কাজ শেষ করা হয় খান্ডালার আশপাশের পাহাড়গুলোয় উপত্যকায় শুটিং করে। আমার আশা ভালোবাসার কিছু গান খান্ডালা পাহাড়েই ঠিক করা হয়েছিল বাকি করা হয়েছিল বোম্বের কাছে চায়না ক্রিকের আমবাগানে যেখানে রামায়ণের প্রচুর কথা হয়েছিল।

বোম্বের একদিকে সমুদ্র বাকি তিনদিকেই পাহাড়, সেখানে নদী শান্ত সবুজ উপত্যকা সবই আছে। বড় বড় আমবাগান সাজানো বাগানও আছে। বন-পাহাড়-নদী- সমুদ্র থাকার ফলে ওখানের আউটডোরের কাজের অসুবিধা হয় না। বোম্বেতে তাই ফিল্ম করার প্রসারও বেড়েছে।

গুজরাট সরকার তো প্রযোজকদের তাদের ছবির অর্জিত প্রমোদকরের পুরো টাকাটা পরের ছবি করার সময় এক লপ্তে ফেরত দেয়। তার পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা। তাই সেখানেও ছবি অনেক হয়।

মহারাষ্ট্র সরকার বিশাল বন পাহাড় নদী লেক ঘেরা কয়েকমাইল লম্বা কয়েক মাইল চওড়া এলাকা জুড়ে ফিল্মসিটি বানিয়েছে, সেখানে পাহাড়ী পথ, বন মন্দির, হেলিপ্যাড, গ্রাম্য বসতি সবই আছে। এছাড়া আধুনিক ফ্লোর। রেকর্ডিং স্টুডিও-গ্রীনরুম ডররন্টরিও আছে। সেটা সব সময় কর্মমুখর থাকে। পুরো মহাভারত

যুদ্ধক্ষেত্র সবই সেখানেই শুটিং করা হয়েছে। খান্ডালার পাহাড়ী পথও তৈরি করেছে তারা নাম দিয়েছে খান্ডালা ঘাট। আশা-ভালোবাসার হর্স রাইডিং, ফাইট সব সেখানেই হয়েছিল। আঞ্চলিক ভাষার ছবির জন্য ওরা রেটও কম রেখেছে।

মাদ্রাজেও যেমিনী বাহামীর স্টুডিও সুন্দরই। তবে হায়দ্রাবাদ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের মধ্যে রামাজী রাও একটি সুন্দর স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশাল স্টুডিও বানিয়েছেন। ঐতিহাসিক যুগের প্রাসাদ নগরী আধুনিক শহর পুরোনো কলকাতার পথ, রেলস্টেশন আদালত সবই করেছেন। এসবের নির্মাণের ভার দিয়েছিলেন তিনি বাঙালি শিল্পী নীতিশ রায়ের উপর। ভারতের মধ্যে এখন এইটাই সর্বাধুনিক বিশাল স্টুডিও।

ময়ূর হোটেলে দাদামণি শক্তিবাবুকে দেখে রাজকাপুর, চিন্টু এগিয়ে আসেন সেখানে কিছুক্ষণ থেকে কফি খেয়ে এবার চলেছি লোনাভালা হয়ে ওদের ফার্মের দিকে। হোটেলের আশপাশে উৎসাহী দর্শকের ভিড়, খান্ডালায় ট্যুরিস্টও প্রচুর যায়। তাদের কেউ কেউ ভেবেছে আমরা নিশ্চয়ই শুটিং ঘাটের দিকে চলেছি।

তাই তারাও আমাদের গাড়ির পিছু নেয়। দাদামণি বলেন আসতে দাও ওদের পিছনে, পরে মজা বুঝবে। খান্ডালা আর লোনাভালা দুটো দুই পাহাড়ের উপর। মাঝখানে মাইল খানেক পথ, গাছে গাছে সবুজ। পানভেল ছাড়িয়ে পথটা গেছে পুনার দিকে।

আবার রুক্ষ গাছপালাহীন তামাটে পাহাড় আর ঊষর, উপত্যকা। বাঁদিকে পাহাড়ের মধ্যে বিশাল জলাধার। ওই জলাধার থেকেই জল নীচে নিয়ে গিয়ে বিজলি তৈরি হচ্ছে।

পিছু ধাওয়াকারী উৎসাহী দর্শকরা হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এবার পানভেলে নিশ্চিন্তে কোল্ডড্রিংকস্ খাওয়া গেল। শক্তিবাবু পানও তুলে নিলেন। এর পর ধু ধু পাহাড় ঘেরা উপত্যকা। ওসব মিলবে না।

পানভেলও ছোট্ট শহর. নানা কোম্পানির হলিডে হোম, লজ এসবও আছে। ওদিকে বোম্বাই পুনা লাইনের রেল স্টেশন, পাহাড়ী পথ, এখানে দেখলাম ট্রেন নামার মুখে ব্রেক ফেল করলে লাইন থেকে একটা লাইন পাহাড়ের উবুর দিকে রাখা আছে। সেই লাইনে ট্রেনকে চালালে এত চড়াই ঠেলতে না পেরে ট্রেন থেমে যাবে।

পানভেলে একটা জিনিস দেখলাম খুব তৈরি হয়। ওরা বলে 'চিকি' সুন্দর প্যাকেটে রকমারী সাইজে বিক্রি হয় খুবই। সেটা আর কিছুই নয়। এখানের বাদামতক্তি। বাদাম ভেজে গুড়ে পান করে চৌকা চৌকা পিস্ এখানে প্রচুর তৈরি হয়। বাইরেও যায়।

পানভল ছাড়িয়ে চলেছি। বা দিকের পাহাড়ের অনেক উপরে বৌদ্ধ যুগের বিখ্যাত কার্লাকেভ অজন্তা ইলোরার মতই বৌদ্ধযুগের তৈরি গুহা মন্দির। নীচে

থেকে প্রায় সাত আটশো ফিট উপরে পাহাড়ের গায়ে ওই মহা মন্দির এখন পুরাতত্ত্ব বিভাগের হেপাজতে যাত্রীরাও যায় পাহাড় ঠেলে। আশ্চর্যের কথা ওই ঝুলন্ত পাহাড়ের গায়ে জলের সঞ্চয় আছে এখনও।

বোম্বাই-এর কাছে রয়েছে বৌদ্ধদের যুগের আর একটি ওড়া মন্দির বোড়িভিসির কাছে। ক্যানারি কেভ। এছাড়া বোম্বাই শহরের আন্ধেরীর ওদিকে রয়েছে মহাকালী কেভস্। তবে সেটা এখন ধ্বংসের মুখে।

ডান পাশে অশোক কুমার ফার্ম, হাউওয়ে থেকে একটু ভিতরে যেতে হয়। দাদামণিই এখন গাড়ি, চালাচ্ছেন, আমি পাশে, দুদিকে মকাই-এর ক্ষেত। এসব লাগে মুরগির খাবারে।

অশোক কুমারকে দেখে ওদিকে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। দাদামণিও সজোরে ব্রেক করে গাড়ি থামান। মাথাটা ঠোকা খেতে খেতে বেঁচে গেল। হঠাৎ গাড়ি থামানোর কারণ জানিয়ে দাদামণি বলেন—রাস্তার সামনে কোন ভাইসা, বাচ্চা আর সরদারকে দেখাল সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাবে। ওরা কোনদিকে যাবে তার ঠিকানা ওরাই জানে না।

সর্দারজীও হাসছে উনিই অশোক কুমারের ফার্মের ম্যানেজ্যার। বিশাল ফিড মিস ওদিকে মুরগীর খামার, বাংলো, পিছনের বিস্তীর্ণ জমিতে গোলাপের চাষ। ফুলে ফুলে বিস্তীর্ণ ক্ষেত ভরে আছে। নানা রঙের নানা জাতের গোলাব। এখান থেকে গোলাপ ফুল যায় বোম্বাই-এর বাজারে।

ওকে ছেড়ে দিয়ে এবার আমরা এলাম শক্তিবাবুর হিল ভিউ ফার্মে রুক্ষ প্রান্তর, চারিদিকে পাহাড় ওদিকে একটা সুন্দর বাংলো সামনের ক্ষেতে কিছু টমাটো ঢেড়স আনাজপত্র দুচারটে কৃষ্ণচূড়ার গাছ ওই রুক্ষ কাকুরে জমিতে কোনমতে বেঁচে আছে।

ওদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সার বন্দী টিনের ছাউনি দেওয়া হলঘর পর্দা ফেলা—তা গোটা দশেক হবে। ওগুলোতেই এক এক সপ্তাহের বয়সের হিসাবের মুর্গি থাকে। এক একটা হলে প্রায় আড়াই হাজার করে মুরগি থাকে।

সাত সপ্তাহের হলেই সেই হলের সব মুরগি কাটাই হয়ে মাংসগুলো এয়ার কনডিশনড গাড়িতে করে বোম্বাই-এর বিভিন্ন হোটেলে চলে আসে। তার জন্য অন্য কোম্পানি সব মাল ডেলিভারি দেয়। আর একটা হলে একসপ্তাহ বয়সের ছোট বাচ্চা ঠিক ঢোকানো হয়। পরের সপ্তাহে একটা হলের মুরগির বয়স সাত সপ্তাহ হল সেগুলো কাটাই হয়ে গেল। অন্য হলে একসপ্তাহ বয়সের বাচ্চা এল। এই ভাবে চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়ে কাটাই পর্ব চলে।

বিস্তীর্ণ এলাকা পাহারা দেবার জন্য লোকজন আর বেশ কিছু দিশীয় দো আঁসলা কুকুর বাহিনীও রয়েছে। ফার্মের কাটাই মাংসের বাতিল বস্তুগুলো গম, চাল দিয়ে

ফুটিয়ে ওদের খেতে দেয়, ওরাও বিনামাইনেতে পেট ভাতায় দিনরাত পাহারাদাদের কাজ করে।

এই রুক্ষ প্রান্তরে জলের খুবই অভাব। একটা নদীর খাত আছে ফার্মের গায়েই, নদীর নামও রয়েছে ইন্দ্রাণী। বর্ষাকালে এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তখন এই মরাখাতে বান ডাকে। কিন্তু মাটির নীচে জমাট পাথরের স্তর থাকায় জল থাকে না।

বিশাল এলাকার মাটি তুলে গ্রানাইট পাথর ফাটিয়ে বারো পনেরো ফিট গভীর ছোট পুকুরের মতো করা আছে। তাতেই বর্ষার জল ধরে রেখে কয়েকমাস কাজ চলে। তারপর পাশের কোন বড় কুয়ো থেকে কয়েক মিলোমিটার পথ গাড়িতে জল আনতে হয়।

জমাট পাথরের নীচে নদীর প্রবাহের মত জলের প্রবাহ কোথাও থাকে। কোন ভাগ্যবান সেই জলের স্তরকে বের করতে পারলে জল পাবেন—না হলে জলও মিলবে না। বাংলার মানুষ জলের জন্য হাহাকার দেখিনি। এখানে সত্যিই জলের অপর নাম জীবন।

দুপুরে বাহাদুর ফার্মের ম্যানেজার ছিলেন অনীতা গুহের ভাই, তার মা ওখানে রয়েছেন তিনিই করলেন। ফোন করা হল দাদামণির ফার্মে। দাদামণিও এখানেই লাঞ্চ করবেন।

দাদামণির ফার্ম এখান থেকে দেখা যায়। ওপাশে দাদামণির ফার্ম পাশে অভিনেতা নাসির হুসেনের ফার্ম।

বাংলায় রয়েছি হঠাৎ কুকুর বাহিনীর সমবেত চিৎকারে চাইলাম। গাড়ি থেকে নেমেছেন অশোক কুমার পরনে লুঙ্গি গায়ে একটা চাদর হাতে ফর্সা ন্যাকড়ায় বাঁধা মাঝারি কয়েকটা পুটুলি আর নামতেই অচেনা মানুষকে দেখে কোথায় ছিল ওই কুকুর বাহিনী তারা এসে অশোক কুমারকে ঘিরে ফেলেছে। সেই সঙ্গে শুরু করেছে পাতলা মোটা ভরাটি গলার কোরাস। অশোক কুমার গাড়িতেও উঠতে পারেন না পথ বন্ধ, তিনিই হাঁকডাক করেন আরে শক্তি দেখ, দেখ, তেরা কুত্তা কাটেগা না তো।

শক্তিবাবুর পিছনে আমিও একটা কাঠের ফালি অস্ত্র হিসাবে সংগ্রহ করে বের হয়ে দাদামণিকে কুকুর বাহিনী থেকে উদ্ধার করে আনি।

বলি—দাদামণি এরা বোধহয় সিনেমা দেখে না। দাদামণি বলেন যারা দেখে তারাও এদের থেকে কম কিছু নয়।

শক্তিবাবু দিনভর ফার্মের কাজ, হিসাবপত্র দেখেন, যা কিছু করেন সব কাজই করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তাই সামান্য অবস্থা থেকেই আজ এই জায়গাতে এসেছেন।

সন্ধ্যা নামছে উপত্যকায়, মারাঠাদের দেশ, ওদিকে পাহাড় চূড়ায় দেখা যায় কোন মারাঠা আমলের এক কেল্লার ধ্বংসাবশেষ, এককালে সৈনিক অশ্বারোহীদের ভিড়ে লোকজনের আনাগোনায় ওই পাহাড়শীর্ষ মুখর থাকত। আজ পরিত্যক্ত

ধ্বংসস্তূপ। কেউই যায় না ওই রুক্ষ পাহাড়ের চূড়ায়। দূরে অন্ধকারে কার্লা কেভের দীপ শিখা জ্বলছে। কোন শ্রমণ এখনও রয়েছে সেই দীপশিখা জ্বালতে।

আমরা বলেছি চিত্রনাট্য নিয়ে। শান্ত পরিবেশ ফোনও বাজেনা অহরহ মন দিয়ে কাজ করা যায়। বাংলা চিত্রনাট্য চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আজ ছাড়পত্র মিলল শক্তিবাবুর। এবার হিন্দি লেখককে নিয়ে বসতে হবে। কমলেশ্বরই এই কাজ করবেন 'অমানুষ'-এর হিন্দি উনিই করেছিলেন বাংলায় ওকে বেশ তালিম দিয়ে নিয়েছি। তাই ওকেই দরকার। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে কলকাতা ফিরতে হবে।

এর আগে আমরা 'অনুসন্ধান'-এর চিত্রনাট্য চূড়ান্ত করার জন্য খান্ডালার আলতাজ হোটেলে কয়েকদিন ছিলাম। 'মেহেবুবা' রিলিজ করার পর শক্তিবাবু তখন অমিতাভকে নিয়ে 'গ্রেট গ্যাম্বলার' ছবি করার কাজ শুরু করেছেন। এটা অন্য প্রযোজকের ছবি।

'গ্রেট গ্ল্যাম্বলার'-এর মূল কাহিনীও বাংলা থেকে দেওয়া। 'বিক্রমাদিত্য' ছদ্মনামে লিখতেন তিনি তারই কাহিনী। ওরই চিত্রনাট্য লিখছেন রঞ্জন সেন, ইনি কালনার ছেলে বিখ্যাত পরিচালক দেবকী বসুর সম্পর্কে ভাই। শক্তিবাবুও আমাকে নিয়ে গেছেন ওর সঙ্গে।

পাহাড়ের কোলে গাছগাছালি ঘেরা সুন্দর হোটেল। কটেজগুলো এদিক ওদিকে ছড়ানো সবুজের রাজ্য সামনেই পাহাড়টা খাদ হয়ে নেমে গেছে, নীচে একটা ছোট ঝোরা। তখন আমের মুকুল এসেছে। বাগান আমের বোলের সুবাসে ভরপুর।

লেখার উপযুক্ত জায়গা।

সকালে শক্তিবাবু বসেন রঞ্জনবাবু ব্রজেন্দ্র গৌড়দের সঙ্গে 'গ্রেট গ্যাম্বলার'-এর চিত্রনাট্য নিয়ে ওদের কটেজে, তখন আমি আমার কাজ করি আর সন্ধ্যায় বসেন অনুসন্ধান নিয়ে।

তারপর জমাটি আড্ডা বসে হোটেলের লনে। পাহাড়ী জায়গা, তাই দারুণ গ্রীষ্মেও আবহাওয়া মনোরম। ওই পাহাড়ী নদীর ওপারের পাহাড়ে থাকেন বিখ্যাত লেখক ডঃ মুকুল রাজ আনন্দ। তিনি পাঞ্জাবের মানুষ, তবে ইংরেজিতেই তার উপন্যাস প্রকাশিত হয় বাইরে থেকে। তাঁর 'টু লিভস এন্ড এ বাড' অর্থাৎ 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' একটি বিখ্যাত উপন্যাস চা বাগানের পটভূমিকায় বিধৃত।

ওর ওখানেই যাই একদিন। হোটেল থেকে দেখা গেলেও সোজাসুজি যাবার পথ নেই। মাঝে ওই খাদ। পথটা একটু ঘুরে গেছে। শক্তিবাবুই বলেন বের হলে গাড়ি নিয়ে যাবেন। গাড়ি তো পড়েই আছে।

ডঃ আনন্দের সঙ্গে পরিচয় ছিল পত্রযোগে। বোম্বেতেও ওর নাম শুনেছি। ওখানকার হিন্দি মারাঠি সাহিত্যিকদের কেউ কেউ ওর উপর খুব প্রীত বলে মনে হল না। তারা বলেন, সাহিত্যিকদের জন্য মহারাষ্ট্র সরকার ওখানে কিছু জায়গা

দিয়েছিলেন। সেটা একটা টাস্টের নামে এখন ডঃ আনন্দই নাকি তাঁর সব। এ বিষয়ে সঠিক কিছু জানতে পারিনি, চাইওনি। লোকটির লেখা ভালো লাগে। তাই গেলাম।

অনেকটা এলাকা জুড়ে ওর বাংলো, বাগান। ওদিকে স্থানীয় ছেলেদের জন্য একটা স্কুলও করেছেন। আমার পরিচয় জেনে খুশি হলেন। আর ও খুশি হলেন সেন যে চা বাগানের উপর আমিও লিখছি। মেঘে ঢাকা তারা তিনি দেখেছেন। উদ্বাস্তু সমস্যা আজকের চা-বাগানের অবস্থা এসব নিয়েও আলোচনা হল। বয়স হয়েছে তবু ওই পরিবেশে প্রকৃতির মধ্যে রয়েছেন ছেলেদের পড়াচ্ছেন। বেশ আনন্দেই আছেন দেখে মনে হল যেন তপোবনের এক ঋষিই। আজকের সমাজ বর্তমানের সমস্যাগুলোকে মেনে নিয়েই নতুন করে জীবনদর্শন গড়েছেন।

বোম্বাই-এ ফিরে এবার কমলেশ্বরজীকে নিয়ে বসেছি। দুজনের তালমেল ভালোই। সিনগুলো পড়ে যাই, ওকে বুঝিয়ে দিই উনিও হিন্দিতে সেগুলো লিখে নেন। সিনের পর সিন এইভাবে কিছুটা লিখে নিয়ে উনি আবার বাড়িতে সেগুলো ফ্রেস করে হিন্দির মেজাজ দিয়ে লেখেন। উনিই ওই কালীরামের মুখে কসম ভৈরো কি টা লাগালেন আমি সেটা কি বাংলায় মা কালীর দিব্যি করে বললাম।

শক্তিবাবুও আসেন হোটেলে। কোনোদিন কমলেশ্বরজী আগে এসে গেছেন শক্তিবাবু আসেননি। কমলেশ্বর ফোন করতেন স্যার, বিদ্যার্থী লোগ্ হাজির আপ্ চলা আইয়ে। তিনশ হিন্দির ডায়ালগ, চরিত্রগুলো দেখে নেন শক্তিবাবু।

উৎপলবাবু তখন বোম্বের ছবিতে কাজ শুরু করেছেন উত্তমবাবুরও চাহিদা খুব। কিন্তু উত্তমবাবু বোম্বের চিত্রজগতের চেয়ে বাংলার চিত্রজগতেই বেশি ভালোবাসতেন তাই সেদিনের এত চাহিদা সত্ত্বেও বহু হিন্দি ছবি তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। টাকার লোভে বাংলা দেশ ছেড়ে হিন্দির জগতে তিনি সাড়া দেন নি। বেছে বেছে দু-এক জনের কিছু ছবিতে কাজ করেছিলেন তাও পরের দিকে।

সেই দিন উৎপলবাবুর গৃহপ্রবেশ। সন্ধ্যায় ওখানে নিমন্ত্রণ তারপর হোটেল সান এন্ড স্যান্ডস্ এ শত্রুঘ্নজির পার্টি। শক্তিবাবু বলেন—বোম্বাই-এ ছবি লিখবেন আর পার্টিতে যাবেন না? চলুন।

জুহুতে সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে একটা হাউসিং সোসাইটিতে উৎপলবাবু নতুন ফ্ল্যাট কিনেছেন। সেদিন তার আনুষ্ঠানিক গৃহপ্রবেশ শোভা সেনও এসেছেন। বড় দুই কামরা ডাইনিং কিচেন টয়লেট নিয়ে বেশ ভালো ফ্লাটই। তখন ছিয়াত্তর সালের কথা। শুনলাম দাম দুলাখের মধ্যেই।

তখনও বোম্বের ফ্ল্যাটের দাম আকাশছোঁয়া হয়নি। আমরা ক'জন চেনামুখই সেদিন সন্ধ্যায় নতুন ফ্ল্যাটে আড্ডা জমানো গেল। ওদের প্রতিবেশী একটি দম্পতিও এল। মেয়েটি কলকাতার যাদবপুরের, ওখানে এক তরুণ মারাঠি ইনজিনিয়ারকে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে। সুখী পরিবার। মারাঠি গুজরাটিদের সঙ্গে বাঙালিদের একটা

সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক মিল আছে কোথাও, তবে গুজরাটীদের রক্তে ব্যবসা। ওই কাজটা করা বাঙালিদের চেয়েও বেশি বোঝে। মারাঠীরা সাধারণত বাঙালিদের মতো চাকরি প্রিয় আদর্শবাদীও।

উৎপলবাবুদের ওখান থেকে এবার সমুদ্রতীরে সান এন্ড স্যান্ডস হোটেলের পার্টিতে যেতে হবে। রাত্রি প্রায় দশটা। আমাদের কাছে অনেক রাত, বোম্বাই-এর ফিল্ম জগতের এটা সন্ধ্যা। ওরা রাত একটা অবধি সামাজিকতা—আড্ডা—ব্যবসার কথা বলে বাড়ি ফেরেন আবার সকালে উঠেই চালু হয়ে যান। ফাস্ট লাইফে অভ্যস্ত—আমরা তা নই। আমি এত রাতে আবার ওই পার্টিতে যেতে চাই না।

গিরিজাবাবুই অভয় দেন। দাদা থাকেন থাকবেন, আপনাকে এগারোটার মধ্যেই হোটেলে ছেড়ে দেবে।

গিরিজাবাবু এর আগেও দুর্বৃত্তদের টার্গেট থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন 'অমানুষ'-এর পার্ক হোটেলের পার্টির রাতে। ওকে বিশ্বাস করা যায়। তাই সঙ্গী হলাম।

জুহুর সমুদ্রতীরে ওই জায়গাগুলোকে আগে দেখেছি অজস্র নারকেল গাছের বাগান। কোনো বসতির নাম গন্ধ ছিল না। ওদিকে জুহু এয়ার স্ট্রিপে দু-একটা ছোট প্লেন দাঁড়িয়ে থাকত, ট্রেনিং গ্রাউন্ড।

এখন জুহু এয়ার স্ট্রিপ থেকে বোম্বে হাই-এর তেলকূপগুলোয় হামেশাই হেলি কপ্টার যাতায়াত করে কর্মীদের নিয়ে। ছোট ট্রেনিং প্লেনও ওঠা-নামা করে জুহু এয়ার স্ট্রীপে।

আর নারকেল বাগান সাফ করে বিশাল বিশাল হোটেল প্রসাদ উঠেছে। তখনও সান এন্ড স্যান্ডসই ওই নারকেলবাগানের শোভা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হোটেলের সবুজ লনে পার্টি চলেছে। বোম্বে ফিল্ম জগতে কেউ না কেউ প্রায়ই পার্টি দেয়। লোকে বলে কাজ পাবার বাহানা এসব। ওসব পার্টিতে সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়। পানভোজনের আয়োজন থাকে। অনেকেই আসেন দেখাসাক্ষাৎ হয়, কাজের কথাও হয়।

বোম্বে ফিল্মের অনেককেই দেখলাম। নায়ক-নায়িকা পার্শ্ব চরিত্রের শিল্পীরাও এসেছে। নাচগানও চলেছে হৈ চৈ করে। এখানে নাচার জন্যই যেন কিছু ছেলেমেয়ে মজুত থাকে। তাদের অন্য পার্টিতেও নাচতে দেখেছি।

লনের ওদিকে কাঠের আগুন জ্বেলে মাংস ঝলসানো হচ্ছে। ওটা পার্টির আদিম আরণ্যক পরিবেশ গড়ে তোলে। পানভোজনও চলছে। আর বেশ কিছু মানুষও এর মধ্যে ফিট হয়ে গেছে। সামনেই সুইমিং পুল, জলে শব্দ হতে দেখি-কোট প্যান্ট টাই জুতো সমেত গোলগাল চেহারার একজন সশব্দে জলে পড়েছে।

গিরিজাবাবু বলেন। এবার আরও পড়বে। চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।

আনন্দ-আশ্রমও সুপার হিট। এর পর শুরু হবে অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের কাজ

শেষ হতে এবার শিল্পী নির্বাচনের পালা। ফিল্ম গল্পের পরই আসেন শিল্পীরা। সঠিক গল্প আর চরিত্র অনুযায়ী শিল্পী নির্বাচন না করতে পারলে গল্প চরিত্র সবই মার খায়, সঠিক ভাবে রূপায়িত না হওয়ার জন্য।

আমাকে বলেন শক্তিবাবু আমার পছন্দমতো শিল্পীদের নাম লিখতে। নায়িকার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুরের নাম দেখে শক্তিবাবু বলেন—নায়িকা এখানে অন্ধ। কিন্তু শর্মিলার চোখের চাহনিতে অন্য ভাষা বলে এখানে চাই অসহায় চোখ, মুখ, শান্ত চাহনি।

পরে ওই ভূমিকায় এনেছিলেন রাখীকে। আর বাংলা ছবিতে প্রথম আনলেন অমিতাভ আমজাদ খাঁনকে। অমিতাভকে গল্পটা শোনাতে হবে। তখন অমিতাভ-রাখী দুজনেই 'কালাপাথর' ছবির আউটডোরে রয়েছেন, লম্বা আউটডোর। শক্তিবাবু বলেন, ও বলেছে ওদের আউটডোরে যেতে সেখান থেকে ওকে পুনায় এনে ওর হোটেলে বসে গল্প শোনাতে হবে। আপনিও চলুন।

পরদিন সন্ধ্যাতেই বের হলাম আমরা বোম্বাই থেকে রাতে ফার্মের বাংলোয় থেকে পরদিন যাব ওদের আউটডোরে।

শক্তিবাবু বলেন, রাতে ফার্মের মাঝে মাঝে হঠাৎ যাওয়া দরকার। দিনে যাই, রাতে হঠাৎ গেলে ওদের কাজকর্ম কেমন চলছে বোঝা যাবে। অর্থাৎ ইচ্ছা করেই নাইট ইন্‌সপেকশন করতে চলেছেন। লোনাভালা পার হয়ে একটা ধাবায় রাতের ডিনার সারা হল।

সাউথ ট্রাঙ্ক রোড, খুবই কর্মব্যস্ত পথ। ধাবাগুলোও আমাদের হাইওয়ের ধারের ধারার মতো ছারপোকা ভর্তি খাটিয়া বিছানো নয়, পিছনে ওয়েটিং রুম। বিছানা পাত কট্।

সামনে ছিমছাম ঝকঝকে ডাইনিং হল। সানমাইকার টেবিল চেয়ার। অনেক গাড়ির ভিড়, বেশির ভাগ কেরালিয়ান এসব ধাবা চালায়, তাই পাঞ্জাবী স্ট্রাইল এখানে নেই। বিরিয়ানী করে, রুটিও মেলে। তবে ওই ধাবার বিরিয়ানীও অপূর্ব। চারিদিকে মুরগির ফার্ম, তাই মুরগির চলই বেশি, বাহাদুর বলে।

—ইলোক মুরগি সস্তামে মোলতা।

—কেন?

বাহাদুর বলে এতনা সারা ফার্ম, মুরগি চোরাকে বিকতা হ্যায়! ফার্ম থেকে দুদ্দশটা মুরগি কেউ সাফ করে না তা কি হয়, শক্তিবাবু বলেন—কে জানে আমার মুর্গিই খাচ্ছি কিনা।

রাতে মালিককে হঠাৎ ফার্মে আসতে কর্মীরা একটু অবাকই হয়। সেই কুকুর বাহিনী সজাগ রয়েছে, তারাও ছুটে আসে মালিকের সঙ্গে মোলাকাত করতে।

'কালাপাথরের' আউটডোর করেছেন যশ চোপড়া রাজকাপুরের লোনার ফার্মে।

পুনা থেকে কোলাপুর যাবার রাস্তায় চল্লিশ কিলোমিটার গিয়ে বাঁদিকে কিছুটা গেলেই মুলী নদীর ধারে রাজকাপুরের ফার্ম।

সকালেই বের হয়েছি পুনার দিকে, কিছুটা প্রান্তর পার হয়ে ভাড়নাঁও। একটা ছোট গ্রাম। এখানে সেই শুকনো ইন্দ্রাণী নদীতে জল রয়েছে। জলস্তর নীচেই। তাই এই বসতি নেহাৎ গ্রামই। তবে একটা সুন্দর বিশাল কারখানা দেখা যায়। এটা ঈগল ফ্ল্যাঙ্ক কোম্পানির কারখানা। অনেক লোক কাজ করে।

বোম্বেতে মাটির তলে মিঠে জল তোলার ব্যবস্থা নেই। জমাট পাথর। তাই এখানে জল আসে দূর-দূরান্তের। কাছের পাহাড় ঘেরা বড় বড় জলাশয় থেকে। প্রচুর বৃষ্টি হয়। ওইসব লেকে নদীর জল ধরে রাখা হয়, বোম্বের কাছে পাওয়াই, পত্তন এমনি কিছু লেক আছে, দূরেও কিছু লেক থেকে জল আনা হয় বিশাল পাইপে করে। পুনা রোডের ধারে তেমনি একটা লেক পড়ে। প্রায় একশো কিলোমিটার দূর থেকেও জল যাচ্ছে বোম্বাই-এ।

বৃষ্টি ঠিকমতো না হলে বোম্বে শহরে জলের জন্য হাহাকার পড়ে যায়। লোক জলের সঞ্চয় কমলেই সমস্যা।

পুনা মহারাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান শহর। বোম্বাই সর্বভারতীয় শহর। মারাঠাদের বেশি আধিপত্য এই পুনাতেই। শিবাজীর স্মৃতি বিজড়িত শহর। পুরোনো অঞ্চল গিঞ্জিই। নতুন পুনা সাজানো শহর। সাহিত্যিক শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ জীবনে এই পুনাতেই থাকতেন।

সুন্দর বিশাল কারখানা। কার্লেস্কার, টাটা, গারওয়ারের নানা বড় বড় ফার্ম। নতুন পুনায় তখন রজনীশ মহারাজ বিশাল আন্তর্জাতিক আশ্রম বানিয়ে এলাকা সরগরম করে রেখেছেন। পথেঘাটে-হোটেলে বিদেশীদের ঢল।

পুনা ছাড়িয়ে কোলাপুরের দিকে চলেছি। মহারাষ্ট্রের নাগপুরের দিকে আঙ্গুরের ক্ষেত সর্বত্র, এদিকে দিগন্ত জুড়ে আখের বন, মাঝে মাঝে সেচের ক্যানেল বয়ে গেছে। জলসেচ হয়। শুধু আখের বন। আমাদের আখ খেতের মতো মেড়া বাধা নয়, এত আখকে মেড়া বাঁধবে। বনের মতো মাথা তুলেছে। চিনির কলও অনেক। তাই এসব আখেরই রাজ্য।

হাইওয়ে ছেড়ে এবার চলেছি রাজকাপুরের ফার্মের দিকে। নব মুলী নদী এখানে জলে পরিপূর্ণ। রাজকাপুরের চাষের ফার্ম। বিশাল এলাকা জুড়ে ফার্ম, সামনে কালো জল ভরা নদী, আঙ্গুর, আখও হয়।

ওর ফার্ম বেশ সাজানো। সুন্দর বাংলো—ওদিকে প্রজেকশন থিয়েটার, এডিটিং রুম। অনেকগুলো সাজানো বাড়ি, রাজকাপুরের অনেক ছবির শুটিং হয়েছে এখানে নদীর ধারে। তাই এসব চেনা বলেই মনে হল।

রাজকাপুরজি বোম্বেতে ছবির শুটিং করে রাসপ্রিন্ট নিয়ে এখানে চলে

আসেন। এই শান্ত সবুজ পরিবেশে তিনি এডিট করেন প্রজেকশন দেখে ছবি তৈরি করেন।

এই বাংলোর এলাকার ওদিকে নদীর ধারে বিস্তীর্ণ মাঠে 'কালাপাথরের' সেট তৈরি করা হয়েছে অন্তত দশ বিঘে জায়গা জুড়ে। একটা কোলিয়ারিই গড়ে তুলেছেন ওরা। লোহার পিটহেডগিয়ার যা দিয়ে খাদে নামে তেমনি পিট করা হয়েছে, উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে কয়লা ভর্তি টব এনে ফেলা হচ্ছে। রাশিকৃত কয়লা ওয়াগন ভর্তি করে এনে ঢাঁই করা হয়েছে যেন পিট থেকে সদ্য তোলা হয়েছে।

ওদিকে কুলি কলোনি হাট-দোকান পত্র, কুলিদের ধাওড়া, এদিকে ডিসপেনসারি এক নজর দেখলেই কোলিয়ারির আভাষ ফুটে ওঠে। এ ছবির শিল্প নির্দেশক একজন বাঙালি। সুপরিচিত আর্ট ডিরেক্টার সুধেন্দু রায়।

তিনি আমাকে বলেন, আপনি তো কোলিয়ারি মুলুকের মানুষ, আপনার কি মনে হচ্ছে সেটটা দেখে?

জানাই সব ঠিক ঠাকই আছে। তবে ওই বাড়ির চাল কার্নিশগুলোয় কিছুটা এদেশের ঢং এসেছে। নাহলে একেবারে নিখুঁত মিনি কোলিয়ারিই।

ওই বিশাল সেট তৈরি করতে কত লাখ টাকা খরচ পড়েছে কে জানে? সারা এলাকার লাল মাটিকে কয়লার গুঁড়ো ঢেলে কালো করতেও কম কয়লা যায়নি।

ওদিকে একটা ডিসপেনসারিতে অমিতাভ, রাখীর শুটিং চলছে। রাখী আমাদের দেখে বলে নদীতে সুন্দর তাজা রুইমাছ আজ অনেক ধরা পড়েছে। লাঞ্চ না করে যাবেন না দাদা।

নদীটা এখানে সুন্দর, দুদিকে ঘনসবুজ ক্ষেত। এখানে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্', রাজকাপুরের কেন আরও অনেক ছবির শুটিং হয়। এরাও এসেছেন এখানে টানা শুটিং করতে ওই বিরাট কোলিয়ারী কলোনীর সেট বানিয়ে।

বেশ ঝকঝকে রোদ—কাজ চলছে ওদের। অমিতাভ বচ্চনও এবেলার কাজের পর লাঞ্চ করে আমাদের সঙ্গে ফিরবেন পুনার হোটেলে, সেখানে বসেই গল্প শোনানো হবে তাঁকে।

দুপুরে লাঞ্চের ব্যাপার ওই সুন্দর বাংলোর ডাইনিং হলে। বাইরে মাচানে তোলা আঙ্গুর লতার ঘন সবুজ বেষ্টনী, কিছু ফুলের বাহার। হলে তখন রাজকাপুর, ঋষি কাপুর, চিন্টু কাপুর, কাপুর পরিবারের অনেকেই আর এদের ইউনিটের অমিতাভ, রাখী—আরও অনেকে করেছেন।

আরও কোন ইউনিটের শিল্পী কলাকুশলীরাও এসেছেন। বেশ জমজমাট ভোজসভা। কোথা থেকে এসে হাজির হল শাবানা আজমীও। ওকে দেখেছি এর মধ্যে অনেক পার্টিতে। অভিনয় ক্ষমতা ওর আছে। কিন্তু মনে হয় বড় বেশি নিজেকে দেখাবার নির্লজ্জ প্রয়াসই উনি করে থাকেন। এই প্রচারের কাঙ্গালপনা আমার চোখে

পড়েছে। অথচ ওর এসব করার দরকার নেই, নিজের প্রতিভার জোরেই উনি নাম করেছেন। তবু এই এগজিবিনিশ ওর বোধ হয় স্বভাব বলেই মনে হল। এত জনের মধ্যে উনি নিজেকে বড় বেশি জাহির করতে ব্যস্ত।

লাঞ্চের আইটেম অনেক। রাখী বলে, মাছ কেমন লাগল? ওটা আমি নিজে রান্না করেছি। রাখীর এই অভ্যাস আছে। যে কোন ইউনিটেই শুটিং করতে যাক নিজের পয়সায় বিশেষ কোনো আইটেম করে সকলকে খাওয়াবে। নিজেই হাতা খুন্তিও ধরে ফেলবে।

লাঞ্চের পর আকাশের আলো যেন ম্লান হয়ে আসছে। একটু মেঘলা দেখায় আকাশ। আমি, শক্তিবাবু অমিতাভজি বের হলাম পুনার দিকে।

শক্তিবাবু নিয়ে যাচ্ছেন ওর ডাসুন গাড়িটা। ওটা ছেড়ে একসঙ্গে বেশ শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে ফেরার জন্য অমিতাভজির বড় ভক্স ওয়াগেন ভ্যানে উঠলাম। বোম্বের অনেক শিল্পীরাই এমনি আরামদায়ক ভ্যানে শোবার জন্য লম্বা সোফা, ওদিকে বেসিন, টয়লেট রাখেন। এতেই মেকআপ করেন, বিশ্রামও নেন। গাড়িটা এয়ারকনডিশনড। মিঠুন আরও নামী শিল্পীকে এমনি ভ্যান ব্যবহার করতে দেখেছি।

কোলাপুর পুনা হাইরোডে উঠতেই দেখি সেই একটুকরো কালো মেঘ সারা আকাশ ঢেকে দিয়েছে। সূর্যের চিহ্নও নাই। দিনের বেলায় অন্ধকার, তখন বেলা তিনটে সেই অন্ধকারে হেডলাইট জ্বালতে হল। বাতাসের দাপাদাপি সুরু হয়েছে।

তারপরই সেই হাওয়ার রূপ বদলে গেল। দুদিকে দিগন্তপ্রসারী আখের বন, মাঝখান দিয়ে উঁচু রাস্তাটা চলে গেছে। রাস্তা থেকে দেখা যায় আখের বনকে ঝুটি ধরে নাড়া দিচ্ছে তীব্র ঝড়ের মত্ততা। ঝড়ের দাপটে উঁচু রাস্তা থেকে ভ্যানটা যেন ছিটকে পড়বে। ঝড়ের সাপটে কাঁপছে গাড়িটা। ভিতরে আমরা তিনজন যেন ছিটকে পড়ব। সেই সঙ্গে নেমেছে অঝোর বৃষ্টি, সব ঢেকে গেছে। হেডলাইটের আলোও এগোতে পারে না। সেই সঙ্গে ঝড়ের মতো গর্জন।

বড় গাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়, ফাঁকা রাস্তায় ঝড় এসে ঝাপটে পড়ছে। আগে আগে চলেছে সেই ডাসুন গাড়িটা। ওটা অনেক নীচু, চাকাও মাটি কামড়ে চলে। ওই গাড়িতে যাওয়াই নিরাপদ।

এ গাড়ির ড্রাইভার ওরই মধ্যে কোনোরকমে ডাসুন গাড়িটাকে ওভারটেক করে সামনে দাঁড়াতে শক্তিবাবুর ড্রাইভার বাহাদুরও গাড়ি থামিয়েছে। ভ্যানটা এতক্ষণ সরল থাকায় তবু হাওয়াটা এত জোরে ধাক্কা মারতে পারেনি। এবার দাঁড়াতে মনে হয় নীচে আখের বনে ছিটকে ফেলে দেবে। আমরা তিনজন কোনোমতে ওই বৃষ্টির মধ্যেই নেমেছি গাড়ি থেকে এবার ওই ছোট গাড়িতে উঠতে হবে।

কিন্তু ঝড়ের এত বেগ জীবনে দেখিনি, যেন আমাদেরই ছিটকে ফেলে দেবে। লম্বা অমিতাভজিকেই ঝড়ের দাপট লাগে বেশি। তিনজনে হাতধরাধরি করে গুঁড়ি মেরে ভিজে ঢোল হয়ে কোনোমতে শক্তিবাবুর গাড়িতে উঠলাম।

ঝড়ের তাণ্ডব কিছুটা কমেছে। রাস্তায় তেমন গাড়িও নেই। ঝড় ক্রমশ কমে, বৃষ্টিও চলছে তবে কম। পুনার দিকে আসছি। এবার দেখি এদিকে রাস্তার ধারে গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে। ছত্রাকার অবস্থা ঘরের টিন উড়েছে। কোনোমতে পুনায় অমিতাভজির ডেরা। হোটেল ব্লু ডায়মন্ডে পৌঁছে এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

খেয়াল হয় অমিতাভজির আমরা তো বেঁচে ফিরেছি। লোবীতে ইউনিটের কি হাল হয়েছে কে জানে। ফোনের চেষ্টা করা হল। লাইন সব ছিঁড়ে তছনছ হয়ে গেছে। কোন যোগাযোগই করা গেল না।

সেই সন্ধ্যায় হোটেলে গরম কফি খেয়ে এবার 'অনুসন্ধান'-এর কাহিনী শোনানো হল অমিতাভজিকে। আমি হিন্দি ইংরেজিতে বেশ খিঁচুড়ি বানিয়ে গল্পটা শোনালাম। বাকিটা এবার বোঝালেন ওকে শক্তিবাবুই। বাংলা হিন্দিতে ছবিটা হবে শুনে খুশি হলেন অমিতাভ. ভাঙা বাংলায় বলেন ডারুণ ছবি হোবে।

কলকাতায় যাবে। ক্যতাদিন যায়নি। আমিতাভ বচ্চন কলকাতাতেই চাকরি নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে আসেন। তখনও ভাবেননি যে বোম্বাই-এর এক নম্বর হবেন। তার স্ত্রীও বাঙালি।

ভুপাল প্রবাসী সাহিত্যিক সাংবাদিক তরুণ ভাদুড়ীর মেয়ে। চম্বলের উপত্যকার দস্যুদের নিয়ে বাংলায় তার বই 'অভিশপ্ত চম্বল' সকলেই পড়েছেন। সেই তরুণবাবুর মেয়ে জয়া। সেও বাংলায় সত্যজিৎবাবুর ছবিতে ধন্যিমেয়ে ছবিতে অভিনয় করে বোম্বাই-এ যায়। এখন অমিতাভের স্ত্রী। তাই বাংলার জন্য একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে। বাংলাছবির তখন সারা ভারতে সম্মান রয়েছে।

'অমানুষ' তখন হিন্দিতেও সুপার হিট।

'অমানুষ' কাহিনীর চিত্রস্বত্ব বিক্রি হয়েছে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ভাষার জন্যও। 'অমানুষ'-এর হিন্দি চিত্রনাট্য প্রকাশ করেছে দিল্লি থেকে স্টার পাবলিশিং। একবছরে তারা প্রায় তিরিশ হাজার কপি বিক্রি করেছে।

অমানুষ-এর সাফল্য অনুসন্ধানের বাজার তুলে দিয়েছে। অমিতাভজিকে বলি—বাংলা বলতে হবে যে!

শিখে লিবে আমি। দৃঢ়কণ্ঠে বলেন তিনি।

ওদিকে অমিতাভের সঙ্গে কালীরামের চরিত্র করছেন আমজাদ। তাঁরও ওই এক কথা—থোড়া বহুৎ জানে বাকি ঠিক শিখে লিবে।

তখন হিন্দি ফিল্ম জগতে বাঙালির দাপট অবলুপ্ত হয়নি। স্টুডিওতে অনেক বাঙালি, তাই হিন্দিভাষাভাষী শিল্পীদের অনেকে বাংলা বোঝেন, টুকটাক বলতেও পারেন।

এবার ঘরে ফেরার পালা। পুরো বাংলা চিত্রনাট্যটা আমাকে স্টুডিওর রেকর্ডিং সেন্টারে ঘণ্টা চারেক ধরে চেষ্টা করে রেকর্ডিং করে দিতে হল। ওই রেকর্ডিং থেকে ক্যাসেট করে হিন্দি শিল্পীদের দেওয়া হবে। তারা গাড়িতে, বাড়িতে ওই ক্যাসেট বাজিয়ে কিছুটা রপ্ত করবেন। বাকি সামলাতে হবে শক্তিবাবুর বাঙালি সহকারী প্রভাত রায়কে। জ্যোতি রায়দের। বাংলাতে বাকি তালিম ওরাই দেবে।

এর মধ্যে কমলেশ্বরের কাজ শুরুর আগে কমলেশ্বরজি বলেন চা-বাগান তো দেখেনি। লেখার জন্য ওটা দেখা দরকার।

কমলেশ্বরজিকে নিয়েও চা বাগান এলাকা ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। উনিও নতুন পরিবেশ দেখ খুশি। বলেন এত বা-বাগান, কল্পনাও করিনি।

এবার কলকাতায় ফিরেছি। কলকাতার জীবন নিজের ছন্দেই বয়ে চলেছে। মোহিনী এখন ডঃ মেঘনাদ সাহার সহকারী, লেখার কাজ কিছুটা কমেছে তার। অমল এখন ডাক্তার। আর ওদের সঙ্গী বোহেমিয়ান অশোক এখন গেরুয়া পরে অশোক ফকির হয়েছে।

অশোক এক বিচিত্র চরিত্র। সিনেমাতে অভিনয় নিয়ে মাতল, বেপরোয়া সে, এখনও বিয়ে করে সংসারী, তারপর সর্বত্যাগী অশোক ফকির। তখন হিপিদের রাজত্ব। কি করে হিপিরাও ভিড়ল অশোক ফকিরের সঙ্গে জানি না।

আর অশোক ভিড়ল পূর্ণ দাস বাউলের সঙ্গে। পূর্ণকে আমি ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি। তখন ও ছিল নাথের বাউল। সিউড়ি শহরের কোর্ট সুপার ছিলেন আমার এক দাদা। আর ভগ্নীপতিও থাকতেন সিউড়ির ডাঙ্গাল পাড়ায়। প্রয়ই যেতাম ওখানে। সিউড়ি সাইথিয়া রোডের ধারে কুলেড়া গ্রামে ছিল পূর্ণের বাবা নবনী দাস বাউলের আখড়া। নবনীদাস ছিলেন প্রকৃত সাধক বাউল। রবীন্দ্রনাথ নবনী বাউলকে চিনতেন। উত্তরায়ণের সংগ্রহ শালায় নবনীদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবিও আছে মনে হয়।

পূর্ণ দাস তখন সিউড়ি শহরে কখনও অন্ডাল সাইথিয়া লাইনের ট্রেনে বাউল গাইত। পরে কলকাতায় আমি তখন বেলেঘাটায়, পূর্ব কলকাতা সঙ্গীত সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত, প্রথম সেবার যুবসম্মেলনে গাইলেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, পরে বাউল পরিবেশন করেন নবনীদাস আর সঙ্গে গাইল কিশোর পূর্ণদাস। সতেজ সুরেলা গলা তেমনি গান।

কলকাতার মানুষ রাঢ় বাংলা লাল মাটির উদাসী সুর, খুঁজে পেল কিশোরের কণ্ঠে। সেইখান থেকে নিয়ে গেলাম নবনীদাস আর পূর্ণকে আমাদের আসরে। পূর্ণ যেন কলকাতা জয় করে নিল। সঙ্গী হেম নস্করের ভাই আমাদের নৃপেনদার বাড়িতেই পূর্ণের থাকার ব্যবস্থাও হল। পূর্ণ তখন কলকাতায় বেশ প্রোগ্রাম করছে—বাউল গানকে সেই তুলে ধরেছে এখানে। মাঝে মাঝে কলকাতায়

থাকে, গ্রামেও যায়। ক্রমশ এখানে পায়ের তলে মাটি পেয়েছে সে নিজের প্রতিভায়।

কিন্তু আজও পূর্ণ তার সেই অতীতকে ভোলেনি। আমার কাছেই সে তার অতীত জীবনের অনেক কথা বলেছে। তার সেই অতীতের পটভূমিকায় আমিও বিচরণ করেছিলাম।

ট্রেনে গান গেয়ে যা রোজকার হত তাতেই দিন চালাতে হত, কারণ বাবা নবনীদাস সাধক পুরুষ, সংসার তাকে বাঁধতে পারেনি। সংসারের কথা ভাবার সময়ও তার নাই।

ধান ওঠার পর মাঠের আলের মধ্যে ইন্দুরের গর্ত করে, ইন্দুরের দল সেই গর্তে ধানও সঞ্চয় করে রাখে পূর্ণ সেই গর্তের সন্ধান করে মাটি খুঁড়ে যেদিন চার-পাঁচসের ধান পায় সেদিন তার ছুটি।

নাহলে গ্রামে গ্রামেই বাউল গেয়ে ভিক্ষায় বের হয়, গৃহস্থ চাল দেয়। কোনো গ্রামে ঢোকার আগে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় সেই চাল সামান্য ছোট পুটুলির আকারে বেঁধে কোনো পুকুরে কঞ্চির আগায় জড়িয়ে জলে চুবিয়ে রেখে গ্রামে ঢোকে। গ্রামের এবাড়ি ওবাড়ি, ওপাড়ায় গান গেয়ে কিছু চাল সংগ্রহ করতে ঘণ্টা দুয়েক লাগে, তারপর যাবে অন্য গ্রামে সংগ্রহে, সেই গ্রাম থেকে বের হবার মুখে পুকুরে কঞ্চির আগায় জড়ানো সেই চালের ছোট পুটুলি ঘণ্টা তিনেক ভিজে আধা নরম হয়ে গেছে। ওই দুপুরে আহার, তাই খেতে খেতে আবার অন্য গ্রামে যেত সংগ্রহে পূর্ণদাস।

এমনি কঠিন জীবন সংগ্রাম করে পূর্ণ আজ এইখানে উঠেছে। সেই পূর্ণ দাসের বাউলের দল চলেছে আমেরিকায়, অশোক ফকিরও পাড়ি দিল আমেরিকায়। পূর্ণদাস ফিরে এল অশোক আর ফিরল না। গেরুয়া পরে অশোক ফকির রয়ে গেল আমেরিকায়। ক'বছরেই বেশ চ্যালা চামুণ্ডা জুটিয়ে সেখানে ক্যামন করে গেড়ে বসেছে।

অশোক দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় এসেছে। খবর পেয়ে গেলাম গ্রান্ড হোটেলে। বোহেমিয়ান অশোক ফকির যে পথে পথে ঘুরত, সে এখন গেরুয়া পরে গ্রান্ড হোটেলে বসে এমন গঞ্জিকা সেবন করছে যে এয়ার কনডিশনড ঘরের জানলা খুলে মুক্ত বায়ুর নিশ্বাস নিতে হয়। মুখে বলে ওম্ হরি তৎ সৎ। আমি, মোহিনী অমল অবাক হয়ে নতুন মহারাজকে দেখি। বলি—অমল, এ যে দারুণ যোগী হে!

অশোক ফকির এখনও আমেরিকাতেই রয়েছে বেশ জাঁকিয়ে। নিউইয়র্কেই বসে শুনেছিলাম ওর নাম। মিচিগানের দিকে কোথায় আছে। যাবার সময় পাইনি। আর দেখাও হয়নি অশোকের সঙ্গে।

অনুসন্ধানের শুটিং-এর জন্য এবার লোকেশন ঠিক করতে হবে। বিরাট ইউনিট

আসবে। শক্তিবাবু এসেছেন। আমরা দুজনে বাগডোগ্‌রা বিমান বন্দর থেকে গিয়ে সিনক্লিসার্স হোটেলে উঠলাম। তখন শিলিগুড়ির সেরা হোটেল ওইটাই। শহরের কোলাহল থেকে বাইরে।

পরদিন সকালে আমরা হেভি ব্রেকফাস্ট নিয়ে বের হলাম মিরিকরোড ধরে। বালাসন নদীর ব্রিজ পার হয়ে রাস্তাটা ঠোল উঠেছে পাহড়ের দিকে। দুদিকে ঘন জঙ্গল। শক্তিবাবু গাড়ি থেকে নেমে চারিপাশ এদিক-ওদিক দেখেন। ওর সঙ্গে একটা ক্যামেরাও এনেছেন। সাধারণ ক্যামেরায় একবারে নব্বুই ডিগ্রি অর্থাৎ একটা চোখে যা দেখা যায় সেই ছবিই ওঠে। এটাতে একসঙ্গে দুচোখ যা দেখে অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি এঙ্গেলেই ছবি ওঠে।

সঙ্গে স্ক্রিপ্ট রয়েছে। শক্তিবাবু বলেন, চিত্রনাট্যে নোট করে রাখুন জায়গাগুলো, শুটিং-এর সময় না হলে মনে থাকবেন। এইখানে হবে অমিতাভের খচ্চরের পিঠে আসার প্রথম সিন, কালীর সঙ্গে প্রথম দেখা।

এইভাবে নোট করে চলি লোকেশনগুলো। মিরিকে এসে ঘুরে দেখে ছবির উপযোগী তেমন কোন ঠাই মিলল না। চলো দার্জিলিং, মিরিক থেকে দার্জিলিং আসার পথে সীমানায় এসে থামলাম। নেপাল সীমান্ত উঠানের একদিকে ইন্ডিয়া— অন্য পাশে নেপাল, চেকপোস্টও রয়েছে। দার্জিলিং থেকে অনেক ট্যুরিস্ট এসে গাড়ি রেখে হেঁটে অদূরে নেপালের পশুপতি বসতিতে যাচ্ছে বিদেশী মাল কেনার জন্য।

চেকপোস্টের লোকেরাই বলে ওদিকে পশুপতি, সব কুছু মিলেগা। আমরা দুজনে গাড়ি রেখে পশুপতি গেলাম। বড় বসতি। চালাঘরের আধাপাকা ঘরের দোকানে নানা রকম ইলেকট্রনিক বিদেশী জিনিস, জামা, প্যান্ট, ছাতা—সেন্ট-সবই আছে বেচা-কেনাও চলছে ভালোই। সবই বেশিরভাগ বাঙালি স্টুরিস্ট।

ওরা জিনিসপত্র দরাজহাতে কিনে আনার পর এবার চেকপোস্টের লোকজন আইনের প্রশ্ন তুলে তাতে ভাগ বসাচ্ছে। না হয় রফা করে প্রণামী আদায় করে ছাড়ছে। অন্যদিকে অন্য পার্টি, অন্য নবাগত যাত্রীদের বলেকয়ে পশুপতির বাজারে পাঠিয়ে চলেছে। ভেবেছিল আমাদের কাছেও কিছু পাবে, তা নয়, দেখে দুই মূর্তি দু-প্যাকেট বেনসন হেজা সিগ্রেট কিনে ফুঁকতে ফুঁকতে আসছি। ওরা হতাশ হয়ে দেখল মাত্র।

সীমানার কাছেই দেখলাম সেই মার্গারেট হোপ চা বাগান। উঁচু পাহাড়ের সারা গা খেয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে সবুজ চা গাছ। সুখিয়া পোখরীতে কিছুক্ষণ ঘুরে দেখা হল। বেশ জমাট বস্তি—গঞ্জ মত। ওখানেই কালীরামের বাবার বাড়ি— আড়ত ইত্যাদির শুটিং করা যাবে। চিত্রনাট্যে নোটও করা হল। তারপর এলাম ঘুম— দার্জিলিং যাবার দরকার নাই। তখনও রাখীর বাবার বাংলো যেখানে প্রধান লোকেশন হবে সেটা বাছা হয়নি। এর আগে মহানদী। স্টেশনের কাছে তপনবাবু যেখানে

সাগিনা মাহাতোর শুটিং করে ছিলেন সেই জায়গাও দেখেছি। ঠিক পছন্দ হয়নি শক্তিবাবুর। শুনেছি তাকদা টি এস্টেটের বাংলোটা সুন্দর।

তাই ঘুমেই একটা পথের ধারের দোকানে চা আর নিমকি কেনা হল। নিমকি যে কতদিনের কে জানে। পাথরের চাকলার মতো শক্ত। ফেলে দিতে হল। পাথর ধারে একজন মটরসুটি বিক্রি করছিল। সবুজ মটরশুটি তাই কেজি দুয়েক কেনা হল। ওই হবে দুপুরের লাঞ্চ।

চললাম কার্শিয়াং রোড ধরে তিস্তা বাজারের দিকে। ওই পথেই পড়ে তাকদা। তাকদায় বনবিভাগের অফিস রয়েছে। আছে অন্যতম সেরা অর্কিড উদ্যান ও গবেষণা কেন্দ্র। আগে তাকদা ছিল ছোট ঘুমন্ত একটি পাহাড়ী বস্তি। এখন সুন্দর সাজানো জনপদ।

পাহাড় থেকে সোজা নেমে গেছে সবুজ একটি উপত্যকা, যেন বিরাট একটা ফানেল, নীচে সবুজের বেষ্টনীর মধ্যে তাকদাটি এস্টেট-এর বাংলো, অফিস, নীচে নেমে এলাম। চারিদিকে আকাশছোঁয়া পাহাড়। চা-বাগান দূরে পাহাড়ের মাথায় লেবং-এর কিছুটা দেখা যায় ঊর্ধ্বাকাশে।

মিঃ প্রধান তখন ম্যানেজার ওখানেই বাংলো পরিবেশ দেখে শক্তিবাবুর পছন্দ হল। ওইটাতে প্রধান শুটিং স্পট হবে। আশপাশেও প্রচুর সুন্দর পথ, লোকেশন আছে। দার্জিলিং থেকে এসে কাজ করে আবার দার্জিলিং ফেরা যেতে পারে।

মিঃ প্রধান বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তিনিও সব ব্যবস্থা করে দেবার কথা দিলেন। ওর বাগানে একটা কমলালেবুর গাছ দেখে চাইলাম। সবুজ গাছটা পাকা কমলালেবুতে রঙিন হয়ে উঠেছে। উৎকৃষ্ট দার্জিলিং-এর নধর সাইজের সুপক্ক কমলালেবু।

মিঃ প্রধান বলেন পেড়ে নিন যত পারেন কে খাবে? গাছে উঠে দেখি বিপদ। গাছ ভর্তি ইয়া সাইজের কাঁটা। গাছে, ডালে ডালে সর্বত্র। হাত বাড়ালেই হাতে বেঁধে। কিছু পাড়লাম তবু কাঁটার খোঁচা খেয়ে শেষে প্রধানজিই একটা লম্বা টুল আনিয়ে তাতে উঠে বেশ নিরাপদে বাইরে থেকে লেবু পাড়লেন।

পাশে ছোট সাইজের বাতাবি লেবুর গাছে নধর মাঝারি ফুটবলের সাইজের বাতাবি লেবুও রয়েছে অনেক। এক ব্যাগ লেবুর পর এবার বাতাবি লেবুর কথা বলতে প্রধানজি বলেন—খেতে পারবেন না। দারুণ টক।

আবার চড়াই ঠেলে সেই আকাশে ওঠা। জিপ বলেই পারল। এবার যাত্রা তিস্তা বাজার হয়ে কালিম্পং। হাতির শুঁড়ের মতো নিচু হয়ে পথটা নেমেছে তিস্তা বাজারের দিকে। পাশে একটা ভিউ পয়েন্ট বহুনীচে তিস্তায় গিয়ে মিশেছে কোন পাহাড়ি নদী। অপূর্ব দৃশ্য।

এই পথে অ্যামবাসাডার নামতে পারে, উঠতে পারে না। তাই জিপই বেশি চলে। তিস্তা বাজারে তিস্তা পার হয়ে এলাম কালিম্পং ট্যুরিস্ট লজে তখন সন্ধ্যা

সাতটা। সকাল সাতটা থেকে সন্ধা অবধি ঘুরেছি, সেই ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ বলতে কমলালেবু সহযোগে কঁচি মটর দানা।

রাতে স্নানটান করে ট্যুরিস্ট লজে ভাত মুর্গির ডিনার ভালোই জমল। অমিতাভের বাংলো যেখানে বিয়ের পর রাখী থাকবে। বেশি ঘটনা যেখানে ঘটবে সেটা এখনও ঠিক করা হয়নি। আর উৎপল দত্তের ডেরা—রোপওয়ে যা দিয়ে ওদের চোরাচালান হত সেটাও চাই। কথা ছিল সিকিমের দিকে যাবার। কিন্তু শক্তিবাবু বাংলার বাইরে যেতে চাননা অমিতাভ, আমজাদ রাখীদের মতো শিল্পীদের নিয়ে। শিলিগুড়ির কাছাকাছি লোকেশন চাই। শিল্পীদের থাকার জায়গা চাই, ইউনিটের জন্য হোটেল চাই। তাই দার্জিলিং শিলিগুড়ি বেস করেই কাজ করতে হবে।

পরদিন ফিরছি এবার কালিম্পুং থেকে তিস্তার ধারের রাস্তা—সিকিম রোড ধরে। বেশ কিছুটা এসে তিস্তার উপর একটা রোপওয়ে দেখে থামলাম। পাহাড়ের ঘেরা তিস্তা ওদিকে ঘন শালবন শ্বেতিঝোরা জায়গার নাম। এখানে কোন কোম্পানির একটা রোপওয়ে আছে তিস্তা পার হয়ে ওপারে পাহাড়ের কোলে তাদের বাগানে যাবার জন্য।

ওতে মালপত্র, লগ্‌ই যাতায়ত করে, মানুষ যাবার সময় কাঠের বাক্স বেঞ্চের মতো একটা টব লাগিয়ে দেয়। তিস্তার উপর প্রায় পনেরো মিনিট ধরে শূন্যপথে দুলতে দুলতে ওই টবে বসে যায় মানুষজন। তেমনি হাওয়া তিস্তার উপর মনে হয় যেন ছিটকে নীচে ওই সফেন জলধারার উপর ফেলে দেবে।

শক্তিবাবুর পছন্দ হয় জায়গাটা। সেই রোপওয়েতেই কাজ হবে। আর ক্লোজে কাজ করার জন্য বোম্বের ফিল্মসিটিতে পাহাড়ঘেরা কোনো জায়গায় এমনি রোপওয়ে কিছুটা বানিয়ে নেবেন মাটির কিছুটা উপরে। আসল নকল দুটোকে মিশিয়ে দিলে তখন আর ধরা যাবে না। রোপওয়েও মিলল। এখন দরকার অমিতাভের বাংলোর।

বলি—সামসিং-এর বাংলোতেই কাজ করবেন? দূর পথের সমস্যা রয়েছে। ফিরছি। কালীঝোরা বাংলোটা পথের ধারেই। কালীঝোরা নদী এসে পড়েছে তিস্তা নদীতে। সেই মোড়ে সুন্দর একটা সরকারি বাংলো। বেশ কিছু উপরে উঠতে হয়। সেই বাংলোটা দেখেই ভালো লাগে। সামনে তিস্তা-এদিকে কালীঝোরা জলের রংনীল, সবুজ অরণ্য পর্বতের পটভূমিকয় ছোট বাংলোটাকে বাছা হল। এবার অনুমতি, পুলিশ পারমিশন নিতে হবে। তারপর থাকার ব্যবস্থা, ওসব করবে প্রেডাকশনের লোকে।

অনুসন্ধানের শুটিং শুরু হল। প্রথমে একবার এসে ওরা শুটিং করলেন দার্জিলিংকে কেন্দ্র করে। আমি তখন কলকাতায় ব্যস্ত। প্রথমবার আসার সুযোগ

হয়নি। ওরা দার্জিলিং শুটিং শেষ করছেন। তখন অনুসন্ধানে একটা সিকোয়েন্স ছিল তরুণকুমার আর কয়েকজনকে নিয়ে, তাদেরও আনা হয়েছিল। কিন্তু শেষের দিকে আবহাওয়া এত খারাপ হয়ে গেল যে তা তরুণকুমারদের অধ্যায়টা করাই গেল না। পুরো ইউনিট তিনবার দিন ধরে দার্জিলিং-এ বসে রইল। মেঘমুক্তি ঘটল না। সেই অংশের শুটিং ফেলে রেখেই ফিরতে হল।

তখন আমি আমার 'অচেনা মুখ' উপন্যাসের চিত্রনাট্য লিখছি অজিত লাহিড়ীর জন্য। সারাঙ্গার অরণ্য পর্বত আয়রন ওর মাইন্‌সে প্রায়ই যাই। বিভূতিভূষণের সাতাশ পাহাড়ের দেশ দুর্গম সারাঙ্গার অরণ্যের বাংলোয় বনবাসে থাকি। সঙ্গী সেই নৈহাটির দেবু আর অলক, আর এক বন্ধুও জুটেছে শান্তি গাঙ্গুলি। বনেদি কলকাতার বাবু, আমাদের পাল্লায় পড়ে বলে পাহাড়ে রীতিমতো কাবু হয়ে গেছে।

এখান থেকে টাকাতে ট্রেন বদলে যেতে হয় বড়জামদা। তার আগে চাইবাসার বন অফিস থেকে ওরা ফরেস্ট বাংলো সারাঙ্গার অরণ্যের ঝুমড়ি থল্‌কোবাদ না হয় ছোটনাগরা বন বাংলো বুক করিয়ে তবে বনে ঢুকতে হয়।

গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখে বড়জামদার বিষ্টু দত্ত, বেলেঘাটার মানুষ, ওখানের বাসিন্দা হয়েছেন এখন, সেই অরণ্যজগতের বাইরের বিশাল পাহাড়গুলো আয়রন ওর মাঙ্গানিজ ওর, এসবে ঠাসা। সেখানে পাহাড় ফাটিয়ে চলেছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। লোহাপাথর আসে সব ইস্পাত কারখানার ফার্নেসের জন্য।

সেই পরিবেশে একটি আদিবাসী তরুণের জীবনের কাহিনী, সমাজ পরিত্যক্ত একটি আদিবাসী তরুণ, ওখানের এক তরুণ বাঙালি কর্মীর সান্নিধ্যে এসে তার জীবনে যে ভাবে প্রকৃত মানুষের পরিচয় ফুটে উঠল তারই কাহিনী।

কিন্তু চিত্রনাট্য লেখার পর এবার অজিতবাবুর মাথায় কি চাগলো জানি না তিনি কাহিনীর মোড়টাই ফিরিয়ে দিলেন সম্পূর্ণ অন্যদিকে।

আমার গল্পের প্রধান চরিত্র ছিল ওই আদিবাসী তরুণ। তার জীবনায়ণ তার উত্তরণ নিয়েই আমার উপন্যাস, মধ্যবিত্তকর্মী ছিল তার পাশে। কাহিনীটা ওই আদিবাসীর উপরই, কিন্তু অজিতবাবু ওই আদিবাসী চরিত্রে নিলেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়কে, সে তখন সবে উঠছে, আর তার আশ্রয়দাতার চরিত্রে নিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে, আর নায়িকা ছিলেন সন্ধ্যা যায়। যেহেতু সৌমিত্রবাবুকে নিয়েছেন, তাই তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে কাহিনীতে, আমি আপত্তি করি—গল্পটা ঘোরাবেন না, ওই চরিত্রে সৌমিত্রবাবুকেই নেবার দরকার ছিল না। ওটা যে কেউ করতে পারতেন, হিরো এখনে ওই আদিবাসী ছেলেটিই। কিন্তু অজিতবাবু সৌমিত্র বাবুকে নিয়ে গল্প এবার ঘোরাতে বললেন, আমি আপত্তি করায় তার কোন চিত্রনাট্যকার বন্ধুকে দিয়েই ওই অন্যকর্মটি করালেন তিনি সারাঙ্গার বনভূমি দেখেননি। দেখেননি আয়রন ওর মাইনের জীবন।

তবু এখানে বসেই সৌমিত্রবাবুকে নায়ক করে এক প্রেমের কাহিনী ফাঁদলেন—আদিবাসী তরুণ, তার জীবনচর্যা হয়ে গেল তুচ্ছ। মূল কাহিনীর এই পরিণতি দেখে বলি—এ ছবির কোন প্রাণই থাকবে না। অজিতবাবু বলেন—আপনার কাহিনী ফলো করলেই কি ছবি হিট করবে? তা জানি না। ছবি হিট করাতে গেলে সবকিছু ঠিকঠাক হওয়া চাই, তবে এ ছবির কাহিনীই শেষ হয়ে গেছে এটা বলতে পারি।

অজিতবাবু ঋত্বিকের ইউনিটের প্রডাকশন কনট্রোলার ছিল। পরে পীযূষ গাঙ্গুলীর সঙ্গে ছবি করেছিল কুমারী মন, কিন্তু তার চিত্রনাট্য নিয়েও ঋত্বিকবাবুর সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল, এবার আমার সঙ্গেও অশান্তি কিছু হল।

অজিতবাবু তখন ফিল্মের কলাকুশলীদের সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা। ফিল্মজগতে এই নিয়ে কিছু পরিচিতি আছে। সত্যেন চাটুয্যে তখনও রয়েছেন শব্দ গ্রহনের কাজে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে, দেখাসাক্ষাৎ হয়। শিল্পী বন্ধু দেবব্রত মুখুয্যে আর নেই। সেও চিরতরে ছেড়ে যাওয়া বন্ধুদের তালিকার একজন হয়ে গেছে।

সিঁথির মোড়ের এম-পি স্টুডিওতে ওরা সবাই একসঙ্গে ছিলেন। ক্রমশঃ উত্তর কলকাতার সব স্টুডিওগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে। ঝাউতলা (পার্ক সার্কাসের) রূপশ্রী স্টুডিও উঠে গেছে। মধ্য কলকাতার আরারাই কোনোমেতে টিকে আছে, এখন দক্ষিণে টালিগঞ্জেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে ফিল্ম নির্মাণ। উত্তর কলকাতাকে তারা বিসর্জন দিয়েছে! সত্যেন রামবাবুরাও সব এই টেকনিসিয়ানেই এসেছেন। টেকনিসিয়ান ওরা কয়েকজনে চালান, সরকারি অধিগ্রহণ ঘটেনি তখনও।

অজিতবাবু শুটিং শুরু করলেন, চিমেতালে কাজ চলে। তবে আমি তত আগ্রহী নই। তখনও চাকরিটা ঠিকই করছি। তার সঙ্গে এই লেখাপড়া ছবির কাজটাকে মিশিয়ে দিই না। ওটা আলাদা জগৎ, সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গেই কাজ করি, সকাল সন্ধ্যা লিখি।

সকাল ছ'টা থেকে নটা অবধি লিখে অফিসের জন্য তৈরি হই—আবার সন্ধ্যায় ফিরে কাজে বসি। তবে সন্ধ্যায় কোনোদিন বইপড়া বা স্টুডিও পাড়ায় গেলে সেদিন কাজ হয় না। উল্টোরথের আসর ভেঙে গেছে। উল্টোরথ, সিনেমাজগৎ প্রসাদ মারা যাবার পর গিরীনবাবু কিছুদিন চালিয়েছিল, তারপর নানা কারণে গিরীনবাবু বের হয়ে গিয়ে প্রসাদ পত্রিকা চালু করলেন ইন্ডিয়ান মিরার স্ট্রীট থেকে। তাতেও লিখি। উল্টোরথের তখন ভাঙা হাট। প্রফুল্লবাবুর পর বিকাশ চালাচ্ছে। তবে সেই রমরমা আর নেই। আড্ডাও আর জমে না।

ঋত্বিকের আড্ডাও আর নেই। সুবর্ণরেখার পর ঋত্বিকবাবু কেমন যেন বদলে গেলেন। কাজও নাই। পুনা ফিল্ম ইন্‌স্টিট্যুটের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়ে চলে গেছেন। তার সহকারী সমীরণ দত্ত তখনও পুনায় ওখানেই অধ্যাপনা করছেন।

তবে একটা আড্ডাই রয়েছে। সেটা নবকল্লোলে মধুবাবু সুবোধবাবুদের আড্ডা।

বইপাড়া সেরে সেখানেই হাজির হই মাঝে মাঝে। এর মধ্যে বাংলা সাহিত্যে পত্রিকা জগতে একটা শূন্যতার সূত্রপাত হয়েছে। বাংলার অন্যতম অভিজাত বাংলা মাসিক পত্রিকা যেটা রামানন্দবাবু চালাতেন—যাতে রবীন্দ্রনাথও নিয়মিত লিখতেন সেই পত্রিকাও এবার অবলুপ্ত।

রামানন্দবাবুর লেখা বাছাই সম্পর্কে একটা সরস গল্প তখন চালু ছিল। রামানন্দবাবু একবার কাশীতে বেড়াতে গেছেন। একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নানে নেমেছেন, কী করে পা হড়কে গভীর জলে ছিটকে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে বেসামাল হয়ে তলিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় একটি তরুণ লাফ দিয়ে পড়ে ডুবন্ত রামানন্দবাবুকে প্রাণে বাঁচান। রামানন্দবাবুও তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তারপর কয়েক মাস কেটে গেছে। রামানন্দবাবু প্রবাসী অফিসে বাস কাজ করছেন, একটি তরুণ এসে প্রণাম করে একটা কবিতা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—আমাকে চিনতে পারছেন?

রামানন্দবাবু ছেলেটিকে দেখছেন, ভাবছেন কোথায় দেখেছেন। ছেলেটি বলে—সেই বেনারসে গঙ্গার ঘাটে জল থেকে আপনাকে তুলেছিলাম। এবার চিনতে পারেন রামানন্দবাবু। ছেলেটি সেদিন তাকে বাঁচিয়েছিল মা গঙ্গার বুক থেকে। ছেলেটি বলে—কাশীতেই থাকি, কবিতাটা যদি একটু ছাপেন প্রবাসীতে। রামানন্দবাবু এর মধ্যে কবিতাটা পড়ে ফেলেছেন তার মতে একেবারে অচল। এবার বলেন ছেলেটিকে।—শোনো, তোমার সঙ্গে ফের কাশী যাব। তুমি আমাকে ওই গঙ্গার ঘাটের জলেই ছেড়ে দিও। তুলো না। পারি উঠব না হয় মা গঙ্গার বুকেই ডুবে শেষ হব। যা হয় হবে কিন্তু এটি ছাপার ব্যবস্থা করতে পারবো না। বাঁচি মরি ক্ষতি নেই।

এমনি নিখুঁত নির্বাচক ছিলেন রামানন্দবাবু। তিনি মারা যাবার পর কেদারবাবু যোগেশ বাগল মশাই কিছুদিন চালিয়েছিলেন। তারপর প্রবাসী উঠে গেল—সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়ি ভেঙে এখন বোধহয় পেট্রল ডিজেল বেচার জায়গা হয়েছে।

ভারতবর্ষও ছিল ঐতিহ্যময় পত্রিকা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স-এর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হত। শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম লেখক। শরৎবাবুর সব বই-এর প্রকাশক ছিলেন ওরাই। পরে তারাশঙ্করবাবু নিয়মিত লিখতেন। সেই পত্রিকাও নানা কারণে বন্ধ হয়ে গেল।

তখনও কোনোমতে টিকে আছে মাসিক বসুমতী, যুগান্তর প্রকাশ করত 'অমৃত সাপ্তাহিক' কিছুদিন চলার পর 'অমৃত'ও কেমন ঝিমিয়ে গেল। এই অন্ধকারের মাঝে 'নবকল্লোল' সগৌরবে চলছে। ওদের আড্ডাই সাহিত্যের আড্ডা হয়ে রয়েছে। মিত্র ঘোষের আড্ডার সেই সব রক্ষী মহারক্ষীরাও চলে গেছেন, বিভূতিবাবু, প্রবোধ সান্যাল, কালিদাস রায়, প্রভৃতিরা চলে গেছেন। সুমথ দাও নেই। গজেনদা প্রমথ বিশী মশাই আনন্দগোপাল রয়েছেন কজন। তারাশঙ্করবাবুও রয়েছেন তখনও। তবে

ভাঙা হাট। অমানুষ তখনও সারা বাংলায় সাড়া তুলেছে। স্বপনকুমার ছিলেন যাত্রাদলের প্রখ্যাত অভিনেতা এবং পরিচালক উত্তমকুমারের বেশ কয়েকটি সিনেমায় হিট ছবির নাট্যরূপ দিয়ে যাত্রাতে করেছিলেন তিনি। তার অভিনয় এবং প্রয়োগ নৈপুণ্যে সেগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

তিনি 'অমানুষ'-এর যাত্রারূপ দিতে চাইলেন। যাত্রার দল মালিক ভলিবাবুকে নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। আমি তখন বেলেঘাটা ছেড়ে সিঁথিতে নিজের বাড়িতে এসেছি কোনোমতে একতলা করে রয়েছি। বেলেঘাটার সেই ক্লাবের রমরমাও আর নেই।

কলকাতার বুকে একটা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয়ই ঘনিয়ে আসছে। তার সূচনা হয়ে গেছে, কিছুদিন আগেও সারা কলকাতায় বেশ কয়েকটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কনফারেন্স হত। প্রচুর দর্শকও যেতো সেখানে। ক্রমশ সেগুলো একে একে বন্ধ হয়ে গেল। মানুষের রুচি ও বদলাতে শুরু করেছে, তার প্রথম ঘা এসে পড়েছিল সাহিত্য সংস্কৃতির উপর, সামাজিক বিপর্যয়েরই এ যেন পূর্বাভাস।

অনুসন্ধান ছবির দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু হবার আগে বোম্বে যেতে হল। রাশ প্রিন্টও দেখলাম। শক্তিবাবুর ছেলে অসীম সামন্ত এবার কলেজের পড়া শেষ করে বাবার সঙ্গে ব্যবসাপত্র দেখছে। নম্র-শান্ত স্বভাবের রুচিবান তরুণ। ওর ইচ্ছা ছবি করবে। এইসময় হোটেলে একদিন এলেন সুনীল দত্তের সহকারী ঃ 'অমানুষ'-এর সাফল্যের পর ওরাও আমার গল্প নিয়ে ছবি করতে আগ্রহী। ওরা চান 'মেঘে ঢাকা তারা' হিন্দিতে করতে। হেমন্তবাবু হিন্দি চিত্রস্বত্ব কিনেছিলেন কিন্তু নানা কারণে তিনি আর ওঠার ছবি করতে পারেনি আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন সেই কথা। পরিষ্কার লিখেছিলেন আমার পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না আপনি ওটা অন্য কাউকে দিতে পারেন।

এর মধ্যে ঋত্বিকবাবু বোম্বেতে আসেন, শক্তিবাবুর সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়। শক্তিবাবুই ওকে অফার দেন হিন্দিতে মেঘে ঢাকা তারা করার জন্য ঋত্বিকবাবুও রাজি হন।

অনুমতি বোধহয় হেমন্তবাবুও দিয়ে থাকবেন। শক্তিবাবু জানেন আমার সঙ্গে ওর চুক্তিতে আটকাবে না, তাই ঋত্বিকবাবুকে সাইন করান।

তারপর আর ঋত্বিকবাবুর পাত্তা নেই। বোম্বাই-এর বান্দ্রা এলাকার কোনো হোটেল থেকে ওকে অন্যত্র এনে চিত্রনাট্য করার আয়োজনও করেন। কিন্তু আর দেখা মেলে না। তারপর শুনেছিলাম সহকারীদের কাছে এক তুমুল বর্ষার দিন স্টুডিওতে আসেন ঋত্বিকবাবু—বেশ নাটকই ঘটে যায়, শক্তিবাবু সেই পরিকল্পনা আর কাজে পরিণত হয়নি। নাটকের ব্যাপারটা তার সহকারীরাও জানেন।

তবে 'মেঘে ঢাকা তারা' ঋত্বিক হিন্দিতে করতে পারলে একটা ভালো কিছুই

হতো। কিন্তু দীর্ঘ কবছরে ঋত্বিকবাবুর মতো প্রতিভাকে তিলেতিলে শেষ হয়ে যেতে দেখেছিলাম। কোন অভিমানে তিনি নিজেকে এভাবে ক্ষয় করেছিলেন ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে একটা প্রতিভার অপমৃত্যুকে বেদনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

পরে 'মেঘে ঢাকা তারা'র পঁচিশ বৎসর পূর্তি উৎসব হল ঘটা করে নন্দনে। এলাহি কাণ্ড। যে কজন শিল্পী কলাকুশলী বেঁচেছিলেন তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু 'মেঘে ঢাকা তারা'র এই হতভাগ্য লেখক সেই উৎসবে একটা আমন্ত্রণ পত্রও পায়নি। তাঁকে তাঁরা অগ্রাহ্য করেছিলেন। ঋত্বিক বেঁচে থাকলে এটা হত না।

হিন্দি 'মেঘে ঢাকা তারা' এবার নিতে চেয়েছেন সুনীল দত্ত, এর আগে বিমল রায় প্রোডাকশন থেকে আমার কেউ ফেরে নাই। উপন্যাস এর চিত্রস্বত্ব নিয়ে সুনীল দত্তকে নায়ক করে ছবি করার উদ্যোগ করেছিলেন বিমলবাবুর প্রধান সহকারী মণি ভট্টাচার্য। মণিবাবু এর আগে একটা ভালো ছবি করেছিলেন সুনীল দত্তকে নিয়ে— মুঝে জীনে দো।

কলকাতায় এসেছিলেন সুনীল দত্‌কে নিয়ে গ্রান্ড হোটেলে উঠে কেউ ফেরে নাই এর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, সুনীল দত্‌কে এবার উদ্যোগী হতে খুশি হই। কিন্তু এর মধ্যে শুনলাম যে হেমন্তবাবু আমাকে 'মেঘে ঢাকা তারা'র প্রসঙ্গে ওইভাবে চিঠি লিখে অন্যত্র দিয়ে দেবার কথা বলার পর ওর হিন্দি চিত্রস্বত্ব আর কাউকে বিক্রি করেছেন।

খবর শুনে সুনীলবাবুর লোককে বললাম। তিনচার দিন পর আসুন। তখন সইসাবুদ হবে।

শক্তিবাবুকে জানালাম খবরটা সত্যি কিনা একটু খোঁজ করে জানান নাহলে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। শক্তিবাবু পরদিনই জানালেন খবর সত্যিই। মুকেশজিকে উনি হিন্দি রাইট বিক্রি করেছেন।

হেমন্তবাবুও তখন বোম্বেতে নেই। তার কাছেও খবর নিতে পারলাম না। তাই সুনীলবাবুর সহকারীকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলাম। ওরা সেদিন সাইন করার জন্য দশহাজার টাকার চেকও এনেছিলেন, কিন্তু নিতে পারলাম না। বিড়ালের ভাগ্যে শিকে আর ছিড়ল না।

অনুসন্ধানের দ্বিতীয় পর্বের শুটিং-এ আমি গেছি। শক্তিবাবু উৎপলবাবু অমিতাভজি, আমজাদ খাঁ, অসিত সেন আলো দাশগুপ্ত আমরা রয়েছি হোটেল সিনক্লেয়ারে আর শহরের বাইরে সেবক রোডের ধারে হোটেল গীতাঞ্জলিতে রয়েছে পুরো ইউনিট। সিনক্লেয়ারের দোতলাটা আমাদের দখলে গীতাঞ্জলি পুরো ইউনিটের দখলে। আকাশ মেঘলা থাকলে বৃষ্টি হলে গীতাঞ্জলির ঘরেই ইনডোর শুটিং করা হয়, রোদ থাকলে ওই শ্বেতিঝোরা রোপওয়েতে, না হয় কালীঝোরা বাংলোতেই শুটিং হয়, ফাইটারের দল অমিতাভ-আমজাদের ডামিও এসেছে।

বোম্বের চিত্রজগতে ফাইটার স্টান্ট ম্যানদেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ওরা না থাকলে হিরোর হিরোইজমই প্রকাশ পেত না। মারাত্মক ঝুঁকি নেয় ওরাই, আর হাততালি, টাকার বান্ডিল কুড়োয় হিরো।

সেবার দেখেছিলাম বোম্বাইয়ে এক করুণ দৃশ্য। জুহুবীচে শুটিং হচ্ছে কোনও ছবির। হেলিকপ্টার থেকে হিরো দড়ির মই বেয়ে শূন্য পথে নেমে হিরোইনকে উদ্ধার করবে নৌকা থেকে। হিরোর পোশাক তেমনি জামা প্যান্ট পরে এক স্টান্টম্যান দড়ির মই ধরে নামছে হিরোর বদলে, কী করে হাত ফসকে পড়ে যায় বালিতে। দুটো পা গেঁথে গেল, প্রচণ্ড আঘাতে সেইখানেই মারা যায় বেচারা। বেচারার নামও কেউ জানে না, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সে অনামী শহীদই হয়ে রইল। পরে আবার অন্য স্ট্যান্টম্যান দিয়ে সেই শট নেওয়া হয়েছিল, হিরো হাততালিও কুড়িয়েছিল। সেই বেচারার নামও কেউ করেনি।

কিছুদিন আগে রামানন্দ সাগরের 'চরস' ছবির একটা শট নেওয়া হচ্ছিল নটরাজ স্টুডিওর প্রশস্ত চত্বরে। সেদিন স্টুডিওতে গিয়েছিলাম দেখি দূর থেকে একটা গাড়ি আসবে, সারা পথে স্মাগলারের দল ওই গাড়িটাকে ধরার জন্য একটা গাড়ি পথে আড়াআড়ি ফেলে পথ বন্ধ করে রেখেছে, এলেই ধরবে হিরোকে।

কিন্তু হিরো পথে রাখা ওই গাড়িটাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে চূর্ণ করে দেবে, স্মাগলারের দল লাফ দিয়ে সরে, প্রাণ বাঁচাবে, আর হিরো ওই গাড়ি ভাঙচুর করে নিজের গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাবে।

যথারীতি হিরোর বদলে তার মতো পোশাক পরিয়ে মাথায় হেলমেট, বুকে ব্রেস্ট প্লেট পায়ে পুরু সিন গার্ড এসব লাগিয়ে এক স্ট্যান্টম্যান বসেছে। গাড়ির সব কাচ খুলে ফেলা হয়েছে, ধাক্কায়, যাতে কাচ না ভাঙে, ট্যাঙ্ক পেট্রলও বেশি নেই সামান্যই আছে। যাতে ধাক্কার ফলে গাড়ি জ্বলে না যায়। এসব সাবধানতাও নেওয়া হয়েছে।

এদিকে পথের উপর যে গাড়িখানাকে ধাক্কা মেরে চূর্ণ করে বের হয়ে যাবে, সেটা একটা গাড়ির খোল মাত্র। গাড়িতে ওঠার জন্য নীচে কাঠের পাটাতন—নামার জন্য ওদিকেও পাটাতন করা হয়েছে, যাতে আর সেই পাটাতনের উপর একটা গাড়ির বডিকে চার টুকরো করে কেটে দড়ি দিয়ে সামান্য আটকে খাড়া করা আছে, যাতে প্রথম ধাক্কাতেই সেটা চূর্ণ হয়ে ছিটিয়ে পড়ে।

একটা ক্যামেরা বসানো হয়েছে ওই হিরোর গাড়ির স্টার্টিং পয়েন্টে, অন্যটা বসানো হয়েছে যে গাড়িকে ধাক্কা মারবে তার পাশে, এটা ওই সংঘর্ষের ছবিটা ধরবে, আর একটা ক্যামেরা বসানো হয়েছে ধাক্কা মারার পর হিরোর গাড়ি যে চলে যাচ্ছে সেটা ধরার জন্য।

ভাঙা গাড়ির দুপাশে ঝোপের মধ্যে স্মাগলার-বেশী স্ট্যান্টম্যানরাও রেডি।

ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পথ থেকে লাফ দিয়ে ভল্ট খেয়ে দুদিকে সরে যাবে, নাহলে চাপা পড়াই স্বাভাবিক, কারণ ওই হিরোর গাড়ি তো ফুল স্পিডে থাকবে।

আশপাশ থেকে দর্শকদের সরিয়ে দেওয়া হল। কারণ ধাক্কা মারার পর গাড়ি বেপথেও যেতে পারে।

এক টেকেই সট ওকে করতে হবে নাহলে ভাঙা গাড়ি তো আর পাওয়া যাবে না। আমি ওদিক থেকে দাড়িয়ে দেখছি, তীরবেগে ওই হিরোর গাড়ি ছুটে এসে পাটাতনের ঢালু বেয়ে উঠে প্রচণ্ড ধাক্কায় কাটা গাড়ির টুকরোগুলোকে ছত্রাকার করে দিল, পাশে থাকা গুণ্ডার দলও এদিক ওদিকে লাফ দিয়ে ডিগবাজী খেয়ে ছিটকে পড়ল। হিরোর গাড়ি ধাক্কা মেরে প্রচণ্ড বেগে একটু দিকভ্রস্ট হয়ে একটা আমগাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মারতে গিয়ে কোনোমতে ব্রেক কাজ করায় থেমে গেল। নাহলে ওই ডামি হিরোর কী হত বলা যায় না।

গাড়িটা থেমে যেতেই এবার ফাইটরদের দলবল সোল্লাসে ছুটে গিয়ে গাড়ির দরজা টেনেটুনে খুলে ডামিকে বের করল। তার মুখে তখনও যেন মৃত্যুর বিভীষিকা। এরা পিঠ চাপড়ে তাকে সাবাস দিচ্ছে। সট ওকে।

দেখি সেই ডামি হিরোর স্ত্রী ছোট ছেলেকে নিয়ে এই দৃশ্য দেখতে এসেছে, তারা সবাই মিলে কোল্ড ড্রিংক্স খাচ্ছে। এই মৃত্যু নিয়ে ছেলেখেলাই তাদের জীবিকা। এই শটটার জন্য সে হাজার খানেক টাকা পাবে। মারা গেলে মারাত্মক আহত হলে কি পেত তা জানা নেই।

অনুসন্ধানেও তাদের মতোই বেশ কিছু স্ট্যান্টম্যান। তাদের নেতাও এসেছে। বেশ কিছু ফাইট সিন আছে। এগুলো পরিচালক ওদের ফাইটমাস্টারকে বুঝিয়ে দেন। তারপর ফাইট মাস্টারও সঙ্গীত পরিচালক যেমন গান কম্পোজ করেন গায়ক গায়, ইনিও তেমনি ফাইট কম্পোজ করে তার দলবলকে দিয়ে রিহার্সেল দিয়ে নিয়ে তারপর টেক করেন।

দেখলাম এই ফাইট, ঘুসি মারা—আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ, অ্যাকশন এরও একটা ছন্দ, লয় আছে সেই লয়মতো এদের অ্যাকশন চলে। ছন্দপতন হলেই নির্ঘাৎ একটা ঘুসি তাকে খেতেই হবে। বেতালী, হয়ে গেলেই বিপদ, দুনিয়াই তালে ছন্দে চলে, ছন্দপতন ঘটলেই বিপদ।

হিরোকে মাঝে মাঝে ক্লোজ শটে এই ফাইটে অংশ নিতে হয়, সেইমতো তাকেও ছন্দটা ধরিয়ে দেয় 'ফাইট মাস্টার' সেই ভাবে কিছুক্ষণের জন্যও তাকে লড়তে হয়।

অনুসন্ধানের আউট ডোরে বের হতাম আমরা সকাল সাতটার মধ্যে। আট দশখানা করে একটা ট্রাকে লাইট, ক্যামেরা চা-কফির সরঞ্জাম।

হোটেল থেকে দুপুরে যেত প্যাক লাঞ্চ। সেদিন একটা দুরহ শট নিতে হবে, জায়গাটাও দারুণ। কালিম্পং রোড থেকে বাঁহাতে নেমে গিয়ে নীচে একটা পাহাড়ি

বস্তি পার হয়ে পাহাড়ঘেরা শ্বেতীঝোরা তিস্তার সঙ্গমে লোকেশন। শ্বেতিঝোরায় হাটুভোর কাচ ধার জল বয়ে চলেছে, ওদিকে খাড়া পাহাড়।

জিপগুলোর কারজুরেটার প্লাস্টিক কভার দিয়ে আটকানো যাতে জল না ঢোকে। অনুসন্ধানে এক জায়গায় আছে আমজাদ দূর থেকে জিপ নিয়ে আসছে, পালাচ্ছে সে। পাহাড়ের উপর থেকে অমিতাভ তাকে দেখে পাহাড়ের রীজ ধরে ছুটতে থাকে, একটা জায়গায় এসে পাহাড় থেকে লাফিয়ে সে জিপের পিছনে পড়ে জিপটাকে ধরে ধস্তাধস্তি করে চলেছে, আমজাদ জিপ নিয়ে জাল পার হয়ে পালাবার চেস্টা করছে, কোনোরকমে ধরে এবার তাকে অমিতাভ।

এই পুরো শটটা একটা টেকে নিতে হবে যাতে পুরো মজাটা দর্শক পায়, শক্তিবাবু মাঝে মাঝে এমন পরীক্ষা করেন। তার আরাধনা ছবিতে 'রূপ তেরে মস্তানা' এই পুরো গানটা একটা শটে নিয়েছেন। অথচ এই এক শটের মধ্যেই ক্যামেরার নানা কাজ করে শটের মধ্যেই বৈচিত্র্য এনেছেন। হিন্দিতে আর কোনো গান এভাবে টেক করা হয়নি।

এই শটের জন্যেও তিনটে ক্যামেরা তিন জায়গাতে বসানো হয়েছে। একটা ক্যামেরা ফলো করছে আমজাদের জিপ, অন্যটা ফলো করবে পাহাড়ের ব্রীজের উপর দৌড়ানো অমিতাভকে, অমিতাভ কিছুটা নিচু এসে একটা পাথর থেকে প্রায় পঁচিশ ফিট নীচে লাফ দিয়ে পড়ে আমজাদের জিপকে ধরবে।

তৃতীয় ক্যামেরা বসানো হয়েছে স্টান্ডের উপর। নদীর জলে, সেটা অপারেট করছে চিফ ক্যামেরা ম্যান আলোবাবু, জলে দাঁড়িয়ে, ওটা ধরবে। আমিতাভ জিপে ধস্তাধস্তি করছে, আমজাদের জিপ তখন জলে আর অমিতাভ ধরবে আমজাদকে।

জিপ আসল আমজাদই চালাচ্ছে, রীতি পাহাড়ের উপর ডামি অমিতাভ দৌড়বে, পাথরের থেকে পঁচিশ ফিট লাফ দিয়ে নীচে পড়বে আমজাদের জিপে এবার ধরবে আসল অমিতাভ, সেই জিপে ধরবে আমজাদকে। ওই ডামি অমিতাভ পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামবে প্রায় পঞ্চাশ ষাট ফিট, তারপর পাথর থেকে লাফ দেবে সোজা পঁচিশ ফিট নীচে।

আর নীচে এবার আসল অমিতাভ দুই পায়ে পুরু প্যাড পরে প্যান্টে ঢেকে তৈরি। ওই ধস্তাধস্তিটাও ড্যামিতেই করতে চাইলেন শক্তিবাবু, পরে ক্লোজ সটে অমিতাভকে জিপের উপরে ধরবেন কিন্তু অমিতাভজি নিজেই এটুকু রিস্ক নিয়ে সটটা দিলেন।

এইভাবে ওই বিরাট এলাকা জুড়ে সট নেওয়া হলো। আউটডোরে এদের প্রডাকশনের কর্মীরাও যেন মিলিটারির মতোই কাজ করে। লোকেশনে পৌঁছে ওরা ফটাফট গার্ডেন চেয়ার, ছাতা এসব বের করে বসার জায়গা করে, অন্যরা ততক্ষণ স্টোভে চা বসিয়েছে, খাবার জল, চা স্ন্যাকস রেডি। কোনো অসুবিধাই নেই।

দুপুরে প্যাকল্যাঞ্চও আসে, এদের ইউনিটে খাবারের ক্ষেত্রে সবাই সমান, কারো শরীর খারাপ থাকলে আলাদা মেনু। নাহলে শক্তিসামন্ত, অমিতাভ ক্যামেরাম্যান কুলি লাইটম্যান সব একই খাবার খান।

মিলিটারিদের যাতায়াত এপথে খুবই। মিলিটারির জওয়ানরা গাড়ি থামিয়ে শুটিং দেখতে আসে ক্ষণিকের জন্য। ওরা এই স্টান্টম্যানদের ফ্যান। ফাইট মারার শেঠীই ওদের নায়ক। শেঠীজিকেই ওরা অভিনন্দন জানিয়ে যায় বেশি।

সেদিন সেই কালীঝোরা বাংলোয় শুটিং চলছে। আকাশ মেঘলা। তবু জেনারেটার চালিয়ে আলো দিয়েই শুটিং চলছে। অবশ্য বোম্বাই-এর নটরাজ স্টুডিতেই এরা পুরো কালিঝোরা বাংলো তিস্তার পাহাড়ের সব আভাসই এনেছিলেন।

সেই বাংলোর চত্বরে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল যেন কালীঝোরা বাংলোতেই এসেছি। সেই জাদুবাংলোতেই ছবির বেশির ভাগ দৃশ্য বর্ষারাতে রাখীকে আক্রমণের দৃশ্য সবই নেওয়া হয়েছিল। তবু আসল বাংলোতেও কাজ হয়েছিল কিছুদিন। তাই আসল নকল একাকার করা সহজ হয়েছিল।

লাঞ্চের পর অমিতাভ বিশ্রাম নিচ্ছে একটা ঘরে। হঠাৎ শিলিগুড়ি থেকে গাড়িতে আট-দশজন মহিলা এসে হাজির। ওরা নাকি স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মীদের মিসেসের দল। একজন দলনেত্রীকেও দেখলাম। তিনি চড়াই ঠেলে বাংলোয় উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন তিনিটি কোথায়? সেই অমিতাভ বচ্চন?

সহকারী পরিচালক প্রভাত রায় বলে তিনি ওঘরে একটু ঘুমোচ্ছেন।

মহিলা গলা একপর্দা উপরে তুলে বলে। —ঘুমুচ্ছেন? দেশের লোকের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে নিজে ঘুমোচ্ছেন? কই—কোথায়? ধ্যাৎ—

বাধা দিতে প্রভাতকে ঠেলে দরজা থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রমীলা বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়ল অমিতাভের ঘরে। অমিতাভেরও ঘুম তখন ছুটে গেছে ওদের সমবেত আক্রমণে।

অমিতাভ, আমজাদ, অসিত সেন আমরা প্রথম দু'একদিন রাতে হোটেলের ডাইনিংরুমে খেতে আসতাম। অমিতাভ খাবার ব্যাপারে খুবই সংযমী। মদ্যপান করতেন না, প্রায় কুড়িদিন পাশাপাশি ঘরে কাটিয়েছি, দেখিনি মদ খেতে। সিগ্রেটও খেতেন না। আমজাদও মদ্যপান করতেন না। তবে সব সময়ই হাতে চায়ের লিকার ভর্তি গ্লাশ থাকত। দিনে নিদেন পক্ষে তিরিশ কাপ চা খেতেন।

তবে খাবার বেলায় দেখেছি অসিত সেন খুবই খাদ্যরসিক। চারজনের জন্য চারটে আইসক্রীম এসেছে। তিনজন খেলেন না। অসিতবাবু বলেন আমাকেই দে।

শক্তিবাবু বলেন তুই খেয়েই মরবি।

অসিতবাবু নির্বিকার, শিলিগুড়ি শহর ধনীদের শহর। টাকা এখানে একাশ্রেণীর

হাতে প্রচুর। কাঠ—চা—হোটেল ব্যবসা আর সর্বোপরি নেপালের থেকে নানা বিদেশী মালের অন্ধকারের ব্যবসাতে এক শ্রেণীর হাতে অফুরান পয়সা।

তাদের অনেকেই এসে বোম্বাই নায়ক-নায়িকাদের জন্য ভিড় জমাতে শুরু করে তার জন্য ডাইনিংহল, বারে তারাও ঘটা করে, হৈ চৈ করে।

তাই অমিতাভ আমজাদদের ঘরেই খাবার আসে। আমি শক্তিবাবু, আর আলোবাবু রাতে শুটিং-এর পর স্নান সেরে শক্তিবাবুর ঘরেই বসি, ওখানেই রুম সার্ভিসকে খাবার অর্ডার দিই, আমি দিশী রুটি সব্জি, ডাল মাছ, কেউ নেন চিকেন চাউমিন, চিলি চিকেন, কেউ বিরিয়ানী কষা মাংস, ফুট স্যালাড সবমিলিয়ে আমরা খাবার ভাগ করে নিই। শক্তিবাবু একদিন গোটা দশেক সবশুদ্ধ আইটেম দশটা প্লেটে সাজিয়ে বসেন।

—আজ দশটা প্লেট সাজিয়ে খেতে বসছি—আমি বলি তাহলে আরও কিছু আনিয়ে একডজনই করে দিই। শক্তিবাবু বলেন, তা নয়। বুঝলেন যেদিন খেতে পারতাম, খাবার বয়স ছিল, সেদিন এসব চোখেও দেখিনি। আজ খাবার সাধ্য নাই—শুধু দেখছি। জানেন চার পয়সার উপল (ঘুখনি) কেনার জন্য দুমাইল পথ হেঁটে যাতায়ত করেছি বাস ভাড়া বাঁচাতে।

মাস্টারি ছেড়ে এলেন ফিল্ম লাইনে থার্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পরিচালক হয়ে। তিরিশ টাকা মাইনেতে তখন বোম্বেতে থাকতে হত। প্যান্ট জামাও বেশি চাই। ফিটফাট থাকার জন্য রোজই রাতে ফিরে কাঁচো, ইস্ত্রি করো।

এই সময় কানপুরের এক দারোগা বেশ কিছু অর্থ রোজকার করে কানপুরের কোন বাঙালিকে নিয়ে বোম্বে এলেন। ছবি বানাবেন। তিনিই লেখক। বলেন এই সা ধুস্‌সা বানায়েনা, কোই হিলানে নেহি সকেগা। এমন মজবুত কাহিনী তৈরি করতেন তিনি যে কেউ নড়াতে পারবে না। তিনিই আশা দিলেন শক্তিবাবুকে—তুম্‌কো ডিরেক্টার বানায়েগা। শক্তিবাবু বলেন—বরাত জোর, সেই অটল কাহিনীও লেখা হয়নি, ছবিও হয়নি।

ওর প্রথম ছবি 'পাগলা কাঁহিকা' কিশোরকুমার তার নায়ক অশোক কুমারকে আজও শক্তিবাবু অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা করেন, অশোক কুমারও শক্তিবাবুকে স্নেহ করেন ছোট ভাই-এর মত। ওর ছবিতে সুযোগ পেলেই দাদামণিকে ব্যবহার করেন।

তেমনি কিশোর কুমারও ছিলেন শক্তিবাবুর কাছের মানুষ। নায়ক করেছিলেন তিনি ওকেই। পরে তাঁর বহু ছবিতে শক্তিবাবু কিশোর কুমারকেই সেকালের শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিচিত্র ধরনের মানুষ এই কিশোর কুমার। বাড়িতে নানা রকমের গাছ করেছিলেন তাদের যত্ন করতেন। কথাও বলতেন গাছেদের সঙ্গে। পার্টিতে বিশেষ যেতেন না। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। গান, পড়াশোনা গাছাগাছালি কুকুর নিয়েই থাকতেন। আমি একবার প্রশ্ন করেছিলাম বাড়িতে অবসর

সময়ে কী করেন? তিনি বলেছিলেন গভীরভাবে—ভগবানের সঙ্গে কথা বলি। ওকে আর ঘাটাই না। খুবই খেয়ালী মন চাইল কোন পরিচালকের ছবিতে ঠিকমতো গেয়ে দিল। পছন্দ না হলে গাইবে না। দেখাও করবে না কারোও সঙ্গে।

একদিন অশোক কুমার গেছেন ওর বাড়িতে। কিশোর কুমারের ড্রাইভার কাম পি-এ রহমান খবর দেয় দাদামণি এসেছেন।

কিশোরকুমার তখন অন্যজগতে। বলেন বলে দে বাড়িতে নাই, রহমান চেনে মালিককে। তাই সেই কথাটাই জানায় দাদামণিকে। পরে কিশোরের খেয়াল হয়—কে এসেছিল?

—দাদামণি?

—তাকে তুই ওইসব বলেছিলি, আহাম্মক, গাড়ি বের কর

গাড়ি নিয়ে জুহু থেষক চেম্বুরে ছুটে আসেন কিশোর কুমার।

তখনও আমরা রয়েছি সিনক্লেয়ার হোটেলে। একদিন সন্ধ্যায় সত্যজিৎবাবু তার গুপী গায়েনের শুটিং-এর জন্য ইউনিট নিয়ে এসেন হোটেলে। এখানেই উঠেছেন।

সেদিন সকালে আমরা শুটিং-এ বের হবার জন্য তৈরি। গাড়িতে উঠব। আমি শক্তিবাবু আলোবাবু যাতায়াত করি একটা গাড়িতে। দেখি লাউঞ্জে সত্যজিৎবাবুও ইউনিট নিয়ে তৈরি ওরাও বের হবেন লোকেশনে। সত্যজিৎবাবু এর আগে ওর দু'একটা ছবির শুটিং-এর জন্য জি-পি-ওতে এসেছেন। আমার উপর অফিস থেকে ভার পড়ত সত্যজিৎবাবুর চাহিদামতো অফিসের বিভিন্ন কাজের ছবি যাতে দরকার মতো নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দিতে।

সেই সুবাদেই পরিচয় হয়েছিল আমার লেখার খবরও জানতেন। সে সব বেশ কিছু দিন আগেকার ঘটনা। দেখা হতে নমস্কার করলাম উনিও নমস্কার করলেন। ওদিকে ছিলেন রবি ঘোষ, ওর প্রধান সহকারী মেঘে ঢাকা তারার পুণু দাশগুপ্ত। ওদের সঙ্গে কথা বলে গাড়ি আনতে বলে গেলাম।

সেদিন কাছাকাছি শুটিং ছিল। তাই দুপুরে আমি হোটেলেই ফিরছি। ডাইনিং হলে গিয়ে দেখি সত্যজিৎবাবুই এবার নিজে এসে বলেন।

—সকালে আপনি নমস্কার করলেন, আমিও নমস্কার করলাম। তখন ঠিক স্মরণ করতে পারিনি, পরে রবিবাবুর কাছে আপনার কথা শুনে আপনাকেই খুঁজছিলাম। দেখা হয়ে গেল।

আপনাকে একটু দরকার। আমিও অবাক হই। উনি বলেন। —আমার পরের ছবি হীরক রাজার দেশের জন্য একটা লোকেশন খুঁজছি, আমার ক্যামেরাম্যান সুধেন্দুবাবু বললেন আপনি যাযাবরের মতো ঘোরেন বনে পাহাড়ে, আমার একটা রুক্ষ পর্বত ঘেরা জায়গা একটা গুহা মত, আর মাঝে একটা জলাশয় এমনি লোকেশন চাই। সৌমিত্রবাবু বলছিলেন দণ্ডকারণ্যে এমন ঠাই আছে।

এর আগে দণ্ডকারণ্যে আমি দণ্ডকারণ্য ডেভেলাপমেন্ট অথরিটির সৌজন্যে মাসাধিক কাল দূর-দূরান্তে ঘুরেছি ওর কিছু গুহাতে দেখেছি, তাই জানাই দণ্ডকারণ্যে বোরাগোহালুকেভ আছে, তবে তা বিশাল। এমন ছোট রুক্ষ পাহাড় ঘেরা ঠাই, জলাশয় এসব একত্রে পাবেন না। অন্য একটা গুহা আছে সে মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্যে খুবই দুর্গম। বিপজ্জনক শবরী নদী পার হয়ে দেড় কিলোমিটার বন পাহাড়ের পায়ে চলা পথে যেতে হবে। আর একটা গুহা আছে জগদলপুরে কুড়ি কিলোমিটার দূরে, সহস্রধারা ফলস্-এর কাছাকাছি। তবে যা চাইছেন তা পাবেন না। গুহাতে কাঠজ্বেলে ঢুকতে হয়, টর্চও চলে জলাশয় নেই।

সত্যজিৎবাবু বলেন অমনি ঠাই জানা নেই? অযোধ্যা হিলস্-এ যাবো, যদি পাই। ওর কথায় বলি তাহলে একটা জায়গা দেখে নেবেন, রঘুনাথপুরের কাছে সত্যজিৎবাবু বলেন দাঁড়ান মনে থাকবে না। আমি খেরোর খাতা আনি ওতেই সব নোট করে নেব।

উঠে নিজের ঘর থেকে লাল খেরোর উপর করি বাঁধানো একটা সুন্দর খাতা এখন এবার নোট করতে শুরু করেন। আমি বলি —রঘুনাথপুরে বাসস্ট্যান্ড-এ গিয়ে বাঁদিকে আদ্রা রোড ধরে গাড়িতে পাঁচ মিনিট গেলেই দেখবেন জয়চণ্ডী পাহাড়। রুক্ষ একশিলার পর্বত—তারপরই রুক্ষ পাহাড়। ওর মধ্যে গেলে দেখবেন প্রায় গোল হয়ে রয়েছে সেই পাহাড় শ্রেণী, মধ্যে একটা ছোট জলাশয়ও আছে, গুহাও পাবেন। জায়গা দেখুন। হয়তো আপনার কাজে লাগবে।

সত্যজিৎবাবু মন দিয়ে সব লিখে জেনেও নিলেন, বলেন ছবির লোকেশন একটা ভাইটাল ফ্যাক্টার।

ছবির লোকেশন ছবিকে একটি নতুন মাত্রা এনে দেয়। সেবার সারাঙ্গার বন পাহাড মাইনস্-এ গেছি আমার একটি ছবির শুটিং, কিরিবুরু পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফিট, পাহাড়ের শীর্ষদেশে বিশাল সমভূমি, চারিদিকে ঘন বনের মাঝে আয়রন ওর মাইন, স্টাফ কলোনি, মাত্র দুতিনটে গেস্টহাউস ওখানে একটা ভালো বাংলো আছে কয়েকখানা মাত্র ঘর।

আমি, রঞ্জিত মল্লিক, রবি ঘোষ পরে গেছি। ঘরের টানাটানি রঞ্জিত মল্লিক বলেন আমি শক্তিদা একঘরে থাকছি।

রবিকে অন্য ঘরে ঢোকানো হল। পনেরো দিন রঞ্জিতবাবুর সঙ্গে একঘরে বাস করে দেখেছিলাম এত বড় শিল্পী তবু কত সহজ, আনন্দময় চিরতরুণ। শিল্পীদের নানা বাহানা দেখেছি, রঞ্জিতবাবুর ওসব নেই। রাতগভীরে খোলা জিপেই আমাদের সঙ্গে বনে ঢুকতেন বাঘ, বুনো হাতি, বাইসনের পাল দেখতে, শিকারি বিস্টু দত্তের বন্ধুই হয়ে গেল।

বোম্বের বাপ্পা করছিল এক আদিবাসী তরুণের রোল। সেই চরিত্রকে আমি

দেখেছিলাম আর রঞ্জিতবাবু এক আপনভোলা সুরপাগল ইনজিনিয়ার। আদিবাসী বস্তিতে শুটিং হচ্ছে। বাপ্পা এমনিতেই কালো, ভারি চেহারা, আদিবাসীর মেকআপে মানিয়েছে দারুণ। বসতির ঝুড়ি সাধারণী ওকে ছেলের মতো ভালোবাসে। বাপ্পাকে বলে তু থাক, তুকে জমিন দিব, ঘর দিব, বিহা দিব।

এতকিছু দেবে শুনে প্যান্ট পরা ইনজিনিয়ার-বেশী রঞ্জিত মল্লিক বলে—আমাকে কিছু দেবে না? আদিবাসী বুড়ি জবাব দেয়—তু দিখু আছিস, তুকে কুছু দিব নাই। উকে দিব।

এমন সময় বিস্টুবাবুর ছোট ছেলে জিপ নিয়ে হাজির। ওদিকে ঠাকুরাণী পাহাড়ের নীচের বনে একটা দাঁতাল আহত হাতিকে দেখা গেছে, রয়েছে ওখানেই।

রঞ্জিতবাবু আমরা ছুটলাম হাতি দেখতে, ক্যামেরাও নিলাম সঙ্গে যদি হাতির কাছের ছবি মেলে। এসে দেখি বিশাল আহত হাতিটা বনের মধ্যে ক্যামেরাম্যান ধ্রুবজ্যোতি ক্যামেরায় জুম করে ছবি নিচ্ছে। রঞ্জিতবাবু জিপ থেকে নেমে জিপের একটা রড নিয়েই বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন হাতি আক্রমণ করলে ওই অস্ত্র নিয়েই লড়বেন। গভীর বনের মধ্যে কলোনি খাবার ঠিক রুচিমত জুঠত না। পাউরুটিতে কমডেনসড্ মিল্ক লাগিয়ে ব্রেকফাস্ট হত। রঞ্জিতবাবুই ওটা আবিষ্কার করেছিলেন।

রাতে গাড়ি নিয়ে কলকাতা ফিরছি, বন পাহাড়ের পথ। রবিবাবুই একা রাতভর গান গেয়ে, হৈ চৈ করে ওই বিপদসঙ্কুল পথ যাত্রাকেও আনন্দময় করে তুলেছিলেন।

ওই বনবাসের কষ্টের জীবনে রঞ্জিতবাবুকে নতুন করে চিনেছিলাম। একটা সম্পূর্ণ ভদ্রলোককেই দেখেছিলাম।

আগে অনুসন্ধানে একটা শিকোয়েন্স ছিল, সেটার জন্য শিল্পীদের নিয়ে গিয়েও শুটিং করা যায়নি। এবার হোটেলে বসে আলোচনা করে সেই সিকোয়েন্স পুরো বাদই দিয়ে শুটিং করা হল। অনুসন্ধানের আউটডোর করে ওরা ফিরে গেলেন।

আমি ফিরে এলাম কলকাতায়।

অবার সেই অফিস, লেখালেখি। কিন্তু সাহিত্যের জগতে একটা শূন্যতা আসছে, তারাশঙ্করবাবু ছিলেন সাহিত্য সংসারের অলিখিত কর্তা।

তখন সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগ ছিল, ছিল একটা মেলবন্ধন। বইপাড়ায় আসতেন সকলে, যোগাযোগ ছিল। ছিল প্রীতির বন্ধন।

ক্রমশ মাসিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকাগুলো উঠে গেল প্রায় সাহিত্যের বাজারে এবার এলেন দৈনিক পত্রিকার কর্ণধারদের অতীতে প্রবীণ দিকপাল সাহিত্যিকদের কেউই দৈনিকপত্রিকার পৃষ্ঠাপোষকতা পাননি। তাঁরা নিজেরা কস্ট সহ্য করে সাহিত্যকে ভালোবেসে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। পেয়েছেন সামান্যই, অন্য পেশায় অন্নসংস্থান করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন নিজের রুচিমত।

এবার দৈনিক পত্রিকা এগিয়ে এল সাহিত্যের বাজারে। মাসিক পত্রিকার পরমায়ু এক মাসকাল, সাপ্তাহিকের ক্ষেত্রে সাতদিন ওই সময় ধরে ওটা টাটকা থাকে। কিন্তু দৈনিকের পরমায়ু একদিনের। পরদিন সেটা বাসী হয়ে যায়, আবার নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাহিত্যের মূল্য চিরন্তন। সেই সাহিত্যকেই এবার ঘাড়ে নিল দৈনিক সমাচার। তারা বেশ কিছু লেখককে তাদের কাজে লাগালেন তার বিনিময়ে তারা পেলেন স্থায়ী ভালো আয়ের উৎস। সংবাদপত্র হয়তো সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সাহিত্যচর্চার যাতে উন্নতি ঘটে তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সুযোগ পেয়ে প্রথমে কিছু মানুষের কাজ হল তাদের এই সুবিধায় যেন অন্য কেউ হাত দিতে না পারে, তাই সেই কজনই যে দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সেইটা প্রচারের কাজেই তারা উঠে পড়ে লাগলেন। তাদের গোষ্ঠীই একমাত্র সাহিত্যের ধারার বাহক। তাদের বৃত্তের বাইরে আর কেউ তেমন নয়।

বাকিরা সাহিত্য ক্ষেত্রে ব্রাত্য। দৈনিক পত্রিকার নিজস্ব একটা চরিত্র আছে। সংবাদ আর সাহিত্য এক নয়। সংবাদের রিপোর্ট লিখতে লিখতে তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মানবিকতা নিজস্ব রীতি হৃদয়বত্তা, অনুভূতি এসব হারিয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে রিপোর্টার সাহিত্যের প্রসার লাভ করতে শুরু করল।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ছিল একটি সম্পদ। পূর্বসূরিদের রচিত ছোটগল্পের ধারাই আমূল বদলে তারা প্রবর্তিত করতে চাইলেন নতুন রীতির গল্প।

কিন্তু সাহিত্যের পাঠকরাই প্রধান বিচারক। তারাই সেই ঘাড়ে চাপানো ওই বিচিত্র লেখাগুলোকে গিলতে চাইলেন না। ফলে বাংলার ছোটগল্পের ঐতিহ্যই হারিয়ে গেল এই তালগোলের মধ্যে।

মাথার উপর থেকে সরে যাচ্ছে সাহিত্যের বটবৃক্ষগুলো। নতুন প্রতিভাকে এরা মাথা তুলতে দেননি। যা দু-একজনকে এনেছেন তাদের অনুগ্রহভাজনদেরই, প্রচার করা হল উনি দারুণ শক্তিশালী লেখক, তাদের প্রচুর ইনামও দেওয়া হল। কিন্তু হাউই-এর মতো একবার দারুণ তোল্লা পেয়ে আসমানে জ্বলে উঠে ফুরিয়ে গেলেন। কিন্তু যে হেতু অনুগ্রহভাজন তাই কৃপাকণা থেকে বঞ্চিত হলেন না।

একবার এক পত্রিকার কর্তাব্যক্তি আমাকে বললেন আমাদের কাগজে আর লিখছ না কেন? লেখা পাঠাও। আমি লেখা পাঠালাম তার কথাতেই, জানতাম এই ব্যূহভেদ করার সাধ্য আমার নাই। তবু পাঠালাম। কয়েকদিন পরই লেখাটা ডাকে ফেরত এল। আমি ইচ্ছা করেই লেখার ভিতরে দিকের দু'একটা পৃষ্ঠা সামান্য গঁদ দিয়ে জুড়ে দিয়েছিলাম। দেখলাম সেগুলো আদৌ খোলাই হয়নি। অর্থাৎ লেখাটি না পড়েই প্রেরকের কাছে ফেরত এসেছে।

আমি সেই কর্মকর্তার কাছে গিয়ে লেখাটা যে অবস্থাতে ছিল তা দেখালাম বললাম—লেখাটা পড়া তো দূরের কথা, দেখাও হয়নি। এমনিই অমনোনীত বলে ফেরত গেছে, এবার বুঝেছেন তো কেন লিখি না।

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বলেন—একি! এইসব হয়?

অথচ একদিন আমার মতো অখ্যাত লেখকের প্রথম দিনের লেখা গল্পকেই নামীদামি পত্রিকার সম্পাদকরা দেখেই ছাপতেন। উৎসাহ দিয়েছেন, ভুল হলে কোথায় ভুল—কেন ভুল তাও বলছেন। সেই সম্পাদকরাও আজ বিরল।

আমার পাড়ায় এক নামী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের এক কর্তাব্যক্তি থাকতেন, তিনি আমার বন্ধুস্থানীয়, প্রায়ই আড্ডাও বসত। কিন্তু তার পত্রিকায় লিখিনি—তিনিও আমাকে লিখতে বলেননি। তবু আমাদের বন্ধুত্ব ছিল। একদিন সকালে আমাদের বাজারে এক হবু লেখক অধ্যাপককে দেখে শুধোই তুমি তো শ্যামবাজারে থাকো, এখানে বাজার করছ?

তার দু'একটা ছোটগল্প কোন পত্রিকায় বের হচ্ছে তাই চিনতাম। তরুণ অধ্যাপক বলে অমুকদাদার ওখানে কাল রাতে ছিলাম ওর লেখার কপি করতে, ওর শরীরটা ভালো নাই। আমিই বাজার করে দিয়ে যাচ্ছি।

সহযোগিতা করুন ভালোই। কিন্তু এসব করলে হবু লেখকের লেখা প্রকাশের কিছু সুবিধা হবে এটা ভেবেই অধ্যাপক এই করছেন। তার লেখাও দু'একটা বের হয়েছিল।

তবে বর্তমানে ইনি সাহিত্য ছেড়ে স্কুল, কলেজের নোট বই লিখে ভালোই আছেন, এত খেটে সাহিত্যের বাজারে টেকা মুস্কিল সেটা বুঝেছিলেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন প্রতিভা তেমন চোখে পড়ছে না। তার আর একটা কারণ আমাদের বর্তমান শিক্ষা? আমাদের সমাজের গার্জিয়ানদের কাছে ইনজিনিয়ার আর ডাক্তার ছাড়া আর কিছু বানাবার স্বপ্ন নেই। মানুষ বানাবার কথা আজকের বিজ্ঞান চেতনা আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে।

সব কৃতী ছাত্রই চলেছে সায়েন্স স্ট্রিমের দিকে। অতীতে বহু কৃতী ছাত্র কলা-ইতিহাস-দর্শন এসব নিয়ে পড়ত। তাদেরই বৃহত্তর অংশ থেকে অধ্যাপনা শিক্ষিকতা সাহিত্যের পথে।

আজ মেধাবী-মননশীল ছাত্ররা চলেছে অন্যপথে। এর ফল হয়েছে কলা বিভাগে শূন্যতা। এটা সহসা চোখে পড়ে না। কিন্তু কালের বিচারে এই শূন্যতাটা প্রকট হয়ে উঠবে। তখন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিউম্যানিটিস' বিভাগের যোগ্য শিক্ষিকও মিলবে না। সকলেই বিজ্ঞানী হয়েছে আর মানুষ? মানুষের যুগ সেদিন ফুরিয়ে গিয়ে আসবে-কমপিউটারের যুগ। যন্ত্রই ছবি একে শিল্প কথাকে বাঁচিয়ে রাখবে, সাহিত্য সৃস্টি করবে কমপিউটার। তখন শিল্পী সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী সমাজে এদের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

অনুসন্ধান-এর ফাইন্যাল প্রিন্ট হয়ে গেছে। সেটা দেখার জন্য বোম্বে যেতে হল। বাংলা প্রিন্টে ডাবিং-এর কাজ চলছে। এর মধ্যে অমিতাভ বাংলায় কিছুটা সড়গড় হয়ে গেছেন, আমজাদ সাহেবও নিজের চেষ্টাতে বাংলা বলছেন। প্রথমে শট্ টেকিং-

এর সময় রোমান হরফে বাংলাটা ক্যামেরা ম্যানের বাইরে একটা বোর্ডে লিখে রাখা হত ওরা দরকার হলে সেটা দেখে নিতেন। ক্রমশ বাংলায় কিছুটা সড়গড় হয়ে গেলেন। নিজেরাই ডাবিং-এ ভয়েস দিচ্ছেন।

বোম্বাই এক বিচিত্র ঠাঁই। অমানুষের সময় দেখেছিলাম বাংলার অতীতের এক নায়ককে, তিনি বাংলা ছেড়ে বোম্বেতে। চলে গেছলেন। হিরো হতে গিয়ে প্রায় জিরোই হয়ে যান বোম্বেতে অবস্থা ভালো নয়, তাকে অমানুষের একটা চরিত্রে এনেছিলেন শক্তিবাবু, পরে ভদ্রলোক আবার কলকাতায় ফিরে বেশ কিছু ছবিতে সাইড রোল করেছিলেন। এখন মারা গেছেন। 'অমানুষ' তাকে আবার সাধারণ সমাজ জীবনে ফিরিয়ে এনেছিল।

অভি ভট্টাচার্যকে দেখলাম বোম্বেতে অনেক দিন পর। বেহালাতে দু'একবার দেখা হয়েছিল, আবার দেখা হল 'অমানুষ'-এর সময়। গ্রাম্য ডাক্তারের চরিত্র করেছিলেন। অনুসন্ধানে করেছিলেন রাখীর বাবার রোল। কার্টার রোডে একেবারে আরব সমুদ্রের ধারে একটা বাড়িতে থাকতেন। একদিন দুপুরে লাঞ্চ-এর নেমন্তন্ন করলেন।

এখন একাই থাকেন। বেশ আড্ডাবাজ মিশুকে মানুষ, মহাপ্রস্থানের পথে ছবিতে একটা টাইপ রোল করে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন, বোম্বেতেও সুনাম আছে। দুপুরে লাঞ্চের পর বান্দ্রা থেকে আমার হোটেলে পৌঁছে দিতে আসছেন নিজের বড় একটা প্লিমাউথ গাড়িতে। কর্মব্যস্ত লিং কিং রোড ধরে আসছি, পাশে সামনের সিটে আমি, অভিদা নিজেই গাড়ি চালাচ্ছেন, সোজা প্রশস্ত মসৃণ রাস্তা। আমাদের রাস্তার মতো খানা খন্দে ভরা নয়। মসৃণ গতিতে ভারি গাড়িটা চলছে, হঠাৎ পাশে চেয়ে দেখি স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে অভিদা চোখ বুজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে গাড়ি যাচ্ছে। লাগলেই বিপদ। অভিদা নিশ্চিন্তে নিদ্রারত।

বলি। অভিদা অভিদা। আমার ডাক শুনে চমকে চাইলেন তিনি। বলেন —না না, ঘুমোইনি। কোনোরকমে হোটেলে এসে পৌঁছলাম। পরদিন স্টুডিওতে দুপুরের লাঞ্চের সময় অনেকেই এসেছে গৌরী প্রসন্নবাবু, সেদিন হৃষিকেশ বাবুও নটরাজে শুটিং করছিলেন। তিনিও এসেছেন। কাল অভিদার গাড়ি চালানোর কথা বলতে ওরা বলেন— অভির গাড়িতে উঠছিলেন? সর্বনাশ। পরে বুঝলাম ওই কর্ম অভিদা প্রায়ই করেন, দু'একবার অ্যাকসিডেন্টও করেছেন ওরা সকলেই অভিদার গাড়িকে পরিহার করে চলেন।

হৃষিকেশ মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় কলকাতাতেই ঋত্বিকের ওখানেও আসতেন। এর আগে ঋত্বিক বোম্বাই-এ ছিল। নিউ থিয়েটার্স থেকে বিমলবাবু বোম্বেতে যাবার সময়ই হৃষিকেশবাবু, ঋত্বিকবাবুরাও ছিল। আর গিয়েছিল কেষ্ট মুখুয্যে। কেষ্ট থাকত কালিঘাটে, সঙ্গীত পরিচালক বন্ধু সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেশী। কেষ্ট

কোর্টে এক উকিলের মুহুরী ছিল। তখন থেকে হাস্যকৌতুক করত, হাত-পা বিকৃত করে একটা হাঁটার বিচিত্র ভঙ্গি করত দারুণ, ওর স্বপ্ন ছিল ফিল্মে নামবে। আমার কর্মস্থল জি-পিও, ওর আদালতের পাশেই। প্রায়ই আসত। সেই কেস্ট একদিন সব ছেড়ে বোম্বে পাড়ি দিল, ওরা ছিল সবাই ভবানীপুর গ্রুপের। হৃষিকেশবাবু মূলত ছিলেন চিত্র সম্পাদক। ফিল্মের শেষ পর্যায়ে ওর কাজ। ফিল্মকে ছেটে কেটে নাটকীয়তা বজায় রেখে পূর্ণ রূপ তিনি দিতেন। মনেপ্রাণে শিল্পী রসবোধ, নাটকের জ্ঞান এসব তার ছিল।

ঋত্বিকও সেখানে বিমল রায়ের ইউনিটে যুক্ত ছিলেন। তার লেখা 'মধুমতী'-র চিত্রনাট্য আজও দর্শকদের মুগ্ধ করে।

বোম্বাই প্রবাসী হিতেন চৌধুরী একটি অতি পরিচিত নাম। পালি হিলের একটি সুন্দর বাংলোয় থাকতেন। পাহাড়ের উপর তবু এখানে আম, কাঠাল এসব গাছ ছিল, ফলও হত। হিতেনবাবুদের অন্যসব ব্যবসা, একটা ইংরেজি পত্রিকাও প্রকাশ করতেন তাঁরা। হিতেনদা আদিবাড়ি বোধহয় গয়ায়, সম্পর্কে উনি অভিদার মামা। তখনও ব্যাচিলার। তার বাড়িতে বাঙালিদের ছিল অবারিত দ্বার।

কয়েকটা ছবিও প্রযোজনা করেছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' বাংলায় করার জন্য নিয়েছিলেন, তিনি পারেননি। পরে ওটা এখানের সরকারকে দেন. গৌতম ঘোষ সেটা ছবি করেছিলেন। হিতুদা ছিলেন দিলীপকুমারের প্রতিবেশী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু. ওর বাড়িতেই দিলীপকুমার সঞ্জীবকুমার-দের দেখেছি। প্রায়ই আসতেন তাঁরা। সুচিত্র সেনও বোম্বে গেলে ওখানে যেতেন। হিতুদা ঋত্বিককে খুব স্নেহ করতেন।

পরে ঋত্বিক কলকাতায় ফিরে আসে. বোম্বের পরিবেশ তার ভালো লাগেনি হয়তো। হৃষিকেশবাবু. কেষ্ট মুখার্জিরা থেকে যায়। কেষ্ট খুবই লড়াই করেছিল. তবে হার মানেনি। নিজের পায়ের তলে মাটি পেয়েছিল। অনেক ছবিতে মাতাল বোকার চরিত্র করে ছাপ রেখেছিল। তার সঙ্গে শটে যদি নামী হিরো হিরোইন থাকত তারাও তটস্থ হয়ে থাকত। তার জন্যে দর্শকদের চোখ এখন তাদের দিকে নয়, ওই কেষ্ট মুখার্জির দিকে ওর অঙ্গভঙ্গি হেচঁকি তখন হলে তুফান তুলেছে।

কেষ্ট জুহুতারা রোডের ওদিকে ফ্ল্যাটও কিনেছিল. বারবার আমাকে যেতেও বলেছিল. কিন্তু আমি সেখানে যাবার আগেই সে নিজেই চলে গেল চিরদিনের জন্য। তার জগতে সে ছিল একক অনন্য।

এই প্রসঙ্গে বাংলোর এক শক্তিমান কৌতুকাভিনেতার কথা মনে পড়ে। তিনি নৃপতি চাটুয্যে। শীর্ষকায় দেহ, জ্বলজ্বলে দুটো চোখ—সবই ওকে প্রভু বলেই ডাকত। ছবি বিশ্বাসের বন্ধু।

ছবি বিশ্বাস মাঝে মাঝে কোন বন্ধুকে নিয়ে বাইরে কাছাকাছি কোথাও গেলেন,

পানভোজনের পর বন্ধুকে সেখানে দেখেই নিজে গাড়ি নিয়ে কেটে পড়তেন পরে বন্ধু অনুমান করলে হেসে বলতেন প্রাকটিক্যাল হোক 'সেদিন নৃপতিকে নিয়ে ছবিবাবু গেছেন ডায়মন্ড হারবারের দিকে। দুই বন্ধুতে পান-ভোজনও হয়েছে। তারপর ছবিবাবু কোন ফাঁকে টুপ করে নৃপতিকে না জানিয়ে কেটে পড়েছেন। আজ নৃপতির সঙ্গেই ওই জোক করেছেন, বুঝবে মজা। খুশিমনে ছবিবাবু বাড়ি ফিরে গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকবেন পিছনের হুট থেকে কার সাড়া পেয়ে চাইলেন। আধ ঢাকা হুটের নীচে নৃপতি গুড়িশুড়ি মেরে রয়েছে। নৃপতি বলে ঢাকনাটা খোল, নামি।

সবাইকে ঠকালেও ছবিবাবু নৃপতিকে ঠকাতে পারেননি। হুট খুলে বের করেন প্রভুকে।

নৃপতিবাবু একটা আধা বস্তিতে থাকতেন। সদানন্দ পুরুষ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, কাজ দিলে ভালো, না দিলে তাও ভালো। অল্পতেই তৃপ্ত। আপনজন সংসারে কেউ নেই, তাই তাঁর কাছে বসুধৈব কুটম্বকম আশ্রয় কখনও এর কাছে কখনও ওখানে, কখনও ওই বস্তিতে। সঙ্গী বলতে একটা বেশ বড় তেজী মোরগ। ইয়া লাল ঝুঁটি, গলা ফুলিয়ে পৌরুষভরা কণ্ঠে হাঁক পাড়ত নধর চিকন দেহ।

প্রভু বলতেন একদিন কিছু দমকা টাকা হাতে এল, ভাবলাম মুরগীই খাবো. বাজার থেকে ছোট সাইজের একটা মুরগি কিনে আনলাম, নিজে কেটে মাংস বানাবো। কাটবার সময় বাচ্চা মোরগটার চোখে চোখ পড়ল, কেমন করুণ নয়নে সে চেয়ে আছে আমার দিকে, যেন বলতে চায় আমাকে বাঁচতে দাও। মেরো না।

হাতের ছুরিটা পড়ে গেল। মনে হল আমার মতো বাতিল এক ফেকলু মহম্মদের যদি এই দুনিয়ায় বাঁচার হক থাকে এই তরতাজা মোরগেরও বাঁচার হক আছে, এক মোমোন্টের জন্য ভগবনা বান গিয়ে ব্যান্টার/প্রাণদান করলাম। সেই থেকে ও আমার সঙ্গী হয়েই রয়েছে নিজে নৃপতিবাবু কারণসুধা পান করতেন, নিজের পাত্রে কারণবারি ঢেলে, মোরগার খাবার প্লেটে ও কিছুটা ঢোলে দিলেন, মোরগ বাবাজি ওরুর প্রসাদটুকু বেশ তারিখে খেয়ে এবার বীরদর্পে বস্তির পথে বের হল প্রিয়ার সন্ধানে।

নৃপতিবাবু ছিলেন নিজস্ব ক্ষেত্রে অনন্য। তিনি বলতেন উত্তমকুমারকে—তুই আমি এক শটে থাকলে লোকে তোকে দেখে না, দেখে এই শর্মাকেই।

উত্তমবাবুও সেটা স্বীকার করতেন। এইসব বড় মাপের কৌতুক অভিনেতারা নীরবে শূন্যহাতে ফিরে যাচ্ছেন। আজ তুলসীবাবু একটি বিচ্ছুরিত নাম, তুলসী চক্রবর্তীর কাছাকাছি কোনো অভিনেতা আর এলো না।

এই তুলসীবাবু তখন স্টারের নিয়মিত অভিনেতা। থাকতেন শিবপুরে। ওর প্রথম দিকের মঞ্চে অভিনয়ের কথা অনেক শুনেছি। প্রথম অ্যাপ্রেনটিস অর্থাৎ শিক্ষানবীশ হয়ে মঞ্চে নামতেন নীরব সৈনিকের ভূমিকায়। পোশাক কিছু মিলত একটা বর্ষা

নাহয় টিনের তলোয়ারও জুটত, কিন্তু সৈনিকদের জন্য মোজা জুটত না তুলসীবাবু বলতেন। পায়ে সাদা পিউডি, খড়ি মাখিয়ে আলতার টোপ টাপ দিয়ে পায়ের মোজা একে মঞ্চে নামতাম। জলপানি মাত্র দু'আনা। সুরাসিক লোক, তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। একদিন সকালেই ছটায় এসে সলিলবাবু পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের কাছে আর্তনাদ করে জানালেন বাড়িতে ভোরে কুন সমন্ধীরা মজা করার জন্য কার্তিক ফেলে দিয়ে গেছে। আমি তো ফেলে দিতে গেলাম, গিন্নী বলে পুজো করতে হবে। এত খরচায় ফেলেছে শালারা। সলিলবাবুই কিছু টাকা দিয়ে বলেন পুজোই করুন গে। পরদিন থিয়েটারে গেছি, দেবুদার ঘরে তখন তুলসী চক্রবর্তী চিৎকার করছেন, আর শ্যাম লাহা, ভানু বাড়ুয্যে, অনুপ কুমাররা খুব হাসছে, জানা গেল তুলসীবাবুর বাড়িতে কার্তিক ফেলার কাজটা এদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। তুলসীবাবু সলিলবাবুর কাছে টাকা নিয়ে গিয়ে দেখে বাড়িতে কারা পূজার সব জিনিস ভোগের জিনিস সব পৌঁছে দিয়েছে দোকান থেকে। দোকানদারই এদের নাম প্রকাশ করেছে। তুলসীবাবু বলেন দেবুদা—এব বিচার করতে হবে।

আগেকার কথা, তখন আমি আরপুলি লেনের মেসে। মেসের রাস্তায় একটা গ্যারেজে সোনার গহনার দোকান বসল, সেই কাউন্টারে দেখি একটি যুবককে। পরিচয়ও হল, নাম—জহর রায়। পাটনা থেকে কলকাতায় এসেছে তারা তিনবন্ধুতে কিছু করার জন্য।

ক্রমশ এই তিন মূর্তির সঙ্গে পরিচয় হল ওখানেই। একজন জহর রায়, অন্যজন নব্যেন্দু ঘোষ অপর জন চিত্রশিল্পী। তখন কলকাতায় অজিত চাটুয্যের হাস্যকৌতুকে খুবই নাম। ক্রমশঃ জহরবাবু অজিত চাটুয্যের কাছের মানুষ হয়ে গেলেন। জহরবাবুকে সেই দোকানে আর বেশি দেখা যায় না, স্টুডিও পাড়াতে যানটান, অজিতবাবুর সঙ্গে নানা ফাংশনে হাস্যকৌতুক করে বেড়াচ্ছেন।

নব্যেন্দুবাবুর লেখা ক্রমশ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বের হচ্ছে, বেশ জোরদার কলম, দু একটা উপন্যাস বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মুসলিম প্রধান অঞ্চলে থাকতেন, দাঙ্গার সময় না পাত্তা আমরাও খোঁজ খবর শুরু করলাম, বেশ কিছু পর ফিরে এলেন মালদহে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে। দাঙ্গার সময় আটকে পড়েছিল, এক মুসলমান ভদ্রলোকেই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেই দাঙ্গার পটভূমিকায় তার লেখা ফিয়ার্সলেন একটি তৎকালীন ঘটনার প্রামান্য গ্রন্থই বলা যেতে পারে।

জহরবাবু ক্রমশঃ নিজের প্রতিভায় একটা বিশেষ স্থানে পৌঁছেছিলেন, তার মুলে ছিল নিজের তীক্ষ্ণ রসবোধ, পাণ্ডিত্য আর অমায়িক ব্যবহার। সকলে জানে তাকে কৌতুক অভিনেতা বলে, কিন্তু তার বই-এর সংগ্রহ ছিল প্রচুর। তার নিজস্ব লাইব্রেরিতে বহু মূল্যবান গ্রন্থসম্ভার যা দেখেছি তা বড় বড় পাঠাগারেও নাই। নব্যেন্দুবাবু পাটনার ছেলে, হিন্দিটা জানতেন, তাই তিনি বাংলা সাহিত্য জগৎ ছেড়ে

পাড়ি দিলেন বোম্বেতে ছবির জগতে। সেখানেও সফল চিত্রনাট্যকার হয়েছিলেন। ছবির পরিচালনাও করেছেন পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ভিজিটিং প্রফেসার হয়েছিলেন। এখন বোম্বাইয়েই বসবাস করেন।

অনুসন্ধানের ফাইন্যাল প্রিন্ট দেখানো হল আমাকে। এখনও যদি খামতি কিছু বোধ হয় পূরণ করে নিতে হবে। দেখে মনে হল আমজাদের চরিত্রের প্রাথমিক বিল্ড আপ কিছু থাকলে ভালো হয়।

তাই নিয়ে কিছু সিন লেখা হল। সেগুলোর টেক করে জুড়ে দেওয়া হল একটা ছবিকে নিখুঁত করার জন্য। এরা সবকিছুই করেন, করার সামর্থ্য আছে, এখানে প্রযোজকদের অর্থের অভাবে অনেক সমঝোতা করতে হয়, তাই অনেক ছবি ঠিকমতো তৈরি করাও হয় না। ফলে ছবির যে সাফল্য পাবার কথা তা পায় না।

স্টুডিওতেই পরিচয় হয় আর-এক বোম্বাই প্রবাসী বাঙালি প্রযোজক পরিচালকের সঙ্গে। ইনি প্রমোদ চক্রবর্তী। চাক্কিদা নামেই সুপরিচিত ইনিও নটরাজ স্টুডিওর একজন পার্টনার।

সেদিন লিং কিং রোডে ওর বাড়িতে আনলেন আমাকে। এর আদি বাড়ি ঢাকা জেলার জয়দেবপুরে পরে ভাগ্যান্বেষণে বোম্বাই চিত্রজগতে আসেন বারুদ, আরও বেশ কিছু ছবি সুপারহিট করেছে।

লিং কিং রোডের বাড়ি নয় মার্বেল পাথরের প্রাসাদই। আর ছাদের উপর সুন্দর সাজানো বাগানও করেছেন, কলা-আম-বেদানা, নানা ফল-ফুলের গাছ, সব তার নিজের চেস্টায় করা। সদালাপী ভদ্রলোক। বাড়িতে এখনও বাঙাল খাবার প্রচলন রয়েছে, চপ ইত্যাদির সঙ্গে ঢাকাই কাসুন্দীও এল। প্রভাত রায় প্রথমে প্রমোদবাবুর সহকারী ছিলেন পরে শক্তি ফিল্মস্-এ যান।

বোম্বাই-এ হৃষিকেশবাবুর বাড়িতেও যাই। বেশ সদালাপী আড্ডাবাজ মানুষ। বান্দ্রার সমুদ্রতীরে ওটারস্ ক্লাবের পাশেই ওর বাড়ি। ওর বাংলোর সামনে সবুজ ঘাস ঢাকা লন, কিছু গাছগাছালি ওই লনের ভূপ্রকৃতিকে কিছু 'ইউ' সেপের করা হয়েছে। বাংলোর দিকে খানিকটা উঁচু থেকে ঢেউ খেলানো অবস্থায় নামানো হয়েছে আবার সেই মৃত্তিকার স্তর ঠেলে উঠে গেছে বাংলোর সীমাপ্রাচীর বরাবর। হৃষিকেশবাবুর পোষ্য প্রায় আধডজন বড় মাঝারি ছোট সাইজের কুকুর। তারা চালু মাটির বুক দিয়ে অনায়াসে বাংলোর প্রাচীল বরাবর সারবন্দী বসে অতিথিকে সমস্বরে এমন আপ্যায়ন করেন যে অতিথি ভিতরে যাবে কিনা ভাবতে থাকে।

অবশ্য গৃহস্বামীর ডাক পেয়ে লালু কালু, চকোলেট-এর দল নেমে আসে। অতিথিরও প্রবেশাধিকার মেলে।

হৃষিকেশবাবু খুবই ঘরোয়া ধরনের মানুষ। চিত্রজগতের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। নিজেও প্রচুর ভালো ছবি করেছেন। বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক।

ফলে আড্ডা জমে ভালোই। তিনি একটা ছবির চিত্রনাট্যের কাজে আমার সহযোগিতা চান। বলেন এখানে এসে থামুন কাজ শুরু করা যাক। আমি বলি—আপনার সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হলে আমিই বেশি খুশি হব। তবে এখন শক্তি ফিল্মস্ এর কাজ করছি। এটা শেষ করে ফিরে যাই, তারপর আপনার কাজে আপনার জন্যই আসব। তখন আপনার লোক এখন তো শক্তি ফিল্মস্-এর লোক। হৃষিকেশবাবুও কথাটা শুনে খুশি হন। বলেন—ঠিক বলেছেন, আপনাকে এখনই নয়, পরেই ডেকে নিয়ে বসা যাবে।

'অনুসন্ধান' মুক্তি পেল। বাংলা ছবিতে অমিতাভ, আমজাদ, রাখী প্রভৃতি রয়েছেন, শক্তি ফিল্মস্-এর অমানুষ, আনন্দ আশ্রম তখনও সগৌরবে চলছে। 'অনুসন্ধান'ও অভূতপূর্ব সাড়া জাগাল বাংলা ছবির বাজারে।

অমানুষ-এর বাংলা হিন্দিতে 'অমানুষ' নামই ছিল। তামিলে নামকরণ করা হয়েছিল ত্যাগম্, আর মালয়ালম ভাষায় নামকরা হয়েছিল ইফি উরি মন্যুষ্যম—যার অর্থ—এই একজন মানুষ। সেই সব ভাষাতেও অমানুষ হিট করেছিল মালয়ালম্ এ সুপার হিট। এর পরই এই মূল উপন্যাস নয়াবসত, আর মেঘে ঢাকা তারা মালয়ালমেও অনূদিত হয়েছিল 'মেঘাবৃত্ত নক্ষত্রম্' মালয়ালম ভাষায় কেরালাতে পরিচিতি লাভ করেছিল।

অনুসন্ধান সগৌরবে চলছে, পরপর তিনখানা ছবি সুপার হিট। শক্তিবাবু বলেন পিঠ বাঁচল তাহলে! জানাই মনে হচ্ছে কিন্তু—শক্তিবাবু বলেন দেখুন এসব ছবিতে কেউ আমাদের মালা, শিরোপাও দেবে না। ওই আর্ট ফিল্মের পুরস্কারও দেবে না। সাধারণ মানুষের ভালো লেগেছে এই বড় পাওয়া। কেউ ছবি দেখল না আমরা প্রাইজ নিয়ে বাড়ি গেলাম, সে ছবি করে লাভ কি? এবার নতুন কিছু ভাবুন, পরের ছবির কথা ভাবতে হবে। এবার রাজেশকে নিয়ে বাংলা হিন্দি করব ভাবছি। তখন রাজেশ খান্নার খুবই নাম। তার ছবি মানেই সুপার হিট। বোম্বেতে দেখেছি রাজেশজিকে। শক্তিবাবুর খুবই বন্ধু। বাড়িতেও আসেন।

রাজেশ খান্নার বাংলোতেও গেছি। কার্টার রোডে আরব সমুদ্রের ধারে ওর সুন্দর বাংলো, অনুসন্ধানে উত্তমবাবু আশা করেছিলেন তিনি থাকবেন, কিন্তু শক্তিবাবু অমিতাভের চরিত্রটাকে প্রতিবাদী কঠিন একটি মানুষের চরিত্র করতে চেয়েছিলেন তাই উত্তমবাবুর সম্বন্ধে নীরবই ছিলেন। তাই রাজেশের কথা বলতে বলেছিলেন তিনি। ও জলন্ধরের লালার পুত্র। ভোগী সুখী চেহারা। ওকে নিয়ে রোমান্টিক রোল করানো যেতে পারে। অ্যাংরি ইয়ংম্যান ওকে দিয়ে হবে না। তাই শক্তিবাবু ওই রোলে অমিতাভকেই নিয়েছিলেন।

অচেনা মুখ শেষ হয়ে গেছে। অজিতবাবু নিজের মতেই শেষ করেছেন. আমার কাহিনীর মূল সুর আর নেই। তিনি আমার প্রাপ্যও দেননি। এসোসিয়েশনকে

জানালাম। এসোশিয়েশন শিল্পী, কলাকুশলীদের কোনো অভিযোগ থাকলে শোনেন মীমাংসা করেন। তাই তাদের জানালাম, কিন্তু অজিতবাবু তখন এসোসিয়েশনের মাতব্বর, জানি না কোনো কারণে তারা আমার অভিযোগের কোনো নিষ্পত্তি করতে ঠিক আশা দিতে পারলেন না। অর্থাৎ গ্রন্থকারের চিত্রস্বত্ব তিনি দখলই করতে পারেন—আমিও আইনের আশ্রয় নেবার কথাই ভাবছি সেটাই জানিয়ে দিলাম। ছবি তাতে রিলিজ করা যাবে না। শেষ অবধি প্রযোজক ভদ্রলোক বিপদের গুরুত্ব বুঝে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা মীমাংসা করে গেলেন। ছবি রিলিজ করল—অজিতবাবু ওই বন পাহাড়ের কাজ উড়িষ্যা দৈত্যারি মাইনস্-এ করেছিলেন সুন্দর আউটডোরের কাজ কিন্তু গল্পের মূল সুরই আর নেই। ফলে ভালো কাজ করেও এ ছবি চলে না। আমার দুঃখ প্রযোজকের টাকা গেল, আমার একটা ভালো গল্পের অপমৃত্যু ঘটল।

উত্তমবাবু চলে গেলেন। হঠাৎই। বাংলা চিত্রজগতের ইন্দ্রপতন হয়ে গেল। একটি পূর্ণ মানুষ ছিলেন তিনি। বিরাট মাপের হৃদয়বান মানুষ। বড় জাতের অভিনেতা বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। দেখেছি অমানুষ-এর পর বোম্বাই থেকে তার বড় বড় অফার এসেছিল অনেক। শক্তিবাবুও বলতেন এই সময় বেশ কিছু হিন্দি ছবি করে উত্তমবাবু বেশ কিছু অর্থ রোজকার করতে পারতেন। তবু কেন যে আসছেন না। উত্তমবাবুর কাছে আগে ছিল বাংলা সিনেমা তারপর সময় থাকলে হিন্দি ছবির কথা ভাবতেন, এর মধ্যে বান্দ্রা অঞ্চলে একটা ফ্ল্যাটও নিয়েছেন। বোম্বাই-এ আস্তানা করেও তিনি বোম্বাইবাসী হয়ে যাননি।

একালে কম টাকাতে বাংলা ছবি করেছেন, বাংলা শিল্পীদের কথা ভেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন শিল্পীসংসদ। তার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিজে ছবির পরিচালনা অভিনয় করেছেন অন্যদের নিয়ে, দরকার হলে নিজে ফ্যাংশন করে শিল্পী সংসদের জন্য অর্থ তুলেছেন।

সারা বাংলার দর্শকের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় শিল্পী। ছবিতে উত্তমবাবু থাকা মানেই দুসপ্তাহ তিনিই টানবেন ছবিকে, তারপর ছবির যদি কিছু মেরিট থাকে ছবি নিজে চলবে। দুসপ্তাহের টানে প্রযোজক কিছুটা ছুটবে। আজকের শিল্পীদের মধ্যে কারোও এই গ্ল্যামার নাই। তার দুদিন হাউস ফুল করাবেন এই গ্যারান্টিও দিতে পারেন না। বাংলা চিত্রজগতে একটা শূন্যতাই নামল তখন।

অমানুষ যাত্রা জগতেও খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিল স্বপন কুমারের পরিচালনায়, অভিনয়ের গুণে। কিন্তু যাত্রার দল মালিক আমাকে যোগ্য সম্মান দক্ষিণা দেননি। আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল আমার যাত্রা জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে।

এরপর অনুসন্ধান মুক্তি পাবার মাস তিনেকের মধ্যে কাগজে এক যাত্রার দলের অনুসন্ধান যাত্রা পালার বিজ্ঞাপন দেখে বিস্মিত হলাম। যাত্রার স্বত্ব আমার, কিন্তু

সিনেমার মুক্তির তিনচার মাস পর ওটা যাত্রায় করতে দিলে ছবির ক্ষতি হবে। তাই নৈতিক ভাবে ওটা এখনই দিতে পারি না। যাত্রাওয়ালারা ওই অনুসন্ধানের অক্ষরগুলোতে সিনেমার বিজ্ঞাপনের মতো করে প্রচার করতে চান ওই অনুসন্ধানই করছেন তারা। বিজ্ঞাপনও চলছে যথারীতি।

ওই কোম্পানিকে চিঠি দিয়েও কোনো উত্তর পাই না। হঠাৎ একদিন সকালে যাত্রার দল মালিক তার ম্যানেজারকে নিয়ে বাড়িতে এলেন। 'অমানুষ'-এর বঞ্চনা আমরা মনে ছিল। যাত্রার সম্বন্ধে একটা অনীহাই রয়েছে। সেই ভদ্রলোক বলেন—আমরা অনুসন্ধান করছি।

জানাই—আমি তো অনুমতি দিইনি। ছবিটা সবে মুক্তি পয়েছে এখনই হাটে মাঠে যাত্রায় অনুমতি দেব না। আপনি সামনের বছর আসুন, তখন অনুমতি দিতে বাধা থাকবে না। ভদ্রলোক বলেন—আমার নাট্যকার নাটক লিখে ফেলেছে। এখন পিছোনো যাবে না। আপনি পাঁচ হাজার টাকা লিয়ে লিন—ওই অনুমতি পত্তর দিয়ে দিন। ট্যাকা নগদ দিচ্ছি।

টাকার আমারও দরকার। কিন্তু ওর মেজাজী সুরে কথা শুনে খুশি হলাম না। বলি—শক্তিবাবু সঙ্গে সম্পর্কটা পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে অনেক দামি, পরপর কাজ করছি আমরা ওই সামান্য টাকার জন্য ছবির ক্ষতি করতে পারব না। এবছর অনুমতি দিতে পারব না।

—পারবেন না? ঠিক আছে।

টাকাটা ব্যাগে পুরে বলে—ট্যাকাটা লিলে ভালো করতেন, এটাও গেল, আমরা স্যার নাটক করবই।

আমাকে জানিয়েই বিদায় নিলেন। আমি ওদের বিজ্ঞাপনের কাগজের কাটিংগুলো দিয়ে শক্তিবাবুকে বোম্বেতে চিঠি দিয়ে সবই জানিয়ে দিলাম, অনুমতি ছাড়াই ওরা জোর করে নাটক করছেন তাও লিখলাম।

এর ক'দিন পরই শক্তিবাবু একটা চিঠি পাঠালেন, সেই সঙ্গে ওরা বোম্বে কোর্টে ওই যাত্রা কোম্পানির নামে কুড়ি লাখ টাকার ড্যামেজ স্যুট করে কেস ফাইল করেছেন তার কপিও পাঠালেন। যাত্রা দল মালিকের এবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। ছুটে এলেন আমার কাছে—আমি বলি—আমি তো কিছুই করিনি, ওর ছবির ড্যামেজ হবে তাই উনি কেস করতে চান। এবার শক্তিবাবুর কাছেই যান বোম্বেতে, এসবের আমি কিছুই জানিনা, যা করার উনি করেছেন।

এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল 'অমানুষ'-এর সময়ও। অমানুষ পুরবীতে চলেছে, একদিন সকালে আমার বাড়িতে দুই ভদ্রলোক এলেন, তারা এসেছেন ঢাকা থেকে। তাদের একজন ঢাকার 'মুকুল' সিনেমাহলের মালিক, বাংলাদেশে ছবির প্রযোজনাও করেন অন্যজন বাংলাদেশের এক পরিচালক, তিনি রাজ্জাক সাহেবকে নিয়ে অনেক

সফল ছবি করেছেন। রাজ্জাক সাহেব টালিগঞ্জের ছেলে, ইনজিনিয়ার বন্ধু পরিতোষবাবুর মুখেও ওর ছেলেবেলার অনেক কথা শুনেছি। ওর বাল্যবন্ধু ছিল, এখন বাংলাদেশের উত্তমকুমার।

পরিচালক প্রযোজক ভদ্রলোক 'অমানুষ' ছবি দেখে মুগ্ধ। রাজ্জাকও এছবি দেখেছেন, তিনি এই রোলটা করতে চান, তাই ওরা বাংলাদেশে এটা রিমেক করতে চান ঢাকায়। দুই ভিন্ন দেশ, টাকার লেনদেনে অনেক জটিলতা আছে। আর বাংলাদেশ ইনটারন্যাশন্যাল কপিরাইট অ্যাক্টের আওতায় পড়ে না। ওরা এখানের বই বিনা অনুমতিতেই ওদেশে ছেপে বিক্রি করে। বাংলার বহু নামী লেখকের বইও ওরা পকেট বুক হিসাবে ছেপে রেলস্টেশনে, দোকানে, স্টিমার, স্টেশনে বিক্রি করে। তাতে প্রকাশকের নামও রাখতে হয়, কিন্তু ওসবই ভুয়ো, আমার বহু বইও এই ভাবে ওদেশে চলে, আমরা কপর্দকও পাই না।

এবার ছবির ব্যাপারেও তাই ঘটতে চলেছে। ওরা একজন বিনা অনুমতিতে ছবি শুরু করলে, মূল লেখক যদি ওদেশের অন্য কাউকে উপহার হিসাবে ওই দেশের চিত্রস্বত্ব কাউকে দেন, যে বিনা অনুমতিতে ওই ছবি করছে সে তখন বিপদে পড়বে। কারণ আইনত স্বত্ব সেই উপহার যিনি পেয়েছেন তাঁর। অর্থাৎ বিপদের পথ ওই একটাই। তাই ওরা অমানুষ-এর চিত্রস্বত্ব উপহার স্বরূপ পেতে চান আমার কাছে, যাতে তারা নিরাপদে ছবিটা করতে পারেন।

শুধোই চিত্রনাট্য, সংলাপ এসব তো দিতে হবে। ভদ্রলোক বলেন ওসব লাগব না। পাই গেছি, পেয়ে গেছেন! সেকি! ওর আসল কপি বোম্বেতে আমার কছে একটা জেরক্স আছে মাত্র। ভদ্রলোক বলেন তিনচার দিন নাইট শোতে পুরবীতে গেছি, চাদরের তলে টেপ রেকর্ডার লই। চারদিনেই পুরা সংলাপ টেপ কইরা লইছি, পুরা স্ক্রিপ্ট এহন আমাগোর হাতে। শুনে চমকে উঠি। ওদেশের বইওয়ালারা—না বলে নেয়, আর মনে হল সিনেমাওয়ালারা জোর করে নেয়। ওদের বাধা দেবার পথ নাই। তাছাড়া 'অমানুষ' অন্য দেশে আমার মাতৃভাষায় হবে, দর্শকরা দেখবেন তাই অনুমতিপত্র দিলাম।

এর মধ্যে একটা গল্প লিখলাম আশা ভালোবাসা। গল্পটা প্রযোজক শিশির দত্তের ভালো লাগল। তিনি এটাকে ছবি করতে চাইলেন একটু চড়া সুরের গল্প। বাঁকুড়ার বন পর্বত ঘেরা জায়গায় একটি প্রতিবাদী চরিত্রকে নিয়ে কাহিনী। পরিচালক সুজিত গুহ। তখন অমানুষ, অনুসন্ধান হিট করার পর বাংলাতেও হিন্দির বেশ কিছু ছবি হতে শুরু করল। ফাইট অ্যাকসন গান এসব চাই। ফলে বাংলার সঙ্গীত পরিচালকরাও দৌড়লেন বোম্বের গাইয়েদের গান ছবিতে লাগাতে।

তার আগে বাংলা ছবিতে এখানের গাইয়েরাই গাইতেন। তখন শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ, উৎপলা দেবী, হেমন্তকুমার, সুপ্রভা সরকার আরও

অনেক ভালো শিল্পী ছিলেন। তরুণ মজুমদার এদের দিয়েই গাইয়েছেন তাঁর ছবিতে নিশিপদ্ম, মণিহার ছবির গান, অগ্রদূতের সব বিখ্যাত ছবির গান এখানের শিল্পীরাই গেয়েছেন। এবার সঙ্গীত পরিচালকরা ছুটলেন বোম্বের দিকে।

ছবিতে অ্যাকশন চাই—এল বোম্বাই থেকে ফাইট মাস্টার তার দলবল নিয়ে, এতদিন গান পিকচারাইজ করা হত এখানে, এবার হিন্দি স্টাইলে নাচগান চাই, প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের দৃশ্যও দুজনের ঝাঁকি নেত্য চাই। তার জন্য আমদানি করা হল বোম্বের ড্যান্স ডিরেক্টারদের।

গানগুলো তারাই টেক করবে তাদের ঝট্‌কা ঝাঁকি মতো। তারা গানের টেক করেন, পরিচালকের এতে কোনো ভূমিকা নাই। ফাইট হবে হিরোর সঙ্গে ক্লাইমেক্স সিনও শেষ হবে ফাইটে, ওসব টেক করবে ফাইট মাস্টার তার কম্পোজিসন করে। পরিচালন শুধু গল্পের বাকিটুকু শুটিং করবেন। হিন্দির এক প্রযোজক আমাকে বলেছিলেন, সাব রাইটার লোগ স্রিফ থোড়াই লিখতা হ্যায় গানা রাহতা সাতঠো শোচিয়ে পয়ত্রিশ মিনিট গিয়া, ফাইট হোগা করিব বিশ মিনিট। হম প্রডিউসার হয়, এতনা খর্চা করতা হমভি মোর দিমাগসে কুছ ডালেগা পিকচার মে, সো শোচিয়ে পন্দোরা মিনিট নাচাভি রহেগা—পাকড় লিজিয়ে পাঙ্গারা মিনিট কুল মিলাকে পঁচাশি মিনিট-নব্বুই মিনিট, দেড় ঘণ্টা চলা গিয়া, বাকি এক ঘণ্টা স্টোরি ডায়ালগ লিখতা হ্যায় রাইটার লোগ।

ইস্‌লিয়ে এত্‌না বাহানা?

ওর হিসাবটা চমকপ্রদ হলেও এখন সত্যে পরিণত হয়েছে।

সুজিত গুহ তরুণ পরিচালক। বেশ কিছু পরিচালকের কাছে কাজ করেছেন। ছবির টেকিং ভালোই করেন। বোম্বাই-এর প্রতি তার একটা নীরব শ্রদ্ধা আছে, তাই ঠিক হলো এ ছবির বেশ কিছু শুটিং বোম্বেতেই করা হবে। বোম্বের ফিল্ম সিটি, আশপাশে ফাইন, অ্যাকসন, গান এগুলোও ওখানে করা যেতে পারে।

এ ছবির হিরো প্রসেনজিৎ, আর হিরোইন করা হল রামায়ণের সীতার ভূমিকায় নামকরা অভিনেত্রী দীপিকাকে। সঙ্গে নেওয়া হল বোম্বাই-এর প্রবাসী বাঙালি কন্যা পুনম দাশগুপ্তকে। এছাড়া রইলেন উৎপল দত্ত ও অন্যরা।

শক্তিবাবুর পরিকল্পনামত রাজেশকে নিয়ে একটা গল্প ভাবা হলো। গল্পটার নাম ছিল 'কণ্ঠস্বর'। তার চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছে। হিন্দি বাংলাতে হবে। রাজেশকে নিয়ে সেইটা হবে বাংলা ছবি।

শিশিরবাবুর বোম্বেতে প্রায় সতেরো দিন শুটিং করতে হবে। এখানের পুরো ইউনিট নিয়ে ওখানে শুটিং করার। ঘটা অনেক। তাছাড়া এরা সকলে ওখানে যেতেও চান না। তাই শিশিরবাবু আমাকে ধরলেন শক্তি ফিল্মস্‌-এর ইউনিট দিয়ে যদি ওখানে শুটিং করানো যায় তাহলে সুবিধা হয়।

শক্তি ফিল্মস্-এর ক্যামেরা শব্দগ্রাহক মেসিন, এসব চার-পাঁচটা করে আছে, আলো-এডিটিং সবই নিজস্ব। তখন ওদের দুটো ইউনিট। একটা শক্তিবাবুর নিজের, অন্যটা তার ছেলে অসীমের। অসীম তখন গুলশান নন্দের উপন্যাস পালে খার শুটিং করছে।

কিছুদিন আগে শক্তিবাবু আরব সমুদ্রে 'গ্রেট গ্যাম্বলার' ছবির সমুদ্রে একটা বেজিং ফাইটিং-এর দৃশ্য টেক করার সময় পিছলে বোট থেকে ক্যামেরা সমেত আরব সাগরে পড়ে যান—ক্যামেরা তলিয়ে গেল, শক্তিবাবু ওই বাঁকুড়া কলেজ ট্যাঙ্কে রোজ এপার- ওপার করার অভিজ্ঞতায় সমুদ্রে ভেসে ছিলেন, পরে তাকে তোলা হয়। ক্যামেরার জন্য ডুবুরি নামানো হলো। কয়েক লাখ টাকার ক্যামেরা কিন্তু তার হদিশ মেলেনি সত্তর ফিট জলের তলে। আবার অন্য ক্যামেরা এনে তক্ষুণিই শুটিং চালু করেন। শক্তি ফিল্মস্-এর ইউনিট যন্ত্রপাতি দিয়েই ওখানে শুটিং-এর ব্যবস্থা করা হবে জানালেন শক্তিবাবু, শিশিরবাবুরা তবু যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ হয় তার জন্য আমাকেও তুলে নিয়ে গেলেন। শক্তিবাবু বলেন—কি ব্যাপার! বোম্বাই বেড়াতে এলেন?

জানাই—ওরা ধরে এনেছে। তবে এই ফাঁকে আমাদের কাজও হবে। রাজেশজীর গল্পের চিত্রনাট্যও করে এনেছি। ওদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এটাও করা যাবে।

এখান থেকে ক্যামেরাম্যানই গেছলেন, আর চার পাঁচ জনে কলাকুশলী। বাকি শক্তিবাবুর স্টাফ। তারা আমাকে চেনে ওরাই কাজ করছে কখনও ফিল্ম সিটিতে, কখনও চায়না ক্রিকের আমবাগানে। ফিল্মসিটিতে প্রসেনজিৎ যে ভাঙা ঘোড়ায় চড়তে পারে তাও দেখলাম।

এইখানেই একদিন একটা দারুণ দুর্ঘটনা হতে হতে রয়ে গেল। দুতিনজনকে নিয়ে উৎপলবাবু জিপে করে যাচ্ছেন পাহাড়ের পথে, একটা ক্যালভার্ট, বেশ উঁচুতে, নীচে বেশ ঘন বন জিপটা ওই ক্যালভার্টের কাছে গিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উৎপলবাবু সমেত পড়লো নীচে, ছেলেরা উৎপলবাবুকে জড়িয়ে ধরেছিল যাতে তিনি ছিটকে না যান। আশ্চর্যের কথা জিপটা বিশ-পঁচিশ ফিট শূন্য পথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে নীচে পড়লো সেই ঘন বন ঝোপের নরম গদিতে। সেই ঘাসেই আটকে রইল। ঝাঁকুনি ছাড়া আর কারো কোন চোটও লাগেনি। বন্য প্রকৃতি যেন হাত পেতে ওদের চরম সর্বনাশ থেকে বাঁচালো।

পরদিন খবরটা শুনে শক্তিবাবু এলেন ফিল্মসিটিতে সঙ্গে আমিও রয়েছি, উৎপলবাবু শুটিং করছেন, শক্তিবাবুকে দেখে গম্ভীরভাবে বলেন কালকের ঝটকায় আমার ব্রেনে গোলমাল হয়েছে। আমার কামড়াতে ইচ্ছে করছে। সেদিন সত্যিই একটা বড় দুর্ঘটনা থেকে বেঁচেছেন উনি, ইউনিটের ছেলেরাও।

রাজেশ খান্নাকে নিয়ে মুস্কিল। চেস্টা করেও তেমন বাংলা বলতে পারছেন না। নিশিপদ্ম দেখে বাংলার শিল্পীদের সম্বন্ধে তার একটা ধারণা হয়েছিল, উত্তমকুমার

জহর রায় সাবিত্রীর অভিনয় তাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই মনে হয় তার সংশয় ছিল বাংলার তৎকালীন অভিনয়ের মানকে ছাপাতে পারবেন কিনা, তার বাংলা ছবিতে কাজ করার অনীহার এও একটা কারণ হতে পারে। তাই তিনি ঠিক রাজি হলেন না। তাই সেই ছবি জয়াপ্রদাকে নায়িকা করে হিন্দিতেই করা হল ছবির নাম আওয়াজ।

শক্তিবাবুর কাছে তেরো নম্বরটাই যেন লাকি নাম্বার। তার জন্মদিন তেরোই জানুয়ারি, তার বাড়ির নম্বরও তেরো নম্বর মীরাবাস, অমানুষ যখন নামকরণ করা হয়নি, এটাকে বলা হত তেরো নম্বর প্রডাকশন, সেটা বাংলা ছবির একটা ল্যান্ডমার্ক হয়েছিল। তেমনি বাংলা অ ইংরেজিতে 'এ' এই অক্ষর দুটোর উপর তার একটা দুর্বলতা ছিল। কেন জানি না নাম খোঁজার সময় এই অক্ষর দুটোর উপরই প্রাধান্য দিতেন, আরাধনা, অমর প্রেম, আজনভী, অনুরাগ, অমানুষ, আনন্দ আশ্রম, অনুসন্ধান, আওয়াজ, অন্যায় অবিচার-এর মধ্যেই সেটার পরিচয় মেলে।

'আওয়াজ' বাংলায় করা গেল না। হিন্দিতেই হলো। বাংলা ছবি করার জন্য জয়াপ্রদা খুবই আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু বাংলায় তার ছবি এল না।

শক্তিবাবু তাই এবার মিঠুনকে নিয়েই হিন্দি বাংলা ছবি করতে চান। তাই নিয়েই এবার ভাবনা চিন্তা শুরু হলো। মিঠুন তখন খুবই জনপ্রিয় শিল্পী। হৈ চৈ নিয়েই থাকে। মিঠুন চায় ভালো বাংলা ছবি একটা হোক। হিন্দিতে অনেকই করছে।

অনুসন্ধান হিট করার পর রাখীই বারবার বলেন আমাকে—মেঘে ঢাকা তারা আমি করবো। ওটার ব্যবস্থা করুন, রাখীর জীবনও কঠিন সংগ্রামের জীবন। রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে তখন থাকে, এখন ওখানে একটা সুন্দর বাড়িও করেছে। কুপার্স ক্যাম্পে থাকাকালীন অরবিন্দ মুখার্জি আহ্বান ছবি করার সময় সন্ধ্যা রায় ওখানে শুটিং করছিলেন, তিনিই রাখীকে তার কাছে আনেন, তারপর রাখী অজয় বিশ্বাসকে বিয়ে করে বোম্বাই গেলেন। অজয় তখন ওখনে ছবি করছে। এখানে 'মণিহার' ছবি সুপার হিট ওখানে 'সমঝোতা' করল হিন্দিতে। সেটাও ভালো চলেছিল। রাখীও তখন বোম্বাই-এ অভিনয় শুরু করেছে। নিজের প্রতিভায় আর ব্যবহার রাখী সর্বভারতীয় স্তরের শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন।

অজয় বিশ্বাসের সঙ্গে তখন সম্পর্ক নেই।

অজয় ছিল প্রাণখোলা একটি তরুণ। উল্টোরথের প্রসাদ সিং-এর আবিষ্কার, প্রতিভাবান ভালো বলতে কইতে পারে লিখতেও পারে, উল্টোরথে লেখে।

বোম্বাই থেকেও নিয়মিত লেখা পাঠাতো উল্টোরথে। তারপর কী যেন হলো, অজয় কেমন বদলে গেল। ছবির কাজ নাই কেমন হতাশা ঘিরে ধরলো তাকে। বোম্বেতে দ্বিতীয়বার বিয়েও করেছিল। জুহুর ওর ফ্ল্যাটে গেছি। ও দ্বিতীয়বার বিয়ে করছিল প্রদীপবাবুর মেয়েকে। কিন্তু সে বিয়েও সুখের হয়নি।

ভগ্ন মন নিয়ে সেই তরতাজা তরুণটি ফিরে এসেছিল কলকাতায়। এখানের

পরিবেশও তখন বদলে গেছে, নতুন পরিবেশে সেদিনের দৃপ্ত অজয়কে এরা চেনে না। অপরিচিতের মতই হারিয়ে গেছল সেদিনের এক তরতাজা শিল্পী। অজয় আজ নেই। এখন ওই ছায়াছবির মরুভূমির মরীচিকার আকর্ষণে ক্লান্ত বিধ্বস্ত হরিণের আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। শুধু অজয় নয়—আরও অনেককে এই ভাবে ফুরিয়ে যেতে দেখেছি এ ছায়াছবির জগতের যবনিকার অন্তরালের এক করুণ কাহিনী।

রাখীর অনুরোধে আবার 'মেঘে ঢ'কা তারা'র প্রসঙ্গ উঠলো, শক্তিবাবুর সহকারী জ্যোতি রায়কে নিয়ে এবার গেলাম নিজেই হেমন্তবাবুর বাড়ি গীতাঞ্জলিতে। সেদিন হেমন্তবাবু ছিলেন তাঁকে জানালাম যে আপনি এতদিন ধরে 'মেঘে ঢাকা তারা' হিন্দি ছবি করতে পারেননি। ওটা আর এক জায়গায় অফার পাচ্ছি। আপনিই চিঠিতে জানিয়েছিলে যে আপনি করতে পারবে না। ওটা আমি আর কাউকে দিতে পারি। তাই এসেছি আপনাকে জানাতে আর যে এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন সেটাও ফেরত দিচ্ছি।

এবার হেমন্তবাবু বলেন আমি ওই 'রাইট' মুকেশজীকে দিয়েছি, এবার মনে হল শক্তিবাবু সেবার ঠিকই খবর দিয়েছিলেন, হেমন্তবাবু বলেন, মুকেশজী ওটা ওর ছেলে নীতিনের জন্য নিতে চেয়েছিল বার বার বলছিল, তাই সাইনিং অ্যামাউন্ট পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ওকে দিয়েছিলাম ওরাও করেনি, আর টাকাও নিইনি। ওই ভাবেই রয়েছে ব্যাপারটা।

আমাকে ওই চিঠি দেবার পর তিনি আবার অন্যকে দিয়ে দেবেন আমাকে না জানিয়ে এটা ভাবিনি। তবু বলি, যা হবার তা হয়ে গেছে, নীতিন মুকেশ ওই ছবি করবেন না। আমরা টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আপনি নীতিনবাবুকে বলুন উনি টাকা নিয়ে ছেড়ে দেন, ওই ছবিটা হোক।

হেমন্তবাবু কি ভাবছেন শেষ অবধি আমি জানাই হেমন্তবাবু ওই হিন্দি রাইটের জন্য যে টাকা আসবে তার থেকে পাঁচহাজার নীতিন মুকেশকে দিয়ে বাকি সবটাই আপনি নেন, আমি গ্রন্থকার হিসাবে এক পয়সাও দাবি করবো না—লিখে দিচ্ছি, টাকা আমি চাইব না, শুধু চাইব মেঘে ঢাকা তারা হিন্দিতেও হোক। হেমন্তবাবু বলেন—বুঝছি সবই। দেখি কি করা যায়। আমি চেষ্টা করবো যাতে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু পরে কেন জানি না হেমন্তবাবু এ বিষয়ে নীরবই থেকে গেছেলেন 'মেঘে ঢাকা তারা' আরব সমুদ্রের মেঘেই ঢাকা পড়ে রইল। তার মেঘমুক্তি আজও ঘটেনি।

'মেঘে ঢাকা তারা' নিয়ে আর একটা ঘটনাও ঘটেছিল, হঠাৎ এখানের এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেখলাম ফিল্ম ইনস্টিটিউটের একটি কৃতী ছাত্র টি-সি-জন মালয়ালাম ভাষাতে ছবিটি করছেন। স্বত্ব আমার কাছে, কিন্তু তিনি কীভাবে

তা আমাকে না জানিয়ে করছেন জানি না। ঋত্বিকবাবু তখন ওখানের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, তাকেই চিঠি দিলাম টি-সি-জনের ঠিকানা চেয়ে, কিন্তু কোন জবাবই পেলাম না।

তারপর অন্যভাবে চেষ্টা করে কেরালায় মিঃ জনের ঠিকানা বের করে ওকে সব ব্যাপার জানিয়ে চিঠি দিলাম। এর পর মিঃ জনই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা নিজেই মিটিয়ে নেন।

ঋত্বিকবাবু তার চুক্তিপত্রে লিখে গেছেন যে ছবি রিলিজের দশ বৎসর পর ওই বিষয়ে সবরকম স্বত্ব আবার গ্রন্থকারের কাছে ফিরে আসবে। ছবির মুক্তি পাবার তিরিশ বৎসর পর ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ওই ছবির সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য প্রকাশ করলেন এ বিষয়ে আমার কোন সৌজন্যতা সূচক অনুমতি নেবার প্রয়োজন বোধও করেনি। সেই ঘটা করে প্রকাশ অনুষ্ঠানের একটা কার্ড আমাকে দেননি, (অবশ্য 'মেঘে ঢাকা তারা'র পঁচিশ বৎসর পূর্তি উৎসবেও কার্ড দেননি, প্রবেশাধিকার সেখানে ছিলনা মূল গ্রন্থকারের) টেলিফোনে তবু উপযাচক হয়ে নিজে লক্ষ্মী বৌঠানকে একটা চিত্রনাট্যের কপি চেয়েছিলাম, আজও তা তারা দেননি, অথচ আইনত তিরিশ বছর পর যখন সব স্বত্ব গ্রন্থকারের কাছে ফিরে এসেছে, তারপর ওই ট্রাস্টের পুস্তক প্রকাশনার অধিকার আছে কিনা সেইটাই বিচার্য।

তবু আমি কোন প্রতিবাদ করিনি, তাদের এই সব অবজ্ঞা অবহেলা, অস্বীকৃতি নীরবে মেনে নিয়েছি।

এর মধ্যে এখানেও কিছু ছবিতে কাজ করছি। 'আশা ভালোবাসা'ও সুপার হিট করেছিল। অবশ্য শিশিরবাবু এই ছবিকে সার্থক করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি, এ ছবিতে তিনি সুনাম অর্থ সবই পেয়েছিলেন, এই সময় আমার নভোলেট বের হল স্বামীর মৃত্যুর পর মা-তার মেয়েকে নিয়ে কাহিনী। মা চায় মেয়েকে নিয়ে নিজের নিঃসঙ্গতা ভুলতে, মেয়ের আলাদা জগৎ, সে চায় নিজের জগৎ নিয়ে থাকতে, দুটি মেয়ের মানসিক সংঘাত।

গল্পটা নিয়ে দীনেন গুপ্ত ছবি করার চেষ্টা করলেন, চিত্রনাট্য লেখা হলো। মায়ের ভূমিকার জন্য তিনি ভেবেছিলেন সুচিত্রা সেনকে। উত্তমবাবু চলে যাবার পর বাংলা ছবির জগতে একটা শূন্যতা এসেছিল তবু কাজ চলছে, সুচিত্রা সেনও ছবি কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বড় মাপের শিল্পী, তাই তিনি জানতেন কোথায় থামতে হবে। তাই তখন থামার কথাই ভাবছেন।

তবু দীনেনবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন মিসেস সেনের বাংলোয়। বালিগঞ্জের অভিজাত এলাকায় সুন্দর বাগান ঘেরা বাংলো। দোতলার ড্রইংরুমে চিত্রনাট্য শোনানো হল তাঁকে। মন দিয়ে চিত্রনাট্য শুনলেন, তখন তার বয়স হয়েছে। তবু চেহারায় একটা প্রশান্তির স্পর্শ। চিত্রনাট্য শুনে হঠাৎ প্রশ্ন করেন মিসেস সেন—

আপনার মেয়ে আছে? কন্যাসন্তান? মেয়ে আমার নেই সেই কথা জানাতে মিসেস সেন এবার বলেন তবু মা মেয়ের মানসিক দ্বন্দ্বটার কিছুটা আঁচ আপনি করেছেন। এমন সময় তার মেয়ে ঘরে ঢোকে মাকে কী জানাতে। মেয়েটি আজকের মুনমুন সেন, তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, ও চলে যেতে মিসেস সেন বলেন—মেয়ে বড় হলে মায়ের যে কত ভাবনা তা ভালো করেই বুঝি। এরপর চা এলো। মিসেস সেন চিত্রনাট্যের দু চারটা জায়গা নিয়ে কিছু অলোচনা করলেন। তখনও তিনি ভাবছেন ছবিতে আর অভিনয় করবেন কি না? দীনেনবাবুকেও জানালেন সে কথা। তবু দীনেনবাবু আশা ছাড়েন না। বলেন পরে আশছি, আপনি এই ছবিটা করছেন।

কিন্তু সুচিত্রা সেন তারপর আর কোন ছবিই করেননি, নিজেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন দিয়ে এখন অন্য জগতের মানুষ। পরে সেই গল্পটা নিয়ে সুপ্রিয়া দেবী ছবি করলেন। মায়ের ভূমিকা করলেন তিনি নিজে। পরিচালক নিলেন উদয় ভট্টাচার্য নামে এক তরুণ পরিচালককে ছবির নাম হল উত্তর মেলেনি। ছবির কিন্তু বিষয়টাই কঠিন, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ছবি, বোধহয় ঠিকমত ব্যাপারটা জমাতে পরেননি, তাই এ ছবি জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

কিন্তু এই উত্তর মেলেনি। বেতার নাটক হিসাবে দারুণ সার্থকতা লাভ করেছিল। এই বেতার নাটকে মা মেয়ের রোল করেছিলেন তৃপ্তি মিত্র আর শাওলী মিত্র। জানি না এর রেকর্ডিং আর ওদের কাছে আছে কিনা তবে তখন এটা বহুবার প্রচার করেছিলেন বেতার কর্তৃপক্ষ।

এর মধ্যে আমি শক্তিবাবুর পরবর্তী কাহিনীর পটভূমিকা বিষয়ে বস্তু খুঁজছি, দীঘা-বকখালি যাই। দেখি মাছমারাদের জীবন। মাছ মহাজনদের সঙ্গে ওই জেলে যারা প্রাণ হাতে নিয়ে মাছ ধরে সম্পর্কটা। তাদের নিষ্ঠুর বঞ্চনা।

সেদিন জালে বেশ বড় সাইজের একটা হাঙ্গরকে তুলেছে দীঘার মোহনার কাছে জেলেরা। গভীর সমুদ্রে ওটাকে ধরে টেনে এনেছে। ওটাই তাদের বাগে পেলে শেষ করতো। নেহাৎ বরাতজোর হাঙ্গরের শিকারগুলোই এবার হাঙ্গর বাবাজীকে শিকারে পরিণত করে ডাঙায় তুলে এনেছে। এই সব প্রাণীদের সঙ্গে লড়াই করে জেলেদের রুজি-রোজকার করতে হয়। ওদিকে জলে হাঙ্গর, কুমীর আর ডাঙ্গায় ওই হাঙ্গররূপী মহাজনরা। এই নিয়েই তাদের জীবন—সংঘাতময় জীবনে তবু প্রেম-আশা-সুর আছে, আছে সবকিছুকে উপেক্ষা করে নতুন করে বাঁচার প্রয়াস।

এই আমার কাহিনীর উপজীব্য, এই চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই লিখলাম কাহিনীটা। একটি সংগ্রামী এমনি মাছমারা তরুণ হলো নায়ক। তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনী। সে জলের হাঙ্গরদের সঙ্গে লড়াই করে ডাঙ্গাতেও ওই হাঙ্গর মহাজনদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম।

একটা পত্রিকাতে নভেলেট আকারে ছাপা হতে সেটা শক্তিবাবুকে পাঠালাম। গল্পটা শক্তিবাবুর ভালো লাগলো। মিঠুনকে নিয়েই ভাবছেন এবার ওই প্রতিবাসী মাছমারার চরিত্র ওকে দিয়েই করাবেন।

কিছু অংশ রদবদল করে চিত্রনাট্যের খসড়া করতে বললেন, এই সময় বাংলাদেশের নামী অভিনেতা, প্রযোজক সৈয়দ হাসান ইমামও বোম্বে গেছেন। ঢাকায় তিনি খুবই পরিচিত ব্যক্তি।

তিনিও গল্পটা শুনে বলেন এটা পর্ববঙ্গের পটভূমিকায় দারুণ হবে। যৌথ প্রযোজনার কথা ভাবুন।

তখন নিয়ম ছিল যৌথ প্রযোজনার ক্ষেত্রে ছবিকে হিন্দিতে করতে হবে, ভারতে বাংলাও। আর সেই বাংলা ছবির একটা ডিউপ নেগেটিভ নেবে বাংলাদেশ। তারা ওদেশে বাংলা ছবির ব্যবসা করবে, আর পশ্চিমবাংলাতে চলবে ভারতের প্রযোজকের বাংলা হিন্দিও, কোন দেশের থেকে টাকা বাইরে যাবে না।

এই ছবিতে কলাকুশলী থাকবে দুদেশের, অভিনেতাও থাকবেন। যে যার দেশের কলা কুশলীদের, অভিনেতাদের টাকা দেবে, আধা আধি শুটিং হবে এ দেশে, ওদেশে, যে যার দেশের শুটিং-এর খরচা দেবে, এইভাবে যৌথ চেষ্টায় কোন টাকা এদেশ ওদেশে না গিয়ে ছবি করা হবে।

আমার মূল কাহিনীর নাম ছিল অধিকার। বাংলায় চিত্রনাট্য লেখা শেষ হলো। এই চিত্রনাট্য লেখার সময় আমি সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলাম ছোট্টুদাকে। ইনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে। শরদিন্দুবাবু বিহারের মুঙ্গেরের বাসিন্দা। ওখানের বনেদী পরিবার।

আমি মুঙ্গেরে সাহিত্যসভা করতে গিয়ে ওর বাড়িতেই উঠেছিলাম। শরদিন্দুবাবুরা বোম্বাই প্রবাসী, শরদিন্দুবাবু পুনায় থাকতেন শেষজীবনে ছেলেরা বোম্বেতেই। মুঙ্গেরের বাড়িতে থাকতেন ওর ছোট ভাই। তার ছেলে সাহিত্যিক কৃষানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোম্বের সিনেমা জগতে বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গেরের অনেক অবদান আছে। অশোক কুমারের বাবা ভাগলপুরেই পড়তেন। দাদামণির বলতেন বুঝলেন, আমরা সাতগেছের রঘু ডাকাতের বংশ। বাবা ভাগলপুরে পড়তেন আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে। ওখানের রাজা শিবচন্দ্রের নজরে পড়েন। তার মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন। শুধোন কাকে—ওই বেশ পেটা স্বাস্থ্য সুন্দর ছেলেটি কে হে?

জবাব পান ওর বাবা খান্ডোয়াতে থাকেন, ওরই ছেলে, রাজা শুধান খান্ডোয়া, সেটা আবার কোথায়? জবাব মেলে খান্ডোয়া—ওই পান্ডুয়া টান্ডুয়ার কাছেই কোথাও হবে বোধহয়।

পরে সেখানেই বিয়ে হয়—অশোককুমারের বাবা খান্ডোয়াতেই ওকালতি শুরু

করেন। শহরের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। অশোককুমার বলেন কিশোর তখন ছোট। গানের গলাও তেমন ছিল না। একবার ওর পায়ে একটা ফোঁড়া হয়, তার যন্ত্রণাতে অনরবত চব্বিশ ঘণ্টা ও কেঁদেছিল। ছোট বেলায় ওই দীর্ঘসময় কাঁদার পর থেকেই ওর গলার আওয়াজই ওই রকম সুরেলা হয়ে ওঠে।

ওটা ওর কাছে শুনেছিলাম। তবে আমার মনে হয় কিশোর কুমারের কণ্ঠস্বর ছিল সুরেলা আর আসলে উনি ছিলেন শ্রুতিধর, যা শুনতেন সেটা ওর মাথায় বসে যেতো। নিজস্ব সুরেলা গলায় সেই শোনা গানই আর সুন্দর করে তিনি সঠিক ভাবে গেয়ে দিতেন।

শুনেছি মৈজুদ্দীন নামে এক মার্গসঙ্গীত সাধক ছিলেন, তিনি কোনও ওস্তাদের গাওয়া ঘণ্টা খানেকের খেয়াল গান একবার শুনে আরও সুন্দর করে হুবহু গেয়ে দিতে পারতেন।

তবে দেখেছি প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীকে। যে কোন কবিতা ওকে দুতিন বার শুনিয়ে দিলে তিনি সেটা হুবহু মুখস্থ বলে দিতে পারতেন, আর ছিলেন তেমনি আড্ডাবাজ, দিলখোলা মানুষ।

আড্ডা দিতে দেখেছি অশোক কুমারকেও। প্রচুর পড়াশোনা ছিল তার। আর নেশা ছিল বাইয়োকেমিক ডাক্তারী করা। অনেক জটিল রোগীকে তিনি সুস্থ করেছেন তার চিকিৎসায়।

তখন দামী স্টুডিওতে প্রামাদ চক্রবর্তীর পতিতার শুটিং চলছে। অশোক কুমার গ্রীনরুমে বসে কুকুরের কাহিনী ফেঁদেছেন। আমিও রয়েছি। দাদামণি বলেন

একবার পেশোয়ারে গেছি, ইয়াইয়া খানের আমন্ত্রণ, ফেরার সময় আমি কুকুর ভালোবাসি শুনে আমাকে একটা কুকুরের বাচ্চা দিলেন। ওদেশের কুকুর ট্রেনে নিয়ে আসছি ওখানের মানুষ চায়না এ কুকুর বাইরে যাক। পরে ইয়াইয়া খানের নাম শুনে তারা আর এনিয়ে কিছু বলেন না। একজন বলেন—এর ল্যাজ কেটে কাবাব বানিয়ে ওকেই খাইয়ে দিবেন—ও আরও তেজী হবে। যাহোক কুকুরটাকে বোম্বাই-এ এনে রাখলাম। খুবই হিংস্র টাইপের কুকুর। আকারে বেশ বড় হয়ে উঠলো। দু'একটা ঘটনাও ঘটালো। তাই ওকে বাড়িতে রাখা নিরাপদ মনে করি না। কাকে দিই। এমনি দিনে গুজরাটের কোন গ্রামের এক করাতকল মালিক এলো। তার বড় কাঠের গোলা, করাতকল। সে কুকুরটা চাইতে তাকেই দিয়ে দিলাম। বললাম যত্ন আত্তি ওর করো প্যাটেলজী।

প্যাটেলজী কুকুরটা নিয়ে গেলেন তারপর অনেকদিন আর দেখা নেই। বছর খানেক পর একদিন প্যাটেলজী এলেন। ওকে কুকুরটার খবর নিতে প্যাটেলজীর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। বলে দাদামণি! একদিন আমার গোলায় ডাকাত পড়লো, তারা আমাকেই মারতে এলো, ওই কুকুরটা তাকে খতম করে দিতে ওরা

গুলি করে কুকুরটাকে মেরে চলে গেল। ওই কুত্তা নিজের জান দিয়ে আমার জান বাঁচিয়ে গেছে। ও ছিল ইমানদার—সুটিং-এর ডাক আসতে আড্ডা ছেড়ে উঠলেন দাদামণি।

'অধিকার' গল্প নিয়েই হিন্দি বাংলায় বেশি প্রডাকশন-এর অনুমতি মিললো দিল্লি থেকে। হিন্দি ভার্সানের নামকরণ করা হলো—আড়পার, দুই বাংলার শিল্পী কলাকুশলীদের নিয়েই এ ছবি করা হবে। মিঠুন এদিকের নায়ক, ওদিকের রোজিনা হলেন নায়িকা। উৎপলবাবু রইলেন তার অভিনয় প্রতিটি ছবির সম্পদ। ওদিকে বাংলাদেশের আরও অভিনেতা অভিনেত্রীও রইলেন।

এছবির হিন্দি ভার্সান লিখতে কমলেশ্বরকে পাওয়া গেল না। তিনি তখন অন্য কাযে ব্যস্ত, দিল্লী বোম্বাই করছেন। তাই গোরক্ষপুরের এক প্রবাসী বাঙালি ওখানে ছবিতে কাজ করেন—তাকেই আনা হলো।

এর মধ্যে সমস্যা হল হাঙ্গর নিয়ে। হিন্দিতে এ ছবি হবে। সারা ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী এলাকার মানুষরাই মাত্র হাঙ্গর কি তা জানে। বাকি ভারতের ইউপি, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, ভিতরের অন্ধ্র, কর্ণাটকের লোক হাঙ্গর কি বস্তু জানে না। তারা তবু মগর মীচ্ছি অর্থাৎ কুমীর কি তা জানে। তাই ওটা হাঙ্গর না করে কুমীর করতে হবে। শক্তিবাবুর ইচ্ছা ছিল ওটা হাঙ্গরই থাক, তার আগে ইংরেজিতে শার্ক ছবি খুব নাম করেছে। আমেরিকায় ওই শার্কটা বানিয়েছে হলিউডে উনি তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করলেন খাদ সেই '! শার্ক'কে কাজে লাগানো যায়। ওরাও শার্ক নিয়ে কি কি কাজ হবে, কত ফিট ছবি তোলা হবে শার্কটাকে নিয়ে এসবও জানতে চাইলেন যাতে কি এটা পড়ে হিসাব করা যাবে।

এমন সময় অনেকেই ওই হাঙ্গরের প্রশ্ন তুলতে শক্তিবাবুও ভাবতে থাকেন কথাটা। শেষ অবধি ওটাকে কুমীরই করা হল কিন্তু জ্যান্ত কুমীর দিয়ে ওসব শট টেক করা যাবে না। তাই একটা নকল কুমীরই বানাতে হবে। সেটাকে জলে চালানো যাবে—মুখ হা করানো যাবে, তেড়ে আসছে এসবও দেখাতে হবে।

কাজটা যত সহজ ভাবা গেছল তত সহজ নয়। বাইরে থেকে লোক এনে শেষে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটা নকল কুমীর বানাতে হলো। সেটা জলে রিমোট কনট্রোলে চালানো যাবে। হাঁ করে তেড়ে আসছে বিশাল মুখ ব্যাদান করে এসবও দেখানো যাবে। অনেক পরীক্ষার পর কুমীর তৈরি করা হল। তার জন্য খরচও হল প্রচুর।

এর মধ্যে ঢাকার হাসান ভাইও তৈরি হয়ে গেছেন এবার শক্তিবাবুর টিমকে শুটিং-এর জন্য ওদেশে যেতে হবে পাশপোর্টও তৈরি করতে হবে। দেখা গেল শক্তিবাবুর বাঙালি স্টাফরা সবাই ওদেশের নাকি পূর্ব বাসিন্দা, তাদের বাথনা ওদেশে যাবে, শক্তিবাবু বলেন এরা সব যে বাঙ্গাল তা তো জানা ছিল না।

অমানুষ, আনন্দ আশ্রমের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন শ্যামল মিত্র, এর মধ্যে

শ্যামলবাবু বোম্বেতে দু'একটা অন্য ছবিতে কাজ করেছেন। তিনি, মানিক দত্ত প্রভৃতিরা মিলে বাসু ভট্টাচার্যকে দিয়ে। আখরী কবিতা নামে একটা ছবি শুরু করলেন।

তখন শক্তিবাবুর ভাই গিরিজাবাবু রয়েছেন ওরা তার বন্ধু স্থানীয় ছবির কাজ প্রায় শেষ, ওরা গিরিজাবাবুকে ধরলেন ওই ছবির বোম্বাই সার্কিটের পরিবেশনার জন্য। গিরিজাবাবু বন্ধুদের কথায় রাজী হয়ে তাদের ছবির কাজ শেষ করার জন্য বেশ কিছু টাকাও দিলেন। শ্যামলবাবু এসব ব্যাপারটা সঠিক জানতেন না। তিনি কলকাতাতেই বেশি থাকেন।

গিরিজা বাবু মারা গেলেন হঠাৎ। শক্তিবাবুর, ডানহাতই চলে গেলো। ছেলে সবে অফিসে বের হচ্ছে। পরে শক্তিবাবু ব্যাপারটা জানালেন দেখা গেল ওই ছবির কাজ সামান্যই হয়েছে। গিরিজাবাবুকে সঠিক সংবাদ পাননি। সেই ছবি আর হয়নি। শ্যামলবাবুও বুঝতে পারেন যে কোথায় একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে।

'অনুসন্ধান'-এর সঙ্গীত পরিচালক ছিলো রাহুল দেববর্মণ। তখন শচীনকর্তা আর নেই। রাহুলের মা মীরা দেবী থাকেন লিং কিং রোডের ধারে শচীনকর্তার স্মৃতি বিজড়িত সেই বাড়িতেই।

কিশোর, রাহুল এখন যুবক। নিষ্ঠাবান শিল্পী। রামকৃষ্ণ মিশনের একটু ওদিকে একটা বিশাল বাড়ির সারা দোতলা জুড়ে ওর রেস্টরুম, রিহার্সেল হল। বিশাল হলঘরে পুরু গতি পাতা। ওদিকে রেকর্ডিং বুথ। একটা দুটো তালবাদ্য, বোহালাবাদক রয়েছে, হারমোনিয়ামে সুর তোলে রাহুল, মনোমত মুখরা বানায় নানা ছন্দে সেগুলোও টেপ করা হয়।

চিত্রনাট্য লেখার পর কলকাতায় তখন গীতকারকে নিয়ে বসা হতো। তাকে ওই সিচুয়েশনগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হতো। সেই সিচুয়েশন মত গীতকার গান লিখতেন, সুরকার সে গুলোর সুর করতেন, তারপর রেকর্ডিং করা হতো।

কিন্তু বোম্বের ব্যাপারটা ছিল একটু আলাদা। সুরকারকে গানের সিচুয়েশন, কি ঘটনার মুডটা বুঝিয়ে দিতে হয়, আমি সেই ভাবে সিচুয়েশনগুলো রাহুলকে বোঝাছি, রাহুল মন দিয়ে শুনছে আর আমার সব কথাই রেকর্ডও করা হচ্ছে। পরে ওগুলো বাজিয়ে সে আবার শুনবে, ভাববে সুরের একটা লাইন বাজাবে। তারপর গীতকারকে নিয়ে বসবে গীতকার মুড, সিচুয়েশন সুর শুনে এবার গানের বাণী বসাবে সেই ভাবটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এখানে সুর তালই প্রধান, ভাষাটা যেন গৌণ। গীতিকারকে বেঁধে দেওয়াই হয় এতে।

আগে তা হত না। গৌরীদার 'কি আশায় বাঁধি খেলাঘর' একটা কবিতাই। ওটাকেই ব্যবহার করা হয়েছিল। এখন বোম্বাই-এর রীতি বদলে গেছে। আমার মনে হয় অধিকাংশ গান ফেল করার এও একটা কারণ।

গৌরীবাবুও এই রীতিটাকে মানতে পারতেন না। গৌরীপ্রসন্ন ছিলেন মূলত কবি

পরে গীতিকার। এই নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন, আর নিজের লেখারও তিনি ছিলেন কঠিন সমালোচক। নিজে লিখেও ঠিক খুশি হতেন না। আরও ভালো লিখতে হবে। তাই শক্তিবাবু বলেন গৌরীদা, তোমার নাম গৌরীপ্রসন্ন না হয়ে গৌরীঅপ্রসন্ন হলেই ভালো হতো।

গৌরী এক চামচ পান-পরাগ মুখে পুরে বলতে তুমি থামো তো! শক্তিবাবু মাঝে বেশ রসিকতাই করতেন ওর সঙ্গে।

বাংলায় গান লিখতেন গৌরীদা, আর হিন্দিতে লিখতেন আনন্দ বক্‌সী, শক্তিবাবু বলতেন—গৌরীদা, আপনি বরং আনন্দ বক্‌সীর কাছে বসুন, গান লেখাটা আরও ভালো শিখবেন। গৌরীদা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতেন তুমি থামো শক্তি। গানের ক্ষেত্রে দুজনে দুজনের ক্ষেত্রে দিকপাল তবে যতদূর মনে পড়ে গৌরীদার লেখা বেশি গান হিন্দিতে ভাষান্তর করেছেন আনন্দ বক্‌সীই নিশিপদ্মের বিখ্যাত গান—লোকে যে যা বলে বলুক/তাদের কথায় কি আসে যায়।

আনন্দ বক্‌সী অমর প্রেমে লিখলেন—কুছ তো কুছ লোগ কছতা হ্যায়/কহনাই উন্‌কি কাম।

অমানুষের—প্রতিদিন ওঠে নতুন সূর্য/প্রতিরাত হয় ভোর।

আনন্দ বক্‌সী এর লাইন ধরেই ভাষান্তর করেছিলেন। আনন্দজী গৌরীদাকে দাদা বলেই জানতেন। বাঙালি সাহিত্যিক গীতিকাররা বোম্বাই-এর ওদের পাশে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। অনুসন্ধানে রাহুল তার বাবার কিছু সুরকেও নতুন করে ব্যবহার করেছিলো।

বাংলার জঁল মাটির গল্প 'অধিকার'। তাই রাহুলকেই রাখা হলো এর সঙ্গীত পরিচালনায়।

একদিন রাহুলের মিউজিক রুমে গেছি শক্তিবাবুর সঙ্গে, রাহুল বলে শক্তিবাবুকে শক্তিদা, অনেক ছবিই তো করলাম, একটা বেশ ভালো ছবি করুন। 'মেঘে ঢাকা তারা' হিন্দিতে করুন, প্রাণভরে সুর করি।

শক্তিবাবু বলেন সে চেষ্টা তো করেছিলাম—এবার নিজেই করুন শক্তিদাও তো রয়েছেন। রাহুলের কথায় শক্তিবাবু বলেন—তা না হয় হলো। কিন্তু ঋত্বিকবাবু যা করে গেছেন তার কাছাকাছি না পৌঁছতে পারলে কলকাতায় আর যাওয়া যাবে না।

ঋত্বিকবাবুর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পরিচয়ই ফুটে উঠেছিল ওঁর কথায়। ঋত্বিক তখন আর নেই।

ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল এন-টি স্টুটিওতেই। তখন যুক্তিতর্ক গল্পের ডাবিং শেষ করেছেন। চেহারাও ভেঙে পড়েছে, নানা অভাব-অশান্তির মধ্যে রয়েছেন। একটু সংযম একটু হিসাব করে যদি চলতে পারতেন ঋত্বিক অকালে চলে যেতেন না শূন্য হাতে।

বার বার মনে পড়েছিল ঋত্বিককে সেবার খড়্গপুরের ফিল্ম ফেসটিভ্যালে। আমি আর অনিল চাটুয্যে গেছি, ওরা নিয়ে গেছেন ঋত্বিকের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। সেদিন আমাদের অনুরোধে ওরা আমাদের জন্য বেলা বারোটা নাগাদ আই-টি-আই-এর প্রজেকশন হলে ওর বিশেষ প্রদর্শনী করেছিলেন। ঠিক মতো সম্পাদনা করার সুযোগও পাননি ঋত্বিক, প্রায় তিনঘণ্টার উপর ছবি রয়ে গেছে। সেই ছবিই সেদিন খাবার কথা ভুলে তন্ময় হয়ে দেখেছিলাম। কি টেকিং তেমনি পটভূমিকা নির্বাচন তেমনি অভিনয়, শেষ দৃশ্য অপূর্ব অনবদ্য, যেন একটি সুসংবদ্ধ খেয়াল। লয় মিড়-তান-মূর্ছনা সব ফুটে উঠেছে।

ছবি দেখে সেদিন চোখে জল এসেছিল এমন স্রষ্টাকে আমরা অকালে হারালাম।

ঢাকা থেকে চলেছে ডবল ডেকার রিজার্ভ স্টীমার। রাত গভীরে বিস্তীর্ণ পদ্মা-মেঘনা-গাড়িয়াল খাঁর বিস্তীর্ণ সঙ্গম পার হয়ে ষ্টিমার চলেছে বরিশালের পটুয়াখালির দিকে। নদী নয় যেন উত্তাল সমুদ্রই। জায়গার নাম আসুন ঋত্বির মোড, দেখে শুনে পাড়ি দিতে ইচ্ছে বৈকালে পটুয়াখালি ছাড়িয়ে স্টীমার চলছে আরও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দিকে। কুয়াকাটা ছাড়িয়ে পায়রা নদী ধরে পৌছানো মহীপুর খালের ওদিকে একটা দ্বীপে। একদিকে দিগন্তপ্রসারী পায়রা নদী পড়েছে সাগরে, একদিকে পায়রা নদী থেকে বের হয়েছে মহীপুর খাল, সেটাও পড়েছে সুন্দরবন হয়ে সমুদ্রে। এই দ্বীপে লবণের গোলা বাড়ি, দু তিনটে বাংলো কিছুঘর নিয়ে গড়ে উঠলো শক্তি ফিল্মস্-এর শুটিং পার্টি।

এর মধ্যে ছবির নামও বদলাতে হয়েছে। কারণ অধিকার নামে একটা ছবি আগেও হয়েছে। উপন্যাসের নাম অধিকারই রইল, ছবির নাম করা হলো 'অন্যায় অবিচার'।

ওই মহীপুরের দ্বীপের একদিকে খালের ওপারে কিছু বসতি, অন্যদিকে অশান্ত বে অব বেঙ্গল দ্বীপেও কিছু বসতি আছে এরা সবাই মাছ ধরে নদীতে, সমুদ্রে। তাই এখানে বিরাট সামুদ্রিক মাছের আড়ত আছে, বহু মাছধরার নৌকা, ট্রলার থেকে রাশি রাশি মাছ নামে। লবণ দিয়ে জারায়, নাহয় সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে রোদে শুকিয়ে শুটকি মাছ করা হয়।

ছোট বড় হাঙ্গরও ধরা পড়ে। তার ডানাগুলো কেটে বীটলবণ দিয়ে বাইরে চালান যায়, এটা দীঘাতেও হয়। ওই সার্ক ফিন এর স্টু নাকি খুবই দামী খাদ্য।

বাংলাদেশের এই সব সমুদ্রতীরে প্রায়ই সাইক্লোন, ঝড়, তুফান হয়। সমুদ্র পনেরো- বিশ ফিট ফুলে উঠে মানুষের বসতে হানা দেয়, তার সাপটে সব ধুয়ে-মুছে নেয়, মানুষজন গরু-বাছুর সেই ফিরতি ঢেউ-এর টানে অকূল সমুদ্রে হারিয়ে যায়। ফলে ফসলেরও খুব ক্ষতি হয়।

তাই এখানের সরকার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাতে তিন-চার কিলোমিটার দূরে দূরে বিশ-বাইশ ফিট মজবুত পিলারের উপর বিশাল লম্বা চওড়া দোতালা মেজে করে উপরে মজবুত ছাদ দিয়ে সাইক্লোন সেন্টার করেছে। সাইক্লোন তুফানের ঘোষণা হলে ওইসব এলাকার মানুষজন গরু-বাছুর নিয়ে সপরিবারে এসে ওইসব সেন্টারে আশ্রয় নিতে পারে। ওখানে গরু-ছাগল ওঠার জন্য সিঁড়ি না করে ঢালু পথের মত করা আছে, ওই দিয়েই গরু মানুষ দোতলায় তিনতলায় উঠে প্রাণ বাঁচায়।

আমাদের উপকূল অঞ্চলে এমন সেন্টার নেই, বিশেষ করে উড়িষ্যা, অন্ধ্র কোষ্টে এমন তুফান মাঝে মাঝে হয়, এবার তো সর্বনাশা তুফানে সব ভেসে গেছল অমনি সাইক্লোন সেন্টার থাকলে এতটা প্রাণহানি হতো না নিশ্চয়ই।

পুরোনো বাংলো—এতদূরে কেউ আসে না। এখানের দখলদার বেশ হৃষ্টপুষ্ট মূষিক বাহিনী বেশ বিরক্ত হয়েই আক্রমণ চালালো। কারো লুঙ্গি মাঝখানে খাবলানো, কার দামী প্যান্ট এক চাকলা নেই কার স্যান্ডেলের স্ট্রাপ কাটা।

বাংলাদেশ সরকার এই বিদেশী শুটিং পার্টিকে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করেছিলেন। এদের জন্যই ওই দ্বীপে তিরিশজন রাইফেলধারী বিশেষ পুলিশের ব্যবস্থা করে ওখানে অস্থায়ী থানাই গড়ে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যার পর ওই বাংলো এরিয়ার বাইরে কারোও প্রবেশ নিষেধ। একেবারে প্রত্যন্ত এলাকা। এক্সপোজড ফিল্ম পাঠাতে হতো ল্যাচে অন্য জরুরী জিনিসপত্র আনার দরকার চিঠিপত্রও আসবে, যাবে, তাই সপ্তাহে একটা ছোট সি প্লেন ঢাকা থেকে এসে বঙ্গোপসাগরের জলে নামতো, সেটা ওই জল থেকে কাছে এসে চাকা বের করে কাছিমের মত বালিতে উঠে আসতো। ওতেই জরুরী সাপ্লাই জিনিসপত্র আসতো। নাহলে এখান থেকে লঞ্চে কুয়াকাটা, সেখান থেকে পটুয়াখালি গিয়ে সার্ভিস স্টীমার ধরে ঢাকায় যেতে হলে দুদিনের পথ, এদের জন্য স্পিডবোট ছিল। এই দূর দুর্গমে শুটিং করতে হচ্ছে। হঠাৎ মিঠুন অসুস্থ হয়ে পড়লো। ওই খানের দূর বসতি থেকে স্পিডবোডে ডাক্তার এসে দেখে ইনজেকশন. ওষুধপত্র দিতে সুস্থ হয়ে উঠলো।

এর মধ্যেই সময় কাটাবার জন্যে একে তাকে নিয়ে মজাও করা হতো। তরুণ ঘোষ (অমানুষের পদা) লাগতো অসিত সেনের সঙ্গে। দুজনের সম্পর্কও খুব মধুর, আবার ঝগড়াও হতো। শক্তিবাবু অসিতবাবুকে বেশি মাছ খেতে দেবেন না। বলতেন—এখানে কিছু হলে মরবি। অসিতবাবু বলেন—ওটা নতুন কিছু নয়, মরতে তো হবেই, খেতে দে। তখন প্রভাত রায়, জ্যোতি রায়দের মত পুরোনো সহকারীরা নেই।

প্রভাত রায় বোম্বাই-এ রাখীর একটা হিন্দি ছবি পরিচালনা করে কলকাতায় এসেছে প্রণব বোসের কাছে।

তখন এখানে চণ্ডীমাতা ফিল্মস্-এর খুবই রমরমা। বহু সেরা বাংলা ছবির এরা

পরিবেশক, প্রযোজক সুখেন দাসকে দিয়ে এরা বেশ সফল কয়েকটা ছবি করেছেন। প্রণববাবু ইষ্টার্ন মোশন পিকচার্স ইউনিয়নের একজন কর্মকর্তা। বোম্বাই-এ প্রায়ই যান, এদের অনেক ছবির আংশিক শুটিং বোম্বেতে করেছেন, শক্তিবাবুর সঙ্গে প্রণববাবুর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই শক্তি ফিল্মসের প্রভাত রায় এদের ওখানের কাজের সহযোগিতা করতো।

তরুণবাবু তখন ওখানে বালিকাবধূর হিন্দি করছেন শক্তি ফিল্মসের ব্যানারে। নটরাজ স্টুডিওতে শুটিং চলছে। কোনদিন আমি হোটেল থেকে কাজের ফাঁকে স্টুডিওতে গেছি, শক্তিবাবুকে বলি—চলুন, তরুণবাবুর সেটে একটু যাই।

তরুণবাবু মানুষ হিসাবে খুবই সজ্জন, ওর সঙ্গে কথা বলে সকলেই আনন্দ পায়, মৃদুভাষী মিষ্টভাষী মানুষ। শক্তিবাবু বলেন আমি সেটে ঢুকবো না, আপনিই যান, আমিই যেতাম, কথাবার্তা হতো। দেখেছি শক্তিবাবু কোনদিন ওঁর সেটে পারতপক্ষে যাননি। হয়তো তরুণবাবু ভাবতে পারেন—প্রযোজক হিসাবে তার কাজ দেখতে এসেছেন, আমার মনে হয় তাই শক্তিবাবু এড়িয়ে যেতেন।

প্রভাতবাবু কলকাতায় এসে প্রণববাবুর ছবি শুরু করেছে, দুজনের নামের আদ্যক্ষর প, তাই তাদের ছবির নামও হয়েছিল প দিয়ে। কিন্তু দুজনে একবার শিলিগুড়ি থেকে রকেট বাসে ফিরছেন, পথে বাসে পড়লেন প্রতাপশালী ডাকাতদের পাল্লায়। দুই প মিলে ছবির বাজারে ঠেলে উঠলেও ডাকাত দল দুই প-কেই পরাস্ত করে প্রভূত কিছু নিয়ে পলায়ন পর্ব সারা করেছিল।

জ্যোতি তখন বোম্বেতে মিঠুনকে নিয়ে একটা হিন্দি ছবি শুরু করেছে। এখানেও একটা বাংলা ছবি করার কথা ভাবছে। ওই দ্বীপে অন্যায় অবিচারের ইউনিটের এক তরুণ তৃতীয় সহকারী এক ব্রাহ্মণ সন্তান তখন ওই কোন বসতির একটি মুসলিম তরুণীর প্রেমে পড়েছে, এটা ঘটেছিল নিভৃতে, গোপনে, এই ইউনিট থাকতো একটা দ্বীপে, এদিকে মহীপুরের, খাল, জোয়ার ভাটা খেলে, ভাটার সময় ওদিক থেকে অনেক দামাল ছেলে, লোকজন চলে আসে ক্যাম্পের দিকে। পুলিশও বাধা দেয়। ঝামেলাও হয়।

শেষে হঠাৎ ইউনিটের এক মেকানিকের মাথায় প্ল্যানটা খেলে যায়। ওই নকল কুমীরটাকে বোম্বাই থেকে বড় একটা কাঠের বাক্সে প্যাক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবার সেটাকে খুলে জোড়া লাগিয়ে আস্ত বড় একটা কুমীর বানিয়ে মাঝে মাঝে খালে ছেড়ে দিত, রিমোট কনট্রোলে তাকে অপারেট করতে—খালে কুমীর বাবাজী বেশ ছুটে চলেছে—মুখ হাঁ করে, ডুবছে, ক্রমশ খবর ছড়িয়ে গেল খালে কুমীর এসেছে ওই সাতারুদের উৎপাতও কমে গেল। ভয়ে কেউ গাং পাড়ি দেয় না। কুমীরের ট্রায়ালও চলে নিরাপদেই। ওই দ্বীপেরই মেয়েটি ছেলেটির প্রেমপর্ব

নিয়ে এখন একটু আলোচনাও শুরু হয়েছে, এদিকে মাসাবধি কাল কেটে গেছে। এবার নোঙর তুলতে হবে, এদের ফিরে আসার পালা।

ছেলেটি তখন মেয়েটির প্রেমে মশগুল। শেষ অবধি সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজি হলো, ওকেই জীবনসঙ্গিনী করে নিয়ে যাবে। হাসানভাই মেয়ের বাবা-মাকে বলে মত করালেন।

তরুণ বলে ছেলেটিকে—দুধের সর তুই-ই খেলিরে। শুটিং করতে এসে ম্যারিং করে ফেললি। নববিবাহিতা বরবধূকে নিয়ে ফিরলো শুটিং পার্টি তিরিশদিন শুটিং করে ঢাকায়। ঢাকায় সিনে টেকনিসিয়ান্স এই শুটিং পার্টিকে সেদিন ওদের পার্টিতে আপ্যায়িতও করেছিলেন পূর্ববাংলার মধুর স্মৃতি নিয়ে ওরা ফিরে বোম্বাই-এ।

জ্যোতি আমার 'টেনিয়া' উপন্যাস অবলম্বনে ছবি শুরু করেছে। আসানসোল কল্যাণেশ্বরী রুটের একটি তরুণ বামা কনডাকটারকে নিয়ে গল্প। এক উদ্বাস্তু পাঞ্জাবী ড্রাইভার দাঙ্গায় ওদেশে সর্বস্ব আপনজনকে হারিয়ে এদেশে এসে বসে চালাচ্ছে, ওই হতভাগা ছেলেটিকে সে নিজের ছেলের মতই ভালোবাসে, তাকে চ্যাম্পিয়ান ড্রাইভার বানাবে।

জাতীয় সংহতির উপর একটি নিটোল বেদনাবিধুর কাহিনী এমনি চরিত্রকে দেখেছিলাম, তাকে নিয়ে 'অমৃত' পত্রিকায় ছোটগল্প লিখি প্রথমে, তারপর উপন্যাস লিখেছিলাম।

অনিল চাটুয্যেকে নেওয়া হলো সর্দারজীর ভূমিকায়, মহুয়া করেছিল নায়িকার রোল, নায়ক ছিল পুনা ফিল্ম ইনষ্টিটিউটের একটি ছাত্র। এর প্রযোজক ছিলেন কাজল সেনগুপ্ত আর তার এক বন্ধু। কাজলবাবু তখন কনট্রাকটারি করেন।

মাইথনের ট্যুরিষ্টলজ ডি-ভিসির জনতা নিবাসে শিল্পী, কলাকুশলীরা থাকেন, পুরো আউটডোরেই ছবির কাজ হয়েছিল ছবি শেষের মুখে, বোম্বাই থেকে ফাইটার টিম এনে ওখানেই দারুণ সব অ্যাকশনের সিন টেক করা হলো। কিন্তু দুই প্রযোজকের মধ্যে এবার কি মতান্তর হলো জানি না। সে ছবি আর হলো না। ওই ছবির বক্তব্য—আর অনিল চাটুয্যের প্রাণঢালা অভিনয় ছবিকে নিশ্চয়ই একটা বিশেষ পরিচিতি এনে দিত। কিন্তু তা হলো না। আমার একটা ভালো কাহিনীর সার্থক অপমৃত্যু হলো।

সেই প্রযোজকদের একজন কাজল সেনগুপ্ত আজ বিরাট শিল্পপতি বেঙ্গল এমটার কর্ণধার, পরে জ্যোতি রায় আর একটি ছবি করেছিলও মহুয়াকে নিয়ে। আমারই কাহিনী চিত্রনাট্য—ছবির নাম জবাব। এই ছবিও বেশীর ভাগই আউটডোর ভিত্তিক। কলকাতার অদূরে ভেড়ি এলাকাতেই এর শুটিং হয়েছিল, প্রযোজকই হয়ে গেলেন নায়ক। জ্যোতিকে এই ভাবে আপোস করতে হলো। ছবি শেষ হবার মুখে

মহুয়া মারা গেল। পুরো শুটিং করতে পারে নি। কোনমতে জোড়া তালি দিয়ে এ ছবি শেষ করা হলো।

মোটামুটি চলেছিল, তবে মহুয়া পুরো কাজ করতে পারলে এটি ভালো ছবিই হতো।

বোম্বে থেকে শক্তিবাবুর ছেলে অসীম এসেছে। শক্তিবাবু লিখেছেন অন্যায় অবিচারে বাকি আউটডোরের কাজ ওই মহীপুরের লোকেশনের সঙ্গে মেলে এমনি ঠাই বের করতে হবে সেখানে বাংলাদেশের শিল্পী এখানের শিল্পীদের নিয়ে শুটিং করতে হবে। আর বাংলাদেশ যেভাবে এদের রেখে শুটিং করার সুবিধা করে দিয়েছিলেন তেমনি ব্যবস্থা করতে হবে।

অসীম প্রণববাবুর মুখে শুনেছিল জগৎবল্লভপুরের কথা, সুন্দর গ্রাম—খালও আছে সবুজ গাছ-গাছালি। সেখানেও অনেক ছবির শুটিং করা হয়েছে। অসীম বলে চলুন, ওই জায়গাটা দেখে আসি।

বড় গাছিয়া ছাড়িয়ে কিছু দূরে ওই গ্রাম। সেখানে চণ্ডীমাতা ফিল্মস-এর কর্ণধার নারায়ণবাবুর বাড়ি। গ্রামের জন্য অনেক কিছু করেছেন। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ঘুরেটুরে দেখে মনে হলো যেন ওই প্রকৃতির সঙ্গে মিলছে না, কিছুটা রুক্ষ। আর আশপাশেই সমৃদ্ধশালী জনপদের চিহ্ন, প্রকৃতির আদিম নির্জন রূপের কিছুটাও নেই।

অসীমকে বলি আমার ঠিক চোখে ধরছে না। শক্তিবাবুরও পছন্দ হবে না।

অসীম বলে, আমারও ঠিক মনে হচ্ছে না।

ছবির লোকেশন বাছা কঠিন কাজ। সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চল হলে কিছুটা মিলবে। বে অব বেঙ্গলের ধারেকাছে জায়গাই খুঁজতে হবে এখানেও। তাই দীঘাতেই এলাম। সমুদ্র, বালুচরে মাছের বাজার, নৌকা মাছমারার দল সবই প্রায় মিলে যায়। গ্রামের কিছু সিন, ওখানের বাকি গানের টেকিংও করতে হবে।

এখানেই বের করলাম তরুণ প্রণব করকে। বরফকল ট্রলার মাছের ব্যবসাপত্র আছে, এদিকের ভিতরের গ্রামে বাড়ি। দীঘায় ব্যবসাপত্র, বরফ কল, এ আমার প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুবাবুদের আত্মীয়।

তখনও ওদের হোটেল ব্লুভিউ তৈরি হয়নি। আমরা হোটেল 'সী হকে' উঠেছি। প্রণববাবুকে সব বলতে প্রণববাবু বলেন, আর অমনি গ্রাম সবই পাবেন। এই এই জায়গাগুলোতে ঘুরুন, তারপর এখানে শুটিং যদি করেন সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে জায়গা দেখে আসুন।

প্রণববাবুই একটি ছেলেকে সঙ্গে দিলেন। সে আমাদের ওইসব গ্রামের ভিতরে নিয়ে যাবে।

পরদিন সকালে বের হলাম, দীঘাই গেছি, বীচ, চন্দনেশ্বরের মন্দির লেক এই

সবই দেখেছি, আশপাশের গ্রামের ভিতরে, যাইনি। অন্যায় অবিচারের লোকেশন খুঁজতে এবার চন্দনেশ্বর ছাড়িয়ে সমুদ্রের উপকূলের দিকে গ্রামের পথে ঘুরছি। মাঠ-বন-নারকেলবন—মাটির ঘর—চাষীর বাড়ি, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে গ্রামে ঘুরে অসীম বলে—অনেকটা মিলছে তেমনি একটা ভাব আছে।

'খেয়ে ওই লাথি ল্যাং' গানটার প্রথম দিকের কিছু ওখানে শুটিং করা হয়েছিল, তার বাকি অংশ এখানে করতে হবে। তেমনি গাছ-গাছালি ঘেরা পথ, পাকাপুকুর, বন সবই আছে।

নৌকায় ডাকাতির দৃশ্য, মাছের আড়তের আশপাশ সবই তেমনি। আর দীঘাতে থাকার ব্যবস্থাও ভালো হবে। লোকেশন চার-পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেই। এখানেই লোকেশন ঠিক করে শক্তিবাবুকে জানানো হলো।

শক্তিবাবু এলেন। সারা অঞ্চল ঘুরে, দূর সমুদ্রতীরবর্তী বসতি ঘুরে তাঁরও পছন্দ হলো। নৌকায় ডাকাতি টেজ এগুলো তোলা হয়নি। প্রণবাবু বলেন সমুদ্রে ওসব করা যাবে না তবে সুবর্ণরেখা নদীতে করা যেতে পারে।

বাংলা-উড়িষ্যা দুটো ছোট কাজ করতে হবে। সেদিন বের হয়েছি আমরা প্রণববাবুই গাইড, উড়িষ্যাতে ঢুকেই পথের ধারে বেশ কিছু লোকের জটলা। গাড়ি থামালাম দেখি কার্তিকেশ্বর পাত্র আর স্ত্রী উমা পাত্রকে। কার্তিকবাবু এসে প্রণাম করে শুধোন এদিকে দাদা আরে প্রণব যে আমি কার্তিকবাবুর সঙ্গে শক্তিবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলাম, প্রণব ওঁর চেনাই। কার্তিকবাবু ওই এলাকার এম-পি-আর ওর স্ত্রী উমা দেবী ওই অঞ্চলের এম-এল-এ।

চন্দনেশ্বরের থেকে একটু দূরের গ্রামে ওদের বাড়ি। কার্তিকবাবু রাজনীতিকই না উড়িয়া ভাষার একজন পরিচিত সাহিত্যিক। তিনি আমার বেশ কিছু উপন্যাস উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সেই সুবাদেই পরিচয়।

বইগুলো কেমন চলছে খবর নিতে প্রণব বলে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে এখানেও ওই বই-এর খবর? কার্তিকবাবুকে বলি, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো। শক্তিবাবু ইউনিট নিয়ে উড়িষ্যার এই অঞ্চলের গ্রামে সুবর্ণরেখা নদীতে শুটিং করবেন গাড়ি লোকজন যাতায়াত করবে এখানের থানাকে বলে দেবেন যেন এদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

উমা দেবীই বলেন—দাঁড়ান দাঁড়ান, ওসিও এসেছেন ওঁকে ডাকছি।

ওঁই অঞ্চলের ওসি ভদ্রলোকও সবশুনে বলেন আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। এনি প্রবলেম—আমাকে জানাবেন।

তালসারি বীচে যারা গেছেন দেখেছেন প্রথমেই একটা জলধারা, তার ওপারে বীচ, বেশ বালিয়াড়ি কিছু ঝাউবনও আছে, তার পর সমুদ্র, এই জলধারাটা সমুদ্রের জলধারা নয়, এটা সুবর্ণরেখার একটা অংশ এখানে সমুদ্রে মিশেছে আর বৃহত্তর সুবর্ণরেখা সমুদ্রে মিশেছে আগে সেটা বিশাল বিস্তীর্ণ।

প্রণববাবুর মাছের কারবার, এখানের একটা ট্রলারে চেপে আমরা তিনজন সুবর্ণরেখার এই খাড়ির উজানে যাত্রা শুরু করলাম, তখন ভাঁটার টান। সবুজ তীর ভূমি, গ্রাম ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল, বাড়ছে নদীর বিস্তার আমরা সুবর্ণরেখার মূল ধারার কাছে এসেছি নদী এখানে দিগন্তপ্রসারী, টাটা, ঘাটশিলার সুবর্ণরেখার সোনালি বালুচরে নৃত্যরতা চঞ্চল রূপ আর নেই, সাগরের ডাকে সে এখন উত্তাল, ভয়ংকরী, উন্মত্তা।

ট্রলারগুলো ডিজেল ইঞ্জিনে চলে, তবে লঞ্চের মতো এদের স্টিয়ারিং নেই লোহার একটা মোটা ডান্ড হালের সঙ্গে ফিট করা, ওই ডান্ডা চেপে ধরে ট্রলারের গতি নির্ধারিত করা হয়।

ওই ডান্ডার পিছনে কাঠের একটা ছোট প্লাটফর্ম মতো। ট্রলারে উঠে শক্তিবাবু ওই প্লাটফর্মে বসেছেন, সব ট্রলার চালু হয়েছে. প্রণববাবুই বলেন, ওখান থেকে সরে আসুন এদিকে বসা যাক।

শক্তিবাবু সরে এসে এদিকের পাটাতনে বসলেন। ট্রলার চলছে, হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠে চাইলাম, যে ট্রলারের হালের ওই ডাণ্ডাটা ধরে চালাচ্ছিল হঠাৎ ট্রলার একটা ঢেউ-এর আবর্তে পড়তে ওর হাত থেকে সেই ডাণ্ডাটা ফসকে গিয়ে সপাটে সেই কাঠের পার্টিশানে ঘা মেরে আধইঞ্চি পুরু কাঠের তক্তাকেই ফাটিয়ে দিয়েছে। সারেং অবশ্য পরে সামলে নিল হালটাকে।

ওইখানেই শক্তিবাবু দাঁড়িয়েছিলেন, ওই হালটা সপাটে লাগলে কি হতো কে জানে? প্রণববাবু জানেন ওই কর্ম ঘটতে পারে তাই সরিয়ে নিয়েছিলেন।

এবার সুবর্ণরেখার মোহানায় ছোট বড় অসংখ্য বদ্বীপের সন্ধান মেলে। জোয়ারের কিছু ডোবে কিছু জেগে থাকে। এইখানেই নৌকার ডাকাতি, ফাইট অ্যাকসনগুলো নেওয়া হবে। সবকিছু নোট করে চলেছি চিত্রনাট্যের সিনে। সিনে অনুসন্ধানের বেলাতেও বিভিন্ন লোকেশনের সিন চার্ট করা ছিল, এখানেও সহকারীরা যাতে লোকেশনের সিন চার্ট করতে পারে তাই লিখে রাখছি। এতে পরে কাজের সুবিধা হয়। সিন অনুযায়ী লোকেশনে গিয়ে ঝটপট কাজ শুরু করা যায়।

ফিরছি এবার, তালসারিতে এসে দেখি জোয়ারের ঢল এসেছে। তীরভূমি অবধি জল ঠেলে এসেছে। তখন ভাটার সময় বালি-জল ভেঙে ট্রলারে উঠেছিলাম ট্রলার তীর অবধি যাবে না এখান থেকে নেমে নৌকায় করে তীরে যেতে হবে। প্রণববাবুর হাকডাকে একটা ছোট নৌকা এগিয়ে এলো।

সমুদ্র মাঝ ধরার নৌকায় কখনও উঠিনি, সুন্দরবন গঙ্গায় যে নৌকা চলে সেই ধরনের নৌকাকে এরা বলে সুচিয়া, এগুলো অন্য ধরনের। ভিতরটা পুরো ইউ আকারের পাটাতনও নেই কয়েকটা কাঠ মাঝামাঝি আছে, তাতেই কোনরকমে বসে দাড় টানে, নৌকাটা ঢেউ-এ একবার একাত আবার ওকাত হয়।

নৌকাটা তীরের দিকে অমনি হেলে দুলে একাত ওকাত হয়ে আসছে, তীরের কাছাকাছি এসে জোরসে কাত মারতে আমিই ছিটকে পড়লাম নৌকা থেকে জলে। জল বেশি নেই, তবু কোমর ভোর জল, আর তেমনি কাদাগোলা জল।

একেবারে কাঁইমাখা দমের আলুর মতো অবস্থা। কোন রকমে কাদাজল ঠেলে উপরে উঠলাম, আমার ওই মূর্তি দেখে প্রণববাবু শক্তিবাবুর সমবেদনার লেশমাত্র নেই, পরম আনন্দে ওরা হেসেই সারা।

প্রণববাবু বলে, নদীনালা নিয়ে লিখবেন, কাদা মাখবেন না, তাই কি হয়? একটু কাদাটাদা মাখুন।

মনে পড়ে মানিক দত্তের কথা। অমানুষে উৎপলবাবুর চামচা। ডিসেম্বরের বৈকাল, নদীর ঘাটে একজনের নৌকা দখল করে নিতে যাবে বকেয়া টাকার জন্য— উত্তমবাবু দুই চেলা তাকে ফেলে ওই সুন্দরবনের নোনাগাং এর কাদা মাখিয়ে ভূত করে দেবে।

সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস, কনকনে ঠাণ্ডা বৈকাল, তখন ওই দৃশ্যটা টেক করা হয়েছিলো। পদার দল সত্যিই তাকে পেয়ে মানিকবাবুকে ডবল কাদা মাখিয়েছিল সট হয়ে যাবার পর কর্দমাক্ত মানিকবাবু সামনে আমাকে দেখে বলে—আর লিখতে কিছু পারলেন না? কাদা মাখিয়ে ভূত বানালেন।

আজ নিজেই আধা ভূত হয়ে গেছি।

এমন এক অভিনেতার বিড়ম্বনা ঘটেছিল 'অনুসন্ধানে'। শক্তিবাবুর প্রডাকশন ম্যানেজার মনোজ অধিকারীর অবস্থা বেশ ভালো। এত বড় ফিল্ম কোম্পানির প্রডাকশন ম্যানেজার শক্তিবাবু ওর সামনেই বলতেন আমার বাড়িতে যা নেই তা মনোজের বাড়িতে আছে। শুনতাম ইউনিটের লোকদের সে টাকা সুদে ধার দিত। সকলের মাইনে বাড়লে ওর মাইনে প্রথমে বাড়াতেন না শক্তিবাবু। বলতেন তোমার মাইনে বাড়ার কি দরকার বলো তো মনোজ? পরে অবশ্য বাড়তো। তবে মনোজ ছিল দারুণ করিতকর্মা। বোম্বে শহরে বসে সে বাঘের দুধও এনে দিতে পারত. কলকাতা ফিরতে হবে। টিকিট নেই। মনোজ কোথা থেকে চক্কর চালিয়ে ঠিক বার্থ-এর টিকিট এনে দিত।

মনোজের একটা দুর্বলতা ছিল সে অভিনয় করবেই, যে কোন রোলে হোক শক্তি ফিল্মস্-এর অনেক বই-এ সে আছে। অনুসন্ধানে ঠিক হল সে মদের দোকানের মালিকের রোল ওদিকে আমজাদের দুই অনুচর অমানুষের পদার দল তরুণ আর সুব্রত মহাপাত্র এখানেই ওই দুটো রোল করছে। তরুণ কথা বলে সুব্রত হাবাকালা. দুজনে স্টুডিওতে এসে মনোজকে তাদের গাড়িভাড়ার জন্য দাবি করে মনোজও দেবে না। তাই নিয়েই বাধে ওদের ঝগড়া।

মনোজ মদের দোকানের মালিকের রোল করছে। সেখানে আমজাদ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দুই সঙ্গীকে নিয়ে মদ খেতে এসে মদের দোকানের মালিকের মুখে জেল খাটা কয়েদী শুনেই ওকে মারতে যাবে, আর গোলমালের ভয়ে ওর চ্যালা দুজন আমজাদকে টেনে নিয়ে যায়, নাহলে আমজাদ ওকে মারতই। ওই চ্যালা দুটোই তরুণ আর সুব্রত। আমি ওদের ঝগড়া দেখে বলি—তরুণ, কাল এই রোল করছে মনোজ, তোমরা সময়মত আমজাদকে টেনে না নিয়ে গেলে আমজাদ ওকে দুচার ঘা বসিয়েই দেবে শট নষ্ট হতে দেবে না।

ওই দুই মূর্তিও খুব চালু। তরুণ বলে, বাস! মনোজদা, আজ গাড়িভাড়া দিলে না কাল মজা বুঝবে, সুব্রত, খবরদার আমজাদকে টেনে নিবি না, দুচার ঘা দেবার পর ওসব করা যাবে। চল—দরকার নেই গাড়িভাড়ার মনোজ চুপ করে ওদের কথাটা শুনে বলে আমাকে।

—একি করলেন দাদা? ওদের চেনেন না ওরা ডেঞ্জার আদমী, সব পারে। সত্যিই মনোজ গিয়ে শক্তিবাবুর চেম্বারে ঢুকে বলে। —ওই রোল আমি করবো না দাদা। দুর্ভোগের ভয়ে মনোজ ওই চরিত্রটা আর করেই নি। আজ অমিও তেমনি দুর্ভোগেই পড়েছি। হোটেলে এসে ওসব ছেড়ে ফেলে স্নান করে ফ্রি হলাম।

এবার থাকার ব্যবস্থাদির কথা ভাবছেন ওরা। 'সি হক' হোটেল পুরো চাই পনেরো দিনের জন্য। প্রণববাবু সুধাংশুবাবুদের ব্লু ডিউ হোটেল তখন তৈরি হয়নি। পাশেই হোটেল ডলফিন টাকে পুরো বুক করে নিলে পনেরো দিনের জন্য, আর টেকনিয়ান্স জুনিয়ার আর্টিস্টদের জন্য পুলিশ ক্যাম্প করার জন্য সরকারি সব কটেজ নিরালা সব বাড়িগুলোই বুক করা হলো।

এবার পুলিশ কর্তৃপক্ষকেও জানানো হলো এটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার। ওদেশের বহু ভি আই পি শিল্পীরা আসবেন, মিঠুন উৎপলবাবুরাও থাকবেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষও পাঁচিশজন কনেস্টবল একজন সাব ইনসপেক্টারকে দেবেন তারাও ক্যাম্পে অস্থায়ী ফাড়ি বানিয়ে থাকবেন, ঘুরবেন শুটিং পার্টির সঙ্গে। তারজন্য ইউনিট থেকেই তাদের আলাদা গাড়ি, থাকার জায়গা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

পানিমারুলের পথে একটা জায়গা আছে দীপাল বাজার ছাড়িয়ে, সেখানে মাঠের মধ্যে বিশাল বালির ঢিপি, বালিয়াড়ি, কাজু বাদামের বন সব আছে। সুন্দর একটা বৈশিষ্ট্যময় লোকেশন। ওটা দেখতে গেছি শক্তিবাবু হঠাৎ বলেন ব্যাঙ্কে তিন লাখ টাকা জমা করতে দিয়ে এসেছি রসিদটা নিই, চলুন ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে।

এরা যেখানে শুটিং করতে যান সেখানের ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রাখেন হঠাৎ দরকারের জন্য। ব্যাঙ্কে সেটা রেখেই চলে এসেছেন, ফিরে রসিদপত্র নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

ওরা দীঘায় এসেছেন শুটিং করতে। দীঘায় তখন পাম্পে ডিজেলই মিলত। পেট্রল মেলে না। প্রণববাবুর কথায় পাম্প মালিক এদের গাড়ির পেট্রলের ব্যবস্থাও করলেন ব্যারেল দরুণে পেট্রল এসে।

বাংলাদেশের শিল্পীরাও এসেছেন। মহা সমারোহে শুটিং পর্ব শুরু হলো গ্রাম গ্রামান্তরে। অমানুষ-এর পর থেকে বাংলায় শুটিং করলেও শক্তিবাবু কিছু ইলেকট্রিসিয়ান কিছু ক্রাউড, মেয়েপুরুষ ছাড়া এখানের স্টুডিওতে আর ঢোকেননি, কেবলমাত্র অমানুষ এ উত্তমকুমারের ডাবিং-এর কিছু কাজ করতে হয়েছিল এন-টি ওয়ানে উত্তমবাবু বোম্বে তখন যেতে পারেননি বলে অমানুষ-এর বেদনাদায়ক স্মৃতি ভেলেননি শক্তিবাবু। এদের ইউনিটে একটি তরুণ ড্রাইভার ছিল অনেকটা মিঠুনের মতো দেখতে তেমনি চোখ মুখ, মাথার চুলটাও মিঠুনের মতো করে ছাটা, মিঠুনও রয়েছে আমাদের সঙ্গেই হোটেল ডলবিনে আমাদের পাশের ঘরেই অবসর সময়ে আড্ডাও জমে।

মিঠুন মাঝে মাঝে রাতের মেনুও বলে দেয় হোটেলের রাধুনীদের।

মিঠুনের ছেলেবেলার নাম ছিল গৌরাঙ্গ। ওর বাবা বসন্তবাবু ছিলেন তখন শোভাবাজারের কাছে ডবল ফাইড টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কর্মী। আমার এক আত্মীয়ও ওখানের কর্মী পাশের কোয়ার্টারে থাকতেন। তখন দেখেছি গৌরাঙ্গকে, হ্যাফপ্যান্ট পরা একটি কিশোর।

পরে দেখেছি পুণা ফিল্ম ইন্‌সটিটিউটে। তখন ওখানের ছাত্র। শুনেছি সেখানেই মিঠুন রুটি আর ভোপলার (কুমড়ো) সব্জী বানিয়ে সহপাঠীবন্ধুদের টিফিনের ব্যবস্থা করতো।

পরে দেখেছি বোম্বের পালি নাকার কাছে সিনেমার এত কাজের মধ্যেও একটা দিশি রেস্তোরাঁ করেছিল, 'টেষ্টি'। সেখানে বিশুদ্ধ বাঙালি খানা, কড়াই-এর ডাল, পোস্ত-চচ্চড়ি, শুকতো, ইলিশ মাছের ঝাল সব মিলত। অনেকেই খেতেন সেখানে। আমিও মুখ বদলাতে খার থেকে অটো নিয়ে সেখানে লাঞ্চ করতে যেতাম। এছাড়া ওই অঞ্চলের বেশ কিছু হোটেলে অনেক কলকাতার লোক যেতেন নানা কাজে, ফোন করে দিলে হোটেলেই মিঠুনের দোকানের লোক হটপটে সব খাবার হোটেলে সময়মত পৌঁছে দিত।

সিনেমার পাশাপাশি এই ব্যবসাও শুরু করে সেই অভিজ্ঞতা থেকে আজ মিঠুন উটিতে বিরাট 'হোটেল মনার্ক' করেছে। দূর বন পাহাড়ে সুন্দর রিসর্ট করে মানুষদের মুক্ত প্রকৃতির মাঝে নিয়ে গেছে। সবসময়ই গড়তে চেয়েছে। মানুষের জন্য কিছু করতে চেয়েছে। প্রচণ্ড বন্ধু বৎসলও ওর অতীতের দিনগুলো কেটেছে অভাব আর প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সেই দুর্দিনের বন্ধুদের জন্য ও সব সময় কিছু করেছে।

কাউকে ছবির পরিচালক বানিয়েছে, তার জন্য নিজে অনেক আর্থিক ক্ষতিও সহ্য করেছে। তবু বন্ধুকৃত্য করেছে, কলকাতার ছেলেবেলার বন্ধুদেরও ভোলেনি মিঠুন।

ওর দুর্বলতা সাত এর উপর। বাড়িতে কুকুর ছিল সাতটা, বাড়ির নম্বরও সাত, আর ওর ফ্ল্যাটও ছিল সাততলায়। উটির হোটেলের নাম খুঁজলে দেখা যাবে সেটার অক্ষর সংখ্যাও সাতই।

ওর মনটা খুবই নরম।

'উল্টোরথ' বন্ধ হয়ে যায়। পরে হাতবদল হয়ে মিঃ আগরওয়ালের পরিচালনায় 'উল্টোরথ' আবার নবকলেবরে প্রকাশিত হতে থাকে। সেই পত্রিকার সম্পাদনার কাজ আমি কিছু দিন করেছিলাম। সেই সময় আমার অনুরোধে মিঠুন পাঠকের চিঠির উত্তর দিতেন ওই পত্রিকায়।

ওর নির্দেশ ছিল মামুলী চিঠির জবাব আমার তরফ থেকে আপনারা দিয়ে দেবেন, কিন্তু কেউ কোন সাহায্যপ্রার্থী রূপে চিঠি দিলে সেগুলো আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, সে সব চিঠির উত্তর আমি নিজে দেব।

সাহায্যপ্রার্থী হয়ে অনেকেই চিঠি দিতেন, সেগুলো ওর কাছেই পাঠানো হত, আর পরে সাহায্যপ্রার্থীরা যে মিঠুনের কাছে বিফল হয়নি সে খবরও পেতাম। মিঠুন নীরবে এইভাবে বহু আর্ত মানুষের সেবা করে চলেছেন।

মিঠুনকে দেখার জন্য ভিড় সামলাতে পুলিশবাহিনী হিমসিম খেয়ে যায়।

সেদিন আমি শক্তিবাবু আর হাসান ভাই ফিরছি শুটিং স্পট থেকে একটা বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেই গ্রামে। বোধ হয় গানের পিকচারাইজ করা হচ্ছিল। মাঠে লোকের ভিড়। পরে শুটিং শেষ হতে চার-পাঁচ জন লোক এগিয়ে আসে। লোকের পায়ের চাপে তাদের বাদাম ক্ষেতের গাছ সব নষ্ট হয়ে গেছে, পাঁচশো টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হবে।

ভিড়ের চাপে কিছু ক্ষতি হয়েছে জমির। শেষ অবধি রফা হয় চারশো টাকার। ওরাও নিমরাজি হয়ে টাকা নিতে যাবে এমন সময় একটি তরুণ মোটরবাইক থেকে নেমে এগিয়ে আসে। বন্ধুই। ব্যাপারটা শুনে সে হঠাৎ ওই লোকগুলোকে ধরতে যায়। দুজন পালায়, ধরে ফেলে দুজনকে। তরুণটি বলে।

—জমি আমার, ফসল গেল আমার আর তোরা কে যে ক্ষতিপূরণ নিতে এলি?

তারপর ছেলেটিই তাদের দুচার ঘা চড় চাপড় দিতে তারাও পালায়। আমরাও অবাক। হঠাৎ প্ল্যান করে লোকগুলো কিছু দমকা রোজগারের পথ বের করেছিল নকল মালিক সেজে।

নকল নিয়ে ঠিক তেমনি বিপদেই পড়েছি এবার। ওই নকল মিঠুন আমাদের ড্রাইভার। ফিরছি আমরা তিনজনে। দীঘা বাজারে হঠাৎ কে আবিষ্কার করে। মিঠুনের গাড়ী ওই যে। সঙ্গে সঙ্গে গণদেবতার হাতে ঘেরাও হয়ে পড়ি। মিঠুনকে তারা নামাবে। ছেলেটিও বিব্রত। বলে সে—একি করছেন আমি নই।

নামুন মিঠুনদা! আর নাটক করতে হবে না।

আমরাও বোঝাতে পারি না। গাড়ি ওরা জোর করে খুলে নামাবেই মিঠুনকে, গাড়িতে ভক্তদের দুমদাম করাঘাত চলছে, কাঁচ ফাঁচ না ভাঙে এবার। শেষে পুলিশের আবির্ভাবে জনতা শান্ত হয়। আমরাও বের হতে পারি।

বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে প্রখ্যাত এক বাংলাদেশের সাহিত্যিকের স্ত্রীও বয়স্কা মহিলা। মায়ের অভিনয় করেছিলেন। খুবই ভদ্র আর অভিনয়ও করেন অপূর্ব। ওদের দেখে মনে হয়েছিল ওরা আমাদের শিল্পীদের থেকে কোন অংশেই কম নন।

বাংলাদেশের গল্প-চিত্রনাট্য-অভিনয় সবই একটু চড়া সুরে বাধা। তাই তাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লাউড অভিনয়ই করতে হয়, তাতে সূক্ষ্ম শিল্প সৌষ্ঠব ফুটে ওঠে না। তার তুলনায় আমাদের তখনকার ছবি ছিল কিছু স্বাভাবিকতার সুরে বাঁধা। সেখানে অভিনয়ও স্বাভাবিক চাই। ওরা সেই স্বাভাবিক অভিনয়ের মধ্যেও চরিত্রের সব রং কালার শেডকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এই রীতিতে কাজ করে তারাও খুশি হয়েছিলেন।

এরপর বোম্বাই-এর ফিল্ম সিটির জলাশয়ে ওই কুমীরের সিনগুলো নিতে হবে। একটা ছিল নকল কুমীর, অন্যটা ছিল আসল কুমীরই। দক্ষিণ ভারত থেকে আনা হয়েছিল। ওই আসল নকল কুমীর দিয়েই কায়দা করে শট নিয়ে সেই আসল নকলের ভেলকি মিশিয়ে শক্তিবাবু ওই মানুষ কুমীরের লড়াইকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন।

'অন্যায় অবিচার' মুক্তি পেল কলকাতায়, মফঃস্বলে। কিন্তু অমানুষ, আনন্দ আশ্রম, অনুসন্ধান কলকাতার বুকে যে সাড়া তুলেছিল এটা তেমন সাড়া প্রথমে আনতে পারেনি। শক্তিবাবুও ভাবনায় পড়েন।

কিন্তু পরিবেশক দাগাজী বলেন, ফিকির মৎ কিজিয়ে শক্তি সাব, ই পিকচারমে দম্ হ্যায়। ই পিকচার জরুর বিজনেস করে গা।

দাগাজীর পুরো নাম শিউবক্স দাগা। ফিল্ম পরিবেশনার জগতে খুবই পরিচিত নাম। কলকাতার বড় পরিবেশকদের অন্যতম। তখন কিছু প্রযোজক ছিলেন তারা ছবি করতেন নিয়মিত, তাদের কিছু টাকা থাকত, বাকিটা এই পরিবেশকরা দিতেন, দুজনের সমবেত মূলধনে ছবি হত। সেই ছবির মার্কেটিং-এর দায়িত্ব ছিল পরিবেশকের উপর। তার স্বার্থে তিনিও চেষ্টা করতেন ছবি বিভিন্ন হাউসে চালিয়ে টাকা তুলতে। তাতে দুই পক্ষেরই লাভ হত।

প্রযোজক ছবি শেষ করার পর ছবি চলে যেত পরিবেশকের হাতে। ছবির সব ব্যবসার খবর পরিবেশক ইচ্ছা করলে প্রযোজককে না দিতেও পারতেন।

এরকম পরিবেশক যে ছিল না তা নয়, তারাই ছবির সব রসটুকু আহরণ করে

নিজেরা পয়সা লুটতো আর প্রযোজককে অন্য হিসাব দেখিয়ে বলতো-পিকচার চলছে না। আমার টাকাই উঠল না আপনার টাকা উঠবে কি করে?

এইভাবে বহু প্রযোজককে পরিবেশকরা লুট করেননি তা নয়। ফলে অনেক নতুন প্রযোজকরা সরে গেছেন, আর অর্থের বল, লোকবল যাদের ছিল, এ ব্যবসা বুঝতেন তারা নিজেরাই প্রযোজক, পরিবেশক হয়ে ব্যবসাতে লাভও করতেন। ওই ধরনের পরিবেশকদের হাতে যেতেন না।

দাগাজী শক্তিবাবুর সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। দুজনে দুজনকে ভাই এর মত দেখতেন। শক্তিবাবু কলকাতায় এলে দাগাজী তার সর্বক্ষণের সঙ্গী সকালে সন্ধ্যা হোটেলে যেতেন। ছবির হিসাব পত্র ঠিক মত দিতেন। দুজনে দুজনকে বিশ্বাস করতেন। শক্তি ফিল্মসের এটা ছিল যেন কলকাতার অফিস। চিত্রনাট্য পাঠাতে হবে-দাগাজীর অফিসে পৌঁছে দিয়ে খালাস, বোম্বাই যেতে হবে। ওর অফিসে বলে দিলেই ট্রেন, প্লেনের টিকিট বাড়ি পৌঁছে যাবে। ফোনে কথা বলতে হবে-দাগাজীর অফিস থেকেই বোম্বেতে কথা বলতাম।

শক্তিবাবু সাধারণত একটা করে ছবির কাজই করতেন। মাঝে মাঝে বড় জোর দুটো ছবির কাজ তাও ধীরে সুস্থেই করতেন। বলতেন একটা চিন্তা ভাবনাকে নিয়েই থাকতে হয়। একটা ভালো ছবি করতে গেলে প্রধান সহকারীকেও বলতেন। এটা নিয়েই ভাবো সত্যজিৎবাবু ঋত্বিক, নিউ থিয়েটার্সের হেমচন্দ্র, বিমল রায়দের একটা করে ছবিই করতে দেখেছি। তরুণবাবু, তপন সিন্‌হাও একটা ছবি শেষ করে তবে অন্য ছবির ভাবনা করতেন।

কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল বাংলা ছবির বাজারে হঠাৎ এক শ্রেণীর পরিচালক গজিয়ে উঠলেন। তারা বুঝেছিলেন উত্তর বাংলায় এখন নানাভাবে বাণিজ্য করে একশ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর টাকা এসেছে। তারা সেই ধরনের কিছু লোককে প্রভাবিত করে ছবির জগতে আনলেন। যোগ্য লোকের হাতে যদি তারা তাদের ছবির ভার দিতেন হয়তো লাভবান হতেন তারা। ছবির জগতেও নতুন প্রযোজক কিছু আসতেন। কিন্তু সেটা হলো না। যারা ছবিতে কাজ তেমন করেন নি, তাদের হাতেই পড়লেন সেইসব ভুঁইফোড় পরিচালকদের স্টুডিও অফিসের বোর্ডে এক সঙ্গে পাঁচ-ছ'খানা করে ছবির ফর্দ থাকত। তার মধ্যে দু'একখানা ছবি শেষ হয়ে ধরাশায়ী হতে দেখে বাকি প্রযোজকরাও পিঠটান দিলেন। আর সেই বিশাল পরিচালকরাও হারিয়ে গেলেন। তারা গেলেন-যান, কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন প্রযোজকদের মনে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন।

এখনও দু'একজন পরিচালক টলিউডে আছেন। তারা ছবি করছেন, কোনও ছবির খর্চাও ওঠে না। সেই প্রযোজক বসে পড়েন। এরা আবার নতুন কোন ব্যক্তিকে কী মন্তর পড়িয়ে আনেন। ছবি হয় সেটাও ফ্লপ। তিনি গেলেন, আবার

অন্যজনকে বলি দিতে ধরে আনলেন। এরা কি মন্ত্রে প্রযোজকদের বশ করেন তা টলিউডের অনেক কাজজানা পরিচালকের জানা নেই। তারা ছবি পান না। পেলে নিশ্চয়ই ভালো ছবি করতেন। আর নামী পরিচালক একসঙ্গে চারখানা ছবি করেছিলেন—তিনি ছবির কাজ জানেন, হিট ছবিও করেছেন। চাপে পড়ে চারটি ছবি করতে গিয়ে ছবির ঠিক মান বজায় রাখতে পারেননি।

শক্তিবাবু একখানা ছবির পরিকল্পনা করলেন। দাগাজীকে জানালেন ছবি শুরু করছি। এত টাকা বাজেট। বাংলার জন্য এত টাকা লাগবে। প্রথম কিস্তিতে হয়তো দাগাজী পনেরো লাখ টাকা দিলেন।

শক্তি বাবু বোম্বেতে ছবির কাজও শুরু করেছেন। এবার ডাক পড়তো আমার। দাগাজী ওর চেম্বারে বসিয়ে দরজা বন্ধ করে বলতেন,—'বাবু', ক্যা স্টোরি বাতাও'। শক্তি সবে ছবি করছেন। দাগাজী ছবি নেবেন। লেনদেনও হয়ে গেছে। দরদামের কথা বলতে পারেন দাগাজী শক্তিসাবকে, কিন্তু গল্প শোনান একথা বলার সাহস প্রয়োজন কিছুই ছিল না। দাগাজী জানতেন তার টাকা পাঁচগুণই হবে। এবার আমাকে ডেকে ওই কথা। আমি বলি, আপনি শক্তিবাবুর কাছে গল্প শোনেননি? দাগাজী অসহায় কণ্ঠে বলেন—কুছ বোলতা নেহি, তুম্ শোনাও। তারপর শক্তিবাবু যদি জানতে পারেন কি ভাববেন? আমার কথায় দাগাজী বলতেন, উন্‌কো কুছ নেহি বাতায়েগা বলো—

দাগাজীর ছবির হিসাব ছিল আলাদা। ফাইন্যাল প্রজেকশন দেখে দাগাজীও নিশ্চিন্ত। ছবির বোদ্ধা দর্শক শক্তিবাবুর ড্রাইভার বাহাদুর। সেও বলতো গম্ভীরভাবে পিকচার চলেগা। দাগাজীও নির্ভয়। ছবি একটার পর একটা হিট। গৌরীপ্রসন্নদা, আমি গেছি শক্তিবাবুর পার্ক হোটেলের স্যুটে। যথারীতি দাগাজী আছেন। এবার মফস্বল যেতে খবর আসছে অন্যায় অবিচারের অভূতপূর্ব সাফল্যের। সর্বত্র সব শো হাউস ফুল। দাগাজী বেশ মোটাসোটা ভারি চেহারার মানুষ। গৌরীদা বলতো—দাগাজী আপ্‌কা তোন বড়া সে বড়া করনেকে লিয়ে তিনো হারামজাদ জনম্ লিয়া। এক নাম্বার শক্তি সামন্ত, দো শক্তি রাজগুরু আর তিন এহি গৌরীপ্রসন্ন। দাগাজী গৌরীদার আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে বলতেন, বহুৎ বকোয়াস করতা তুম্।

বাংলা ফিল্মে প্রথম 'অমানুষই' দেখিয়ে ছিল যে ভালো বাংলা ছবি হলে দর্শকের অভাব হয় না। এ ছবি তখনকার বাজারে কোটি টাকা লাভ করেছিল এবং এখনও এ ছবি দর্শক টানছে। মৃতপ্রায় বাংলা ছবিতে জোয়ার এসেছিল আবার অমানুষ-এর সাফল্যের পর।

আবার বিপদেরও ঝড়ো মেঘ দেখা দিল অন্যায় অবিচারের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর পূর্ব বাংলার পটভূমিকায় এর আগে বাংলায় নামী শিল্পীদের নিয়ে ভালো ছবি আসেনি, পূর্ববাংলার শিল্পীরাও এতে অভিনয় করেছেন, দুদেশের মধ্যে এই ছবি

একটা সাংস্কৃতিক মেল বন্ধন ঘটালো। হিন্দু মুসলমান আবালবৃদ্ধবণিতা এই ছবি দেখেছিল। মফস্বল হাউসে কুড়ি বাইশ সপ্তাহ করে চলেছে। এদেশের মানুষেরও ফেলে আসা বাংলার স্পর্শ যেন খুঁজেছিল এই ছবিতে। তাই ব্যবসার দিক থেকে এটা সব ছবিকে ছাপিয়ে গেল।

আর এবার এখানের হিসেবী ছবি করিয়েরাও বিশেষ করে অবাঙ্গালী কিছু প্রযোজকের মাথায় এইবার নতুন করে বাংলা ছবির বেওসা করার বুদ্ধি গজালো। তারাও এবার চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন আইনের ফাঁক খুঁজতে লাগলেন। এইসময় দিলীপ পালের ছবি লিখছিলাম উনি এর আগে তিনচারটে ছবি করেছেন সেগুলো ভালো ব্যবসা করেছে ভদ্রলোক নিজেও শিক্ষিত, গল্প, চিত্রনাট্য বোঝেন তাই তার ছবি হিট করে আমার তুমি, অন্তরের ভালোবাসা এসব ছবিতে কাজ করেছি। কিন্তু অনেকের সঙ্গেই নানা কারণে ওর মতান্তর হয়েছে কেন জানিনা। তিনিও ক্রমশঃ ছবি করা প্রায় বন্ধই করে দিলেন।

অমানুষের পরে এলেন অঞ্জন চৌধুরী। তার শত্রু ছবিও সুপার হিট করেছিল নিজেই লেখেন, চিত্রনাট্য করেন পরিচালনাও করেন। সংলাপও ভালো লেখেন ফলে তার কিছু ছবি জনপ্রিয়তা পেল। তিনিও ক্রমশঃ বছরে দু তিন খানা করে, ছবি শুরু করলেন কয়েকজন তরুণ সহকারীকে নিয়ে।

তার ছবি পয়সা পাচ্ছে দেখে প্রযোজকরাও লাইন দিলেন তার পিছনে। কিন্তু এত ছবি লিখলে, লেখাতে বৈচিত্র হারিয়ে যাবেই, এক ঘেয়েমিও আসা স্বাভাবিক। অঞ্জনবাবু নিজে লেখেন এক সহকারীকে এটার পরিচালনা ভার দেন। অন্যকেও একটা ছবি দেন আমি অঞ্জনবাবুর এই মানসিকতাকে শ্রদ্ধা করি, ছবির জগত মনে হয়েছে খুবই স্বার্থপরতার জগত, বিনা স্বার্থে কেউ সহজে কিছু করে না কারোও জন্য।

কিন্তু অঞ্জনবাবু তা করেছেন তার সহকারীদের অনেকেই ছবি দিয়েছেন কিন্তু ঘরোয়ানার বনেদীপনা, চিন্তা ধারা, দৃষ্টিভঙ্গী সীমিত গণ্ডীর মধ্যে থাকার ফলে অঞ্জনবাবু যে পরিচিতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন সেটা ঠিক ধরে রাখতে পারেননি বলেই মনে হয়। তার ছবি কালের পরীক্ষায় ছাড়পত্র কি পাবে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তবু সেই কবছর ধরে অঞ্জন চৌধুরী চিত্রজগতে একটি নামে পরিণত হয়েছিলেন।

এই সময় বাংলাদেশের এক পরিচালক, প্রযোজক এলেন আমার কাছে, ঢাকায় অন্যায় অবিচার দেখেছেন? সেই ছবির ওপরে বাংলাতেও দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল স্বপনবাবু সেই ছবি দেখে এখানে ছবি করতে এসে আমাকে দিয়ে তার ছবির চিত্রনাট্য লেখাতে চান।

একটি পারিবারিক ছবি, ছবির নাম করণ করা হলো ঘরের বউ। চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করলাম। ভদ্রলোক গল্প বোঝেন। সেন্টিমেন্ট ইমোশন গুলোকেই প্রাধান্য দিতে

চান নায়িকা করতে চান সন্ধ্যা রায়কে। ভদ্রলোক এখানের চিত্রজগতে নবাগত কেউ তাকে চেনেনা ফলে কোন শিল্পীতে দ্বিগুণ রেট চেয়ে বসলেন, অবশ্য তাকে আমিই অনুরোধ করতে তিনি নায্য পারিশ্রমিকেই কাজ করেছিলেন। সমস্যা হল সন্ধ্যা রায়কে নিয়ে। তিনি নতুন পরিচালক দেখে কাজ করতে ইতি উতি করেন স্বপনবাবুও হতাশ। শেষ অবধি আমাকেই যেতে হলো স্বপনবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যা রায়ের বাড়িতে। ওই বাড়িতে যাতায়াত আমার ছিল, তরুণবাবুর কাছে। এবার যেতে হলো সন্ধ্যা রায়ের কাছে, ওকে চিত্রনাট্য বুঝিয়ে দিতে তারপর তিনি রাজী হলেন স্বপনবাবু এখানে তখন নতুন প্রথমদিন ওর শুটিং-এ গিয়ে ওর কাজের ধারা দেখে মনে হলো কাজ বোছেন আর খুব তাড়াতাড়িই কাজ করতে পারেন। কোয়ালিটি কী হবে জানি না, তবে ওর কাজের কোয়ানটিটি আছে।

ঘরের বউ মুক্তি পেল। আর বাজারে হিটও করলো। ওই স্বপন সাহার কলকাতায় করা প্রথম ছবি। এ ছবিতেই তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন। তারপর অনেক ছবিই করেছেন, কিন্তু আর আমার কাছে আসেননি। কেন তা পরে বুঝেছিলাম।

এর মধ্যে একদিন বোম্বাই থেকে অনিল গাঙ্গুলি এলেন এখানে বাংলা ছবি করতে। বোম্বাই-এ ইনি অনেক ভালো হিন্দি ছবি করেছেন, 'কোরা কাগজ'-এর ছবি। এবার বাংলায় ছবি একটা করতে চান।

সেদিন বুধবার। অনিলবাবু একটা টাইপ করা দুপাতার সিন চার্ট দিয়ে বলেন— শচীন ভৌমিকের করার কথা ছিল চিত্রনাট্য কিন্তু তিনি অসুস্থ। আপনার নাম করে বলেছেন উনিই করে দেবেন। এটা আপনাকেই করে দিতে হবে। সামনের বুধবার আমার শুটিং একটানা দশদিন শুটিং করছি, রাখীকে নিয়ে। এবার চমকে উঠি-সে কি! আপনার কাহিনী। চিত্রনাট্য কিছুই নাই। যা আছে তা তো এই। সিনগুলোর একটা তালিকা মাত্র। হাতে সাতদিন সময় কী করে লিখবো?

অনিলবাবু বলেন। কঠিন কাজ তা জানি, শচীনবাবু বলেছেন আপনি পারবেন। এই শুটিং লট ক্যানসেল করা যাবে না কোনমতে। যে ভাবে হোক রাখী শুভেন্দুর বাড়িতে সেট ফেলছি, এই বাড়িতে যে সিনগুলো আছে সেগুলো লিখে দিন। আমি শুটিং করি। তারপর একমাস সময় পাবেন তখন পুরো চিত্রনাট্যটা লিখবেন।

ওই বাড়িতে দেখি প্রথম থেকে শেষ অবধি সিন আছে। গল্পের সুর বিলম্বিত লয়, মধ্যলয়, দ্রুতলয়ের ঘটনা সবই আছে। গল্পের ধরতাই থেকে শেষ অবধি সিন, ক্রমশঃ সিনগুলো ঘটনার সঙ্গে উঠবে, ক্লাইমেক্সে পৌছবে। খাবলা-খাবলি করে লিখলে এই লয় কেটে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিপজ্জনক কাজ, অনিলবাবুও বিপদে পড়েছেন বুঝেছি। বলি, চেষ্টা করছি। সামনের রবিবার সকালে আপনাকে কিছুটা শোনাবো।

প্রথমে ওই সিন চার্ট থেকে আমার মাথায় গল্পের বুনুনিটা রাখার জন্যই গল্পটাকে

পুরো লিখে ফেললাম। এইটাই হলো আমার গাইড লাইন। এবার ওই গল্পের গতিমাফিক ওই বাড়িতে যে সিনগুলো আছে সেগুলো প্রথম থেকে লিখতে শুরু করলাম। আশপাশের সিন পড়ে রইল, এগুলোকেই নিয়ে পড়লাম। এভাবে চিত্রনাট্য কখনও করিনি। পুরো কাহিনী, ঘটনা সংস্থাপন সব করার পর চিত্রনাট্য লিখেছি। তারপর সেই চিত্রনাট্য মাজা ঘষা পরিবর্তন এসব করেছি। একমাত্র 'মেঘে ঢাকা তারা'র কমেডি করার দৃশ্যগুলোই শুটিং স্পটে বসে লিখেছি। তাও থাকেনি। এসব তো থাকবে কাহিনীর প্রধান অংশেই।

রবিবার অনিলবাবুকে পুরো গল্পটা শোনাতে অনিলবাবু খুব খুশি। গল্পটাকে ঠিকই সাজিয়েছেন। এবার সিনগুলো পড়লাম। বলি, এইগুলো রাফ। আরও মাজা ঘষা করে মঙ্গলবার বৈকালে আপনাকে দেব। মঙ্গলবার থেকেই রাত জেগে ওর এক সহকারী সেগুলো কপি করে দেবেন, বুধবার থেকে শুটিং।

প্রথম লটের শুটিং শুরু করলেন। রাখীও এসেছে। সে করছে মা, বাবা শুভেন্দুবাবু, আর এক ছেলে তাপস পাল।

অনিলবাবু রাখীকে বলেন। শক্তিবাবু দারুণ লিখেছেন। বলি—আধখানা। বাকি আধখানা একপাতাও লেখা হয়নি। রাখী বলে—ওটাও ঠিকই হয়ে যাবে।

ওরা প্রথম পর্বের শুটিং করে ফিরে গেলেন।

আমি এবার পুরো চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করলাম। ওই সিনগুলোকে ক্রম অনুসারে বসিয়ে দিয়ে পুরো চিত্রনাট্য শেষ করে এবার পড়তে লাগলাম গল্পের ক্রমবর্ধমান লয় ঠিক আছে কিনা। দরকার মত নতুন সিনগুলোর লয় বাড়িয়ে কমিয়ে নিয়ে কাহিনীর সুরটাকে ধরার চেষ্টা করলাম। মনে হলো সুরে ঠিকই আছে। চিত্রনাট্যে কোথাও মার্কা ঝটকা আসছে না।

এই ভাবেই 'বলিদান' ছবি লেখা হয়েছিল এত ঝুঁকি নিয়ে। অনিলবাবু অভিজ্ঞ পরিচালক। ওর সঙ্গে আমার সুরে ঠিক মিলেছিল। পরের লটের শুটিং করতে এসে এবার পুরো চিত্রনাট্য শুনে তিনিও খুশি বলেন—

—তখন তো বলেছিলেন এভাবে লেখা হতে পারে না। এখন হলো তো? দারুণ হয়েছে।

ওর মেয়ে রূপাশিই এই ছবিতে নায়িকা হয়েছিল। এ ছবিতে রাখীর অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। আর এ ছবিও সুপার হিট হয়েছিল। এর গান লিখেছিল পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুলক ছিল আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। গৌরীদা শক্তি ফিল্মস্ এর সব ছবিতে গান লিখেছিলেন। দুজনের ওয়েভ লেংথ মিলতো ভালো গৌরীদা আমার 'অন্তরঙ্গ' ছবিতে শেষ গান লিখেছিলেন। বোম্বাইতেই মারা যান।

অন্তরঙ্গ ছবির প্রসঙ্গে দুবার কথা বলা দরকার। এটা করার কথা ছিল বোম্বের

জ্যোতি রায়ের। প্রযোজক মিঃ আগরওয়াল বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ট্রান্সপোর্টের বড় ব্যবসায়ী। তরাই এর চা বাগানকে কেন্দ্র করে একটি নিটোল প্রেমের কাহিনী। কেন জানি না, জ্যোতি এ ছবি করেনি। তারপর দীনেন গুপ্তই হলেন পরিচালক।

আবার মিঃ আগরওয়াল দীনেন গুপ্তকে নিয়ে গেলাম শিলিগুড়ি। মৈনাক হোটেলে উঠে গাড়ি নিয়ে চলেছি সামসিং অঞ্চলে। সেবার উঠেছিলাম মাদারিহাট-এর আই টি ডি সির জলদাপাড়া অরণ্য সংলগ্ন বাংলোয়। ওই সময়ই দুর্গম বন পাহাড়ের পথ পাড়ি দিয়ে গেছলাম টোটা পাড়ায় আদিবাসীদের বসতিতে।

দীনেনবাবুদের নিয়ে গেলাম আবার সেই সামসিং-টি এস্টেটের দিকে। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি হয়ে গরুমারা ফরেস্টের দিয়ে চালসা হয়ে যাওয়া যায়, একটু ঘুর পথ। আবার শিলিগুড়ি থেকে আগাম ল্যাটারাল রোড ধরেও যাওয়া যায়।

আমরা জলপাইগুড়ি শহরে ঘুরে কদমতলার মোড়ে একটা সুন্দর চা-খাবারের দোকানে চা ব্রেকফাস্ট সেরে সামসিং-এ ওঠার মুখে মেটেলিতে বাধা পেলাম।

পাহাড়ের মধ্যে চা বাগানের সবুজ পরিবেশে মেটেলি বেশ সমৃদ্ধ জনপদ। বড় বাজার আছে, স্কুল থানাও। পরিচালক তরুণ মজুমদারের বাড়ি এখানেই। শুনেছি তার দাদা ছিলেন এখানের স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

তখন পাহাড়ি অঞ্চলে নেপালি অধিবাসীদের আন্দোলন চলেছে। মাঝে মাঝে ঝামেলাও হয়। নীচের মানুষরাও উপরে কোন জিনিস যেতে দেবে না, ওরাও উপর থেকে কিছু নামতে দেবে না। কিন্তু নীচে থেকে খাবার না গেলে ওদেরও বিপদ।

তাই সেদিন মিটিং। থানায় গেছে জেলার পুলিশ সুপার, অন্য কর্তারা। দুই পক্ষের কি সব আলোচনা হবে। থানা অফিসার জানালেন, আজ উপরে যাবেন না মিটিং হয়ে যাক। মনে হয় কাল ঠিক সামসিং যেতে পারবেন।

পাশাপাশি এতদিন শান্তিতে বাস করার পর রাজনীতি সহজেই বিশ্বাসের মূলে ফাটল ধরিয়েছে। সকলকেই অশান্তিতে ফেলেছে। যদি কোন সমঝোতা হয় হোক।

শিলিগুড়ির হোটেলে ফিরে আবিষ্কার করি একটা সাইড ব্যাগে দীনেনবাবুর সোয়েটার, আমার শাল, টুপি, টর্চ দীনেনবাবুর একটা ক্যামেরা সমেত সেই ব্যাগটা নেই। গেল কোথায়? মনে পড়ে জলপাইগুড়ির চায়ের দোকানে ব্যাগটা নামিয়েছিলাম তারপর বোধ হয় তুলিনি। ভাবনা ক্যামেরার জন্য-দামি ক্যামেরা।

পরদিন সামসিং যাবার জন্য ওই পথই নিতে হলো। জলপাইগুড়ির বাদামতলার সেই খাবারের দোকানে ঢুকতে ক্যাশেবসা ভদ্রলোক বলেন—জানতাম আবার আসবেন। কাল এটা ফেলে গেছিলেন। টেবিলের নীচে থেকে নিজেই সেই ব্যাগটা বের করে দিয়ে বলেন জিনিসপত্র ঠিক আছে কিনা দেখে নিন।

সব ঠিকঠাকই আছে। চা খেতে খেতে এবার আমাদের পরিচয় জানতে পারেন।

এর আগেও জলপাইগুড়ির বাবুপাড়া পাঠাগারে সাহিত্যসভা করতে গেছি। তখনও ফারাক্কা হয়নি। দমদম থেকে ডকাটা প্লেনে গিয়ে মাঠের মধ্যে 'পাংগা এয়ার ষ্ট্রিপে নেমে গেছি' এখন কলকাতা থেকে সিধে ট্রেন চলছে।

দু'চারজন পাঠক, দর্শকও জুটে গেল। দোকানের মালিকের কথা ভুলিনি।

আজ সামসিং-এ যেতে পারলাম। আগে এখানে একটানা দশদিন থেকে গেছি। নেপালি বস্তিতে এক ভদ্রলোকের বাসও ছিল। তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। নিজের বাগানের কমলালেবুও দিয়েছিলেন সেদিন।

তখন এই নেপালি ভারতীয়দের মধ্যে রাজনীতির আক্রোশ গড়ে ওঠেনি। সুখী পরিবেশই ছিল।

এখন চা বাগানের মালিকানা অন্য জনের। সেই সোম-সাহেবও নাই। চেনা মানুষদের পেলাম না। নেপালি বস্তির মানুষরা আমাদের দিকে সেই খুশি চোখে আর চেয়ে নেই। সেই চাহনিতে কেমন সন্দেহের ভাব। দু'চারটে সরকারি বাড়ি পোড়ানো, সুন্দর সাজানো ফরেস্ট বাংলো ছাই-এর গাদা।

তবু প্রকৃতির রূপ বদলায়নি। মানুষ প্রকৃতির প্রশান্তিতে আঁচড় কাটতে পারেনি। সামসিং-এর চেহারা অনেকটা সুইজারল্যান্ডের মতো। ঘন সবুজ দিগন্তে আকাশছোঁয়া ভুটান হিলস্। নীচের উপত্যকায় বয়ে চলেছে মূর্তি নদী। উপলবন্ধুর গতিপথে দুরন্ত বেগে যেন ছবির মত। 'অনুসন্ধান'-এর শুটিং এখানে করা যায় নি। বড় ইউনিট থাকার জায়গা ছিল না 'অন্তরঙ্গ' ছোট ইউনিট হবে। ওরা এখানে থেকেই কাজ করবেন, কিছু বাংলা ঘর পাওয়া যাবে চা বাগান থেকে।

দরকার একটা হাতির।

তপনবাবুও সফেদ হাতিতে হাতি নিয়েই কাজ করেছেন। আর একটা ছবিতে হাতির পিঠে অনিল, উৎপলবাবু দুজনে। হঠাৎ হাতিটা ক্ষেপে ওঠে, অনিল ছিটকে পড়ে হাতি থেকে। পায়ে চোটও পায়। আর সেই হাতি উৎপলবাবুকে পিঠে নিয়ে দৌড়তে থাকে। উৎপলবাবুর অবস্থা তখন শোচনীয়। কোনমতে হাতিকে বশে আনা গেল। উৎপলবাবু নেমে প্রাণে বাঁচেন। পরে জানা গেল ওই হাতির রেকর্ডও ভালো নয়। দু'একটা কাণ্ড সে আগেও ঘটিয়েছে।

আমার লেখা 'আমার সাথী' ছবিতে প্রায় সতেরোটা হাতি ছিল। তাদের নিয়েও অনেক কাণ্ড ঘটেছে সে কথা পরে বলা যাবে। এখন দীনেনবাবুর ছবির জন্য হাতি চাই।

হাতির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন আসামের প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়া। ইনি প্রমথেশ বড়ুয়ার ভাই। প্রকৃতিশবাবুর জীবনের বেশির ভাগ কেটেছে বনে জঙ্গলে হাতিদের সঙ্গে। ইনি খেদা অর্থাৎ কাঠের মজবুত খেরা করে বুনো হাতি ধরা ছাড়াও হাতির পাল থেকে বাচ্চা। মাঝারি হাতি ধরতেন দড়ির ফাঁদে, তার লোকজন নানা কৌশলে হাতি ধরত।

উনি তখন বেঁচে নাই। শিলিগুড়ি থেকে মিরিকের পথে বালাসন নদীর আগে একটু ডানদিকের বনের মধ্যে ওর মেয়ে থাকেন। তার তিনটে ট্রেন্ড হাতি আছে। বুনো হাতিদের তাড়াবার জন্য বনবিভাগ ওকে ওর হাতিদের ওখানে রেখেছে। সেখানেই যাওয়া হলো। প্রকৃতিশচন্দ্রের মেয়েও হাতি সম্বন্ধে অনেক জানে। আর তেমনি সাহসিনী, স্মার্ট নিজেই হাতি ড্রাইভ করে বুনো হাতির পালকে বনে ঢুকিয়ে আসে।

ওর একটা হাতিকেই নেওয়া হলো।

ফিরে এসে আমিও বোম্বাই চলে গেলাম তখন মিঠুনকে নিয়ে 'অন্ধবিচার' হিন্দি বাংলার চিত্রনাট্যের কাজ শুরু করেছি। সেখানে কাজ কিছুটা সেরে ফিরে এলাম। এরা সামসিং এ শুটিং এ যাবার তোড়জোড় করছেন। প্রযোজক মিঃ আগরওয়াল চান আমিও যাই ওদের সঙ্গে। কিন্তু দীনেনবাবুর তেমন আগ্রহ না থাকায় আমি আর গেলাম না।

পরে শুনলাম দীনেনবাবু মূল চিত্রনাট্য থেকে নিজেও আলাদা করে কিছু কিছু সিন লিখে সেগুলো টেক করে যত্রতত্র জুড়েছেন। ফলে স্বভাবতই মাঝে মাঝে চিত্রনাট্যের সুর কেটেছে।

তবু 'অন্তরঙ্গ' দর্শকদের ভালো লেগেছিল পটভূমির গল্পের বৈচিত্র্যের জন্য। হাতিটাকে কাজ লাগানো হয়েছিল সুন্দরভাবে। মিঃ আগরওয়াল, ওর বন্ধু মিঃ গুপ্তা মূল চিত্রনাট্য শুনেছিলেন, পরে ছবিতে তার রদবদল দেখে খুশি হননি। আমাকে কেন এড়াতে চেয়েছিলেন দীনেনবাবু সেটা পরে বুঝলেন। তবু ছবি চলেছিল। গুপ্তাজী বলেছিলেন—লক্ষ্মী দরজায় এসে ফিরে গেলেন। যদি ঠিক মতো চিত্রনাট্য ফলো করা হত আমরা আরও ব্যবসা পেতাম। মূল কাহিনী চিত্রনাট্যে নিজেদের প্রাধান্য দেখাবার জন্য নিজস্ব চিন্তাধারা থেকে অনেকেই ঢের কিছু আরোপ করে ছবিরই ক্ষতি করেন সেটা অনেকেই বুঝতে চান না। এনিয়ে পরামর্শ করাও প্রয়োজন মনে করেন না। ঠিকঠাক হলে এটিও একটি স্মরণীয় প্রেমের ছবি হত।

হাতির কথা বলছিলাম, শুধু হাতি নয় বাঘ, হাতি এসব নিয়েও একটা ছবির গল্প লিখেছিলাম শামুবাবুদের জন্য। শ্যামবাবুর পিতৃদেব সুবোধবাবুই একমাত্র বাঙালি যিনি সার্কাস-এর নামী মালিক ছিলেন। এখন তাঁর ছেলেরাই সার্কাসের ব্যবসা করেন। দুটো বড় বড় সার্কাস এদের। নিজেদের সংগ্রহেই বেশ কিছু বাঘ-সিংহ-ট্রেন্ড বাঁদর, কুকুর হাতি আছে। বিরাট তাঁবু এলাহি ব্যাপার এদের। বনেদি পরিবার।

সার্কাসের ব্যবসা ছাড়াও ওরা ছবির জগতে এলেন। ভদ্র প্রযোজক এর আগে একটা ছবি করেছেন, ধর্মতলা পাড়ায় ঝকঝকে অফিসও করলেন।

একদিন আমার বাড়িতে এসে শামুবাবু বলেন সার্কাস আমাদের ট্রেন্ড বাঘ, হাতি সবই আছে। বাঁদর ভালুকও পাবেন। তবে ভালুক খুবই বদমেজাজী হিংস্র প্রাণী।

ওটাকে নেবেন না। এইসব জীবজন্তুদের নিয়ে কোন গল্প যদি তৈরি করা যায় নতুন কিছু হবে। এর আগে কুমীর হাতি নিয়ে গল্প লিখেছি। চা বাগানে যখন থাকতাম তখন ওই অঞ্চলের কাঠের গুদাম মালিকের একটা পোষা হাতি ছিল, তার সঙ্গে ও আমার পরিচয় হয়েছিল। খুবই শান্ত স্বভাবের হাতি। তাকেই এনেছিলাম অন্তরঙ্গ গল্পে।

শ্যামবাবুদের দুটো সার্কাস পার্টি, যতদূর মনে পড়ে একটার নাম ফেমাস সার্কাস, অন্যটার নাম ওরিয়েন্টাল। সেবার দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের মাঠে ওদের সার্কাস বসেছে। দু'চার দিন গেলাম ওদের সার্কাসে। সকালের দিকে ওদের প্র্যাকটিস চলে। বাঘের ট্রেনারের নাম রামানন্দ সাগর। তরুণ জন্তু জানোয়ারের চরিত্র বোঝেন।

অরণ্য-পর্বতের এক উপত্যকায় সাধারণ দরিদ্র মানুষদের বাস। কঠিন তাদের জীবনযাত্রা। বনের পশু প্রাণীদের সঙ্গে মিলে মিশে অরণ্যকে ভালোবেসে তারা বাস করে। কিন্তু লোভী স্বার্থান্ধ মানুষ সবকিছু গ্রাস করতে চায়, এদের জমি, অরণ্য অরণ্যপ্রাণীদেরও মারতে চায় তারা। এই নিয়েই সংঘাত। মানুষ আর পরিবেশ নিয়েই একটা গল্প তৈরি করলাম বনপর্বত উপত্যকার মানুষদের আমি কাছ থেকে দেখেছি। তাদেরই কাহিনী। পরিচালক নিলেন ওরা সলিল দত্তকে।

সলিলবাবু অভিজ্ঞ পরিচালক। এর আগে উত্তমবাবুকে নিয়ে স্ত্রী, ওগো বধূ সুন্দরী আরও অনেক সফল ছবি করেছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক তবে শহরেই মানুষ। ওই অরণ্য প্রকৃতি সেখানের জীবনকে কাছ থেকে দেখেননি। তবুও তিনিও উৎসাহিত হলেন। সার্কাসের তাঁবুতে এসেছি আমরা। সকার্সে বাঘ সিংহদের ঘাটাগুলো সারবন্দী জায়গা ওদিকে রয়েছে দশ বারোটা হাতি। তারা সর্বদাই শুঁড় দোলাচ্ছে। আলতো ভাবেই দোলাচ্ছে। কিন্তু ওই দোলানি কোন মানুষের গায়ে লাগলে সে ওইতেই দশহাত দূরে ছিটকে পড়বে। শুনেছিলাম ট্রেনার সাগরজীর মুখে ওদের একটা বাঘ 'লক্ষ্মী' আছে। তাকে ছেড়ে রেখেই কাজ করানো যাবে। সে খুবই শান্ত একেবারে পোষা কুকুরের মতো।

বাঘটা শান্ত হলে ওকে দিয়ে কিছু কাজ করানো যাবে, তাই গেছি সেদিন। ট্রেনার রামানন্দজী আমাদের মাঠে বসিয়ে কাকে বলে—আরে লক্ষ্মীকে থোড়া খোল দে। একটা ছেলে তিড়িং বিড়িং করে এসে ওদিকের একটা খাঁচার দরজা খুলে দিতেই একটা বেশ নধর বাঘ গর্জন করে লাফ দিয়ে বের হতে যাবে, রামানন্দজী হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে একটা ফাটা বাঁশ তুলে বিকট ধমক দিতে গর্জনমুখর হিংস্র বাঘটা আবার খাঁচাতেই ঢুকতে খাঁচা বন্ধ করে রামানন্দজী সেই ছেলেটাকে দুটো থাপ্পড় কষে বলে—সত্য নাশ হো যাতা। তেরে কো বোলা লক্ষ্মীকা খাঁচা খোলনে, তু খোল দিয়া দুর্গাকা খাঁচা। পহলে উ তেরেকোই খা লেতা। ওটা এখনও পোষ মানেনি, নতুন এসেছে বাঘটা। ও দুর্গার মতোই রণরঙ্গিনী। এখুনি কাকে সাবাড় করত কে জানে। তখন লক্ষ্মীকে দেখা। সখ মিটে গেছে। ঘেমে উঠেছি। সলিলবাবু বলেন। আবার

লক্ষ্মী যদি কিছু করে? রামানন্দজী বলে ডরিয়ে মৎ। উ লছলীই আছে। এবার বের করলেন আর এক মূর্তিকে। বিশাল মুখ খাস রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সাগরজীর সামনেই বসল সে শান্ত হয়ে। নিরাপদ দূরত্ব থেকেই লক্ষ্মীকে দেখলাম। দুটো বাচ্চা বাঁদরকেও দেখলাম।

ওদের শুটিং কয়েকদিনের জন্য টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে করে ওরা চলে যাবেন পুরো সার্কাস পার্টি নিয়ে বাঁকুড়ার পর্বত বনের ছোঁয়া লাগা খাতড়ায়ন। ওখানে মুকুটমণিপুরে ইউনিট থাকবে হাতি বাঘদের নিয়ে। বনে পাহাড়ে আউটডোর শুটিং পর্ব চলবে। দুটো বাদরকে নিয়ে কিছু কাজ আছে। তাদের আনা হয়েছে শুটিং-এর আগেই। কী মতলব হলো তাদের কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে স্টুডিওর আমগাছের মগডালে উঠে গিয়ে বসলো, আর নামে না।

এর আগে আলিবাবা মর্জিনার শুটিং-এর সময় প্রযোজক দুটো গাধা কিনেছিল। ওরা যুগলে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতেই থাকতো, প্রোডাকশন থেকে খেতেও পেত। ছবি শেষ হবার পরও তাদের নড়ানো যায় না স্টুডিও থেকে। তারা তখন ছবির স্টার বলে কথা। কাঁহাতক বসে বসে সেবা করা যায়। শেষ অবধি ওদের কোন ধোপার কাছে বেচে দিল। সেদিন এই দুই গর্দভ শিল্পীকে স্টুডিও থেকে বের করা যায় না সহজে। তারাও নায়ক নায়িকা হবে। কোনমতে ঠেঙিয়ে তাদের দূর করা হলো।

তেমনি আবার নতুন একজোড়া শাখামৃগ নায়ক নায়িকাই বাড়বে বোধ হয় স্টুডিওতে ওরা নামে না। শেষতক সন্ধ্যার মুখে কী ভেবে নেমে এলো। বাঁদরের বাঁদরামি দেখে ওদের পর্ব কাহিনী থেকে বাদই দিতে হলো।

• সার্কাস তখন দক্ষিণশ্বেরে। শো-র পর রাতে ওখানেই কিছু হাতির শুটিং করা হত। বাঘের শুটিংও হত। এর আগে সত্যজিৎবাবু মাদ্রাজে গিয়ে গুপী গায়েনে বাঘ নিয়ে শুটিং করেছেন। রবি ঘোষ বাঘের ঘর থেকে চাবি আনবে। সেই বাঘকে ইনজেকশন দিয়ে নাকি অবশ করানো হত।

কিন্তু রামানন্দজীর লক্ষ্মীকে সে সব কিছুই করা হত না। মনোজ মিত্র অন্য শিল্পীদের নিয়ে কাজ হচ্ছে। বাঘটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ওদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াবে, ওরা ওদিকের দরজা দিয়ে পালাবে। তবু নিরাপত্তার জন্য বেষ্টনী একটা রাখা হত। সলিলবাবু বলেন শক্তিবাবু গিয়ে বাঘটাকে ডায়ালগ একটু পড়িয়ে আসুন। আমি বলি ওর তো সায়েলেন্ট অ্যাকশন। ডিরেকটারই বুঝিয়ে দেবেন। বাঘটা ছাড়া অবস্থাতেই ট্রেনার যা বলে দিতেন ঠিক তাই করতো। টার্ন করে বিকট গর্জন তাও করতো। বাঘের দরকার হলে মাদ্রাজ যেতে হত, এদের ট্রেন্ড বাঘের খবর এর আগে এখানের ছবি যারা করতেন তারা জানতেন না।

অন্য জন্তুদের তুলনায় হাতি অনেক বুদ্ধিমান। একটা গ্রামের ছোটছেলে বুনো হাতিদের প্রিয় ছিল। বনে বনে সে ঘুরতো। হাতিরাই তার বন্ধু। ওই ছেলেটিকে সলিলবাবু সার্কাসেই হাতিদের সঙ্গে মেশার জন্য রাখতেন। হাতিগুলোও তাকে চিনে

ফেলেছিল, পিঠেও চড়তে দিত। ছেলেটা হাতি চালাতেও শিখে গেছল। হাতি চালানোর নিয়ম মাহুত হাতির ঘাড়ে বসে দুই পা দিয়ে সংকেত করে চালায়। ডান পা দিয়ে ডানদিকে ঘা মারলে হাতি যাবে বাঁয়ে। বাঁ পা দিয়ে ঘা মারলে হাতি যাবে ডাইনে। আর দু'পা দিয়ে সমানে ঘা মারলে হাতি যাবে সামনের দিকে।

হাতিগুলোকেও মনিটর করানো হতো। ক্যামেরা পজিশন অ্যাকশন এগুলোর জন্য হাতিকে দু'তিনবার সেই অ্যাকসন ওই জায়গাতে করাতে হতো। হাতির ট্রেনার তাই হাতিগুলোকে ক্যামেরা জোনে নিয়ে গিয়ে রিহার্সেল দিইয়ে জোনের বাইরে আনতো। আবার নিয়ে যেতে হত। দেখি জোনের বাইরে থেকে ক্যামেরা জোনে হাতিগুলো যেতে চায় না। গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা লোক একটা ব্যাগে কিছু ভেলিগুড়ের ডেলা রেখেছে। এক থাবা করে মুখে দিতে হাতি রিহার্সেলে যায় ঠিক, গুড় না পাওয়া অবধি নড়বে না।

সেদিন রবি ঘোষ, মনোজবাবু, অর্জুন চক্রবর্তীরা সেটে রয়েছে। আমি বলি রবিবাবু বাঘ হাতিও টালিগঞ্জ পাড়ার হালচাল জেনে গেছে, মাল হাতে না পাওয়া অবধি সেটে যাবেই না।

হাতি চালাতে গিয়ে ছেলেটা সেদিন পা ঠুকতে গোলমাল করে ফেলে। বাঁ দিকে ঠুকতে ডানদিকে ঠুকেছে হাতিও ডাইনে না গিয়ে বায়ে চলেছে। ধীমান ছিল বাঁয়ে হাতিকে দেখে সে লাফ দিয়ে নীচে বেকায়দায় পড়ে পায়ে ভালো চোট পেয়েছিল।

আউট ডোরে পনেরোটা হাতির পাল বন থেকে বের হবে। খাতড়া থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে মশক পাহাড়ের বনে শুটিং। পথ চলতে চলতে হঠাৎ দুটো হাতির কী খেয়াল হলো মাঠ-বন-বাদাড় ভেদ করে দৌড়লো। লোকজনও দৌড়লো তাদের পিছনে। সারা এলাকায় রটে যায় হাতি ক্ষেপেছে। হৈ চৈ কাণ্ড শুটিং উঠলো মাথায়। ঘণ্টা চারেক এদিক ওদিক করে হাতিরা নামলো কোনও জলাশয়ে। কোন ক্ষতি কিছু করেনি। হাতিরাই সেদিন রসিকতা করলো। কাজ বন্ধ।

বাংলা ছবিতে প্রাণীদের নিয়ে এমন ছবি হয়নি। 'আমার সাথী' ছবিতে কর্তৃপক্ষ চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেনি। পরিবেশ প্রাণী জগৎ, অরণ্যচারী মানুষদের নিবিড় সম্পর্কের গল্প। ছবিটা সম্মান পেয়েছিল কিন্তু আশানুরূপ ব্যবসা করেনি। এ ছবিটা ছিল বাংলা ছবির গতানুগতিক ধারা থেকে স্বতন্ত্র।

এই সময় বাংলা দেশের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনার নামে আইনের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে এখানের ছবির জগতে এসে পড়লো বেশ কিছু বাংলা দেশের ছবি। তখন হিন্দি ছবির ঘটাও অনেক বেড়ে গেছে। তার উপর টিভিও ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্শক যারা ছিল সংখ্যায় অনেক তারা টি ভি-র দর্শকে পরিণত হলো। উচ্চমধ্যবিত্ত বড় মানুষরা তো সাধারণ দর্শকের দলে ছিলেন না। মধ্যবিত্তরাও সরে যেতে লাগলো, ফলে সিনেমার দর্শক কমে গেছে।

হিন্দী ছবির দামও বেড়েছে অনেক। আর দর্শকের অভাবেই হোক যে কোন

কারণেই হোক, হিন্দি ছবির অনেক পরিবেশক বাংলা ছবির দিকে ঝুঁকলেন। আর প্রোডাকশন খরচ কমাবার জন্যই তারা এবার যৌথ প্রযোজনায় নামলেন। বাংলাদেশের সঙ্গে না হয় উড়িষ্যার কোন প্রযোজকের সঙ্গে বাংলা উড়িষ্যা ভাষার ছবি করতে শুরু করলেন। এতে খরচটা ভাগ হয়ে যায়।

এখানে এক প্রযোজক উড়িষ্যার চিত্রজগতের নামী প্রযোজক বসন্ত নায়েকের সঙ্গে আমার কাহিনী চিত্রনাট্য নিয়ে ছবি শুরু করলেন 'মা'। বাংলা এবং ওড়িয়ায় দুই প্রদেশের শিল্পীদের নেওয়া হলো।

এর পরিচালক ঠিক করা হয়েছিল প্রথমে বোম্বাই প্রবাসী বাঙালি পরিচালক অসীম ভট্টাচার্যকে। অসীম বাবু এর আগে বোম্বাই-এ কাজ করেছেন। বসন্ত নায়েকের একটি সুপার হিট ছবিও করেছেন। যাতু রাখে অনন্ত এ ছবিটা পরে বাংলাতেও ডাবিং করা হয়েছিল 'রাখে হরি মারে' কে? এই নামে।

দাগা পিকচার্সের কর্ণধার দাগাজীও আর নেই। তিনি মারা যাবার পর তার ছেলেরা সেই প্রতিষ্ঠান-এর কাজ দেখাশোনা করছেন তারই এক ছেলে কৃষ্ণা দাগা এই 'মা'-এর অন্যতম প্রযোজক। অসীমবাবুর এই প্রথম বাংলা ছবি। খুবই সজ্জন ভদ্রলোক। চিত্রনাট্য নিয়ে বসলাম তার সঙ্গে। বাংলা চিত্রনাট্য শেষ করে, এবার ভুবনেশ্বরে গেলাম। উড়িয়া চিত্রনাট্যকারকে চিত্রনাট্যটা বুঝিয়ে দিতে। চিত্রনাট্যকার বিজয় মিশ্র উড়িষ্যার কিছু ছবির সফল চিত্রনাট্যকার। নেশায় সাহিত্য করেন, পেশায় উড়িষ্যা সরকারের পদস্থ কর্মচারী। ভালো বাংলা বোঝেন বাংলা পড়তেও পারেন। ফলে বোম্বাই-এর চিত্রনাট্যকারদের সঙ্গে যতটা খাটতে হয় এখানে ততটা খাটতে হলো না। তবে বিজয়বাবুর অভ্যাস সিনগুলো কিছুটা লম্বা করা। ওদের মতে সাধারণ দর্শককে নাকি ওতে সবটা বোঝানো যায়।

কিন্তু ছবির গতি ব্যাহত হয় ওতে, তাই আমি চাই চিত্রনাট্যকে টান টান করে রাখতে। তারপর আজকাল নাচগান এর প্রাধান্য দিকেই হয়, ফাইট অ্যাকশন ও থাকবে' তাই আগে থেকেই চিত্রনাট্যকে টেনে রাখতে হয়।

বিজয়বাবুকে টেনেটুনে এই পথেই আনার চেষ্টা করি। ডবল ভার্সান ছবিতে দুজনের সিনের ধারাবাহিকতা রাখতে হয়।

বিজয়বাবু শেষ অবধি ব্যাপারটা বুঝে আমার পথেই এলেন। ভুবনেশ্বরে রয়েছি। এর আগে কটকে ছিলাম হোটেল আকবরী কন্টিনেন্টাল-এ। সুন্দর হোটেল। থ্রিস্টার তো হবেই। বিশাল সাজানো বাগান। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হোটেল। শুনলাম গুড়াকির; মূল ব্যবসা এদের, তার থেকেই এ বিশাল হোটেল।

কটক খুবই পুরানো শহর। হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে এখানে। মহানদীর একদিকে অন্যদিকে মহানদীর বিশাল শাখা। বর্ষায় এর চারিদিক ধূ ধূ জল। আর জল কটক শহরকে বিশাল ঘেরা বাঁধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। সেই বাঁধ গেলে কটকের সমূহ বিপদ। কটকের হরিপুরায় বসন্তবাবুর বিশাল বাড়ি, ওদিকে অফিস

বাড়ি। দুপুরে মাঝে মাঝেই হোটেলের ওই ফর্মুলার রান্না ছেড়ে বসন্তবাবুর বাড়িতে দিব্যি ভাত, ভাজা, শুকতো তরকারি মাছ, এর পদ, দই শেষে ওর বাগানের উৎকৃষ্ট মর্তমান কলাও জুটতো।

খাবারের বেলায় বাঙালি উড়িয়ার রুচি সম্পূর্ণ এক তা দেখেছি। চিত্রনাট্যের অনুবাদের কাজ শুরু হবে হঠাৎ বলি—বসন্তবাবু, এখানে এসে কাজ শুরু করছি। জগন্নাথদেবকে প্রণাম করে কাজে বসলে ভালো হত না।

জগন্নাথদেবের উপর উড়িষ্যার মানুষ কেন বাঙালিদেরও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। বসন্তবাবু বলেন—খুব ভালো বলেছেন। লাঞ্চ-এর পর আজই বের হয়ে যান, ছেলেকে সঙ্গে দিচ্ছি। আজই সন্ধ্যায় পুজো দিয়ে হোটেলে ফিরবেন, কাল থেকে কাজে বসবেন।

বসন্তবাবুও এইভাবে সায় দেবেন ভাবিনি। কটক থেকে পুরী অনুমান পঁচাশি নব্বই কিলোমিটার। ভুবনেশ্বর গিয়ে ওখান থেকে মাদ্রাজ হাইওয়ে ছেড়ে পুরীর রাস্তা। সন্ধ্যার আগেই পুরীতে পৌঁছে জগন্নাথদেব দর্শন করে পুজো দিয়ে বীচে এসে কিছুক্ষণ বসে কটকের পথ ধরলাম। সাড়ে দশটার মধ্যেই ফিরে এলাম।

বেশ কয়েক বৎসর উড়িষ্যায় যাতায়াত করছি। প্রথমত এরা রাস্তাঘাট যেভাবে তৈরি করেছেন তাতে আমাদের রাস্তাগুলোকে দেখলে লজ্জা পেতে হয়। মনে হয় ওদের সরকার রাস্তার জন্য বেশ কিছু করেন। যা আমাদের এখানে মোটেই করা হয় না। তখন বালেশ্বর ছিল ছোট্ট ঘুমন্ত একটি জেলা শহর। কয়েক বছরে বালেশ্বর ছোট জনপদ ধান মণ্ডল প্রভৃতিকে ঘিরে শুরু রয়েছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। ভুবনেশ্বরের কথা ছেড়েই দিলাম। ওরা ভুবনেশ্বরকে সাজিয়েছেন ছবির মত, আশপাশে বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমির বুকে সুন্দর কারখানা বানিয়েছেন। বালেশ্বরকে ঘিরে বিরাট শিল্পায়ন ঘটছে, গড়ে উঠছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ঘিরে বহু কল কারখানা। দুর্গাপুরকেই প্রথম গড়ে ছিলেন বিধান রায়। সেই দুর্গাপুর আজ ধুকছে, রুগ্ন। চারিদিকে বন্ধ কারখানার নিস্তব্ধ। বালেশ্বর এগিয়ে চলেছে সগৌরবে। কলকাতা থেকে ধৌলি এক্সপ্রেসের অর্ধেক লোক নামেন বালেশ্বরে। কাজ সেরে অন্য ট্রেনে বা ওই ট্রেনে ফেরেন। আজ বাংলা ছুটছে তার পদ প্রান্তে।

শিক্ষার দিক থেকেও উড়িষ্যা আজ অনেক এগিয়ে রয়েছে। সেবার ওরাই বলেছিলেন উড়িষ্যা থেকে সতেরোজন আই-এ-এস পাশ করেছে, বাঙালি মাত্র কয়েকজন। তাও তারা বেশির ভাগই প্রবাসী বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আই-এ-এস, আই-পি-এস পরীক্ষায় পাশ করেছেন কজন সেটা তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। সেটা পরম হতাশাব্যঞ্জক। দঁরিয়ার মানুষ তাই বলেন। জিরে না মু হিরো আছি। তা নতুন প্রজন্মকে আজ তারা এগিয়ে যেতে শিখিয়েছেন। আমরা দেখেছি দলাদলি, ঘৃণ্য রাজনীতির আবর্তে আমাদের উত্তরপুরুষকে তলিয়ে যেতে। গড়ার নয় শুধু ভাঙার আর সেই দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য ফাঁকা আওয়াজ এর ভাষণই শুনেছি। সবাই এগিয়েছে, একদিন যে বাংলা সকলকে পথ দেখিয়েছিল সেই বাংলা পিছিয়েই চলেছে সর্বক্ষেত্রে।

আজকের উড়িষ্যাকে দেখে সেই কথাটাই মনে হয়। ওদের চাষের জমিও আছে অনেক, আর আছে প্রভূত বনসম্পদ। তার চেয়ে বেশি আছে খনিজসম্পদ। আয়রন ওর, ম্যাঙ্গানীজ ওর, ডলোমাইট, কয়লা, কোবাল্ট নানা খনিজ সম্পদে ভরা উড়িষ্যা। আজ তারা নিজেদের উন্নতির কথা ভাবছে।

উড়িষ্যাতে ফিল্ম স্টুডিও আগে ছিল না। তখন উড়িয়া ভাষার ছবি হয় কলকাতা থেকেই। উড়িয়া অসমীয়া ছবি হত কলকাতাতেই। এখানে তখন অনেক উড়িষ্যার কলাকুশলীরা কাজ করতেন।

পরে উড়িষ্যা এখানের উপর কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পা বাড়ালো মাদ্রাজের দিকে। তারপর উড়িষ্যা সরকার ভুবনেশ্বরের উপকণ্ঠে বিশাল জায়গা নিয়ে বানালেন কলিঙ্গ স্টুডিও।

. মাদ্রাজের প্রসাদ ল্যাবরেটারি ওখানে একটা শাখাও গড়ে তুললো। সুন্দর সবুজ পরিবেশে সেখানেই এখন ওদের ছবির সব কাজ হয়। প্রোর্ডিটিং-রি রেকডিং-মিক্সিং সবই হয় ওখানে প্রিন্ট অবধি। ওরা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবু উড়িষ্যা ছবির সেন্সার হত এখানে। এখন গৌহাটিতে অসমীয়া, মণিপুরী ইত্যাদি ছবি আর কটকেই উড়িষ্যার সেন্সর অফিস হয়ে গেছে।

ওরা কেউ এখানে কাজ করতে আসেন না। কলকাতা থেকে বেশ কিছু প্রযোজক ওখানে গিয়ে শুটিং করেন এর মধ্যে কিছু কিন্তুও আছে সেটায় পরে আসা যাবে।

এর মধ্যে বোম্বাই-এর অসীমবাবু ওখানে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় এরা পরিচালক হিসাবে নিলেন প্রশান্ত নন্দাকে। প্রশান্ত বাবু উড়িষ্যার মানুষ, তবু বাংলা ভাষা জানেন, লিখতেও পারেন। আর উড়িয়ায় গান লেখার জন্য নেওয়া হল তরুণ উড়িয়া কবি স্বরূপ নায়েককে।

চিত্রনাট্যের কাজ শেষ সেদিন কৃষ্ণাজী বলেন, দাদা—বোম্বে যেতে হবে। বাংলা উড়িয়া গানের টেকিং। গান লিখছেন স্বপন চক্রবর্তী। আপনাকেও যেতে হবে। রাখীকে বলেছিলাম এ ছবিতে কাজের জন্য। রাজি হচ্ছেন না উনি ঠিক। আপনি একটু চলুন। রাখীকেই মায়ের রোলে দরকার। ও না হলে হবে না।

আমারও বোম্বেতে যেতে হবে। তখন অন্ধবিচারের কাজ চলছে। মিঠুনকে নিয়ে হিন্দি বাংলায় হবে। চিত্রনাট্য হয়ে গেছে তবুও শক্তিবাবু চান একটু বসতে।

কৃষ্ণাজীর আপনজন নানাদিকে। এর আগে ধৌলি এক্সপ্রেসে প্রায়ই গেছি ভুবনেশ্বর না হয় কটকে। বালেশ্বরে কৃষ্ণাজীর এক আত্মীয়ের বিরাট ফার্ম, তিনি সকাল নটাতেই বাড়ির তৈরি গরম কচুরি সব্জী। মিঠাই এসব ব্রেকফাষ্ট নিয়ে হাজির থাকতেন। ফেরার পথে সন্ধ্যাতেও খাবার হাজির।

এবার বোম্বে মেলে যাচ্ছি, রায়পুর পৌঁছলো বারোটা নাগাদ। দেখি সেখানেও কৃষ্ণাজীর এক আত্মীয় প্রচুর লাঞ্চের সামগ্রী নিয়ে হাজির। যতবারই গেছি কৃষ্ণাজীব সঙ্গে রায়পুরে লাঞ্চ উঠতোই। ডিনার দেয় ওয়ার্ধা স্টেশনে সন্ধ্যা আটটায়, সেখানেই

রেলওয়ে ক্যাটারিং এর ডিনার নিতে হতো। বলতাম কৃষ্ণাজী, এই ওয়াদ্ধার্তেও সেই রিস্তেদার বানিয়ে নিন। ডিনারটা তুলে দেবে।

কৃষ্ণাজীর ফ্ল্যাট তখন সাতবাংলো। কুমার শানুও তখন ওর ওই সাত বাংলোতে। ফ্ল্যাটে গিয়ে এবার ঠেক নিলাম। শক্তিবাবুর কাজে যখনই গেছি ওরাই হোটেলের ব্যবস্থা রাখেন এবার শক্তিবাবুকে বলি ওদের কাজে এসেছি, এর মধ্যে আমাদের সিটিংও হয়ে যাবে। ওদের ওখানেই থাকলাম।

কৃষ্ণাজী, বসন্ত নায়েকও এসেছেন। দুই প্রযোজকের তখন টেনশন রাখীজীর কনসেন্ট মেলেনি। বসন্তবাবু বলেন —দাদা রাখীজীকে রাজি করতেই হবে। কৃষ্ণাকে নিয়ে রাখীর বাড়িতে গেলাম। ফোনে বলা ছিল কৃষ্ণাই তার আগে রাখীকে নাকি নিজেই গল্প শুনিয়ে গেছল। রাখী প্রতিবাদী চরিত্রই চায়। মনে হয় জীবনে যত অবিচার হয়েছে তার উপর সেই জ্বালাটাই সে অভিনয়ে দৃপ্ত করে প্রকাশ করতে চায়। ওই ধরনের চরিত্র সে বেশি করেছে।

কিন্তু খুবই বড় মাপের শিল্পী রাখী। তার অভিনয়ের রেঞ্জ অনেক। স্নেহময়ী মায়ের চরিত্রেও সে সার্থক। বঞ্চিতা নারীর অন্তরের অসহায় বেদনাকেও সে বহু চরিত্রে সার্থক ভাবে চিত্রিত করেছে। নিজেকে অভিনয়ের মধ্যে নানাভাবে ভাঙতে পারে রাখী।

সুন্দর দো মহলা বাড়ি। পিছনের মহলে সে থাকে, সামনের মহলে আত্মীয়রা। রাখী তাদের কথাও ভোলেনি। দোতলায় বসার ঘরে বসেছি, ওর তখন একটা কুকুর ছিল খুবই বদমেজাজী। তাকে যথারীতি সামলানো হলো। কৃষ্ণাজী আর ওর ম্যানেজার সঙ্গে বসন্তবাবু। ওরা চুপ করে বসে আছেন। রাখী এসে প্রণাম করে বসলো। কুশল বিনিময়ের পর রাখীই বলে —দাদা আপনাকে এনেছেন এরা? গল্পটা কেমন যেন। এবার আমি নতুন করে রাখীকে নিচ্ছেন শুনে আমিও রাখীকে প্রাধান্য দিয়েই গল্পটাকে সাজিয়েছি। ওকেই বেশি ব্যবহার করেছি। চিত্রনাট্যে কিছু নতুন ঘটনা সংস্থাপনও করেছি।

এবার গল্পটা শুনে রাখী দু'একটা প্রশ্ন তুলতে জানাই ওগুলোর জন্য ভাববেন না। ওই পয়েন্ট দুটো আমিই সামলে দেব। এবার রাখী বলে ঠিক আছে ওগুলো ঠিক করতে হবে, আমি এই রোল করবো। সেদিন চরিত্রটাকে ঠিক এইভাবে শোনানো হয়নি।

এর মধ্যে কৃষ্ণাজীও বসন্তবাবুর ইঙ্গিতে রাখীকে একটু ওদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বোধহয় অর্থকরী ব্যাপারের কথাটা চূড়ান্ত করে কিছু অগ্রিমও দিয়ে আসে।

ওরা লোহা গরম থাকতে থাকতেই আঘাত করতে চায়, রাখীও ওদের সম্মতিপত্র দিলেন এবার।

ওদের টেনশনও কমেছে। এবার বাইরে এসে ওদিকে একটা ফ্রুটজুসের দোকানে বসে নিশ্চিন্তে জুস খেতে খেতে বলে কৃষ্ণাজী —আজকের অপারেশন সাকসেসফুল দাদা। বসন্তবাবু স্মরণ করেন জয় প্রভু জগন্নাথ।

এই ছবির সঙ্গীত পরিচালক রাহুল। সেই পরিচিত মিউজিক স্টুডিও। এখানে সরস্বতী পুজোয় খুবই ধুমধাম হয়। অনেকেই আসেন। সেবার আমি বোম্বেতে।

বোম্বেতে বাঙালিদের দুর্গাপূজা বিরাট উৎসব। বেশ কয়েকটা বড় পুজো হয়। বান্দায় শক্তিবাবুদের পুজোতেও থেকেছি কয়েকবার। ওখানে সবাই আসেন। দুপুরের ভোগের প্রসাদও সকলেই পায়। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও চলে।

সরস্বতী পুজো দু'একটা বাঙালিদের ক্লাব করে। একটা খারেই হয় কোন স্কুলে তবে রাহুলের এখানে পুজোয় ভোগও বেশ ভালোই হয়। আশা ভোঁসলেকে দেখেছি ওই দিকটা সামলাতে। স্বপন চক্রবর্তীও আগরতলার ছেলে। শচীন দেববর্মন ছিলেন আগরতলা রাজবংশের সন্তান। ওর পিতৃদেব বৃন্দাবন চন্দ্র। শচীন কর্তা আগরতলার বিষয় আশয়ের প্রত্যাশা না করে নিজের সঙ্গীত সাধনা নিয়েই ছিলেন। বিষয়ের দাবিদার হয়ে কোনদিন আগরতলায় যাননি। রাহুলও বোম্বেতেই। বরং রাহুল আগরতলায় ওর পৈত্রিক বাড়ির জায়গা রবীন্দ্রভবনকে দান করেন। রাহুলের মুখেই শুনেছি কথাটা। আজকের আগরতলার রবীন্দ্রভবন যেখানে সেটা নাকি ওদেরই বাস্তু ছিল। আজ তা আগরতলার সাংস্কৃতিক তীর্থ।

রাহুলের মনটা ছিল রাজার ছেলের মতোই। গুণী শিল্পী। ওকে চিত্রনাট্যে গানের সিচুয়েশনগুলো বুঝিয়ে দিলাম। স্বপনবাবু গান লিখছেন বাংলায়। স্বরূপ নায়েক উড়িয়ায় লিখছে। বাংলা চিত্রনাট্যে ছিল দুটি ছোট ছেলে মেয়ে, ধনীর দুলালি, সে জন্মলগ্ন থেকে মাতৃহারা।

অন্যটি আশ্রিত একটি কিশোর, সে মাকে হারিয়েছে তাই দুঃখ। বাচ্চা মেয়েটি মা কি জিনিস জানেনা। সে শুধায় ছেলেটিকে মায়ের জন্য এত কাঁদো মা কি কেমন জিনিষ? আমার সংলাপে ছিল—ঘররোদে শূন্য মাঠে ঘোরার পর গাছের ছায়া যেমন, মাও তেমনি। নদীর যে কুল কুল সুর—ওই মায়ের ঘুম পাড়ানি গান। চাঁদের আলো কত সুন্দর—কেন জানো? ওতো মায়েরই হাসি।

এইরকম একটা ব্যাখ্যা ছিল। এখানে ছেলেটা মায়ের স্বরূপ বর্ণনা করে গান গাইবে। স্বপনবাবু ঠিক এই গানটা বারবার লিখেও জমাতে পারছে না। কৃষ্ণাজী, বসন্তবাবু, রাহুল কারও পছন্দ হচ্ছে না। স্বরূপও কিছু লিখতে পারছেন না। এই গানেই এসে ঠেকেছে দুজনে।

আমি সেদিন শক্তিবাবুর সঙ্গে বসেছি 'অন্ধবিচার'-এর চিত্রনাট্য নিয়ে ওসবের কিছুই জানি না। সন্ধ্যায় কৃষ্ণাজী, বসন্তবাবু রাহুলের মিউজিক রুম থেকে 'নটরাজে' এলেন। স্টুডিওর কাজ শেষ করে ফ্ল্যাটে ফিরলাম এক সঙ্গে। এবার বসন্তবাবু বলেন—গুটে প্রবলেম হই গলা। কবি স্বরূপ নায়েক তখন কলম ছেড়ে হাতা খুন্তি ধরেছে। রান্নার লোক আছে, তবু স্বরূপ দু'একটা স্পেশাল উড়িয়া ডিস বানাতো। বিশেষ করে 'সান্তোলা' আমাদেরও ভালো লাগতো। সব রকম আনাজপত্র দিয়ে সজনে ডাঁটা সহযোগে একটা ভেজিটেবল স্যুপ-এর মত রাঁধতো স্বরূপ। খুবই সুস্বাদু।

স্বরূপ ওই নিয়েই ব্যস্ত। বলে মায়ের ডেফিনেশন কি দিমু! উড়িশায় উপরতলার মানুষদের বাড়িতেও দেখেছি ছেলেরা মাকে 'বৌমা' বলে ডাকে অনেক সময়। বাড়িতে শ্বশুর শাশুড়ী ছেলের বৌকে 'বৌমা' বলেই ডাকেন 'নাতি নাতনিরাও বোধহয় ওই ডাক শুনেই মাকেও দাদু দিদার ডাকা ওই নামে ডাকে।

"মা" এই ডাকটা নিশ্চয়ই 'বৌমা' ডাকের থেকেও অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। ওরা অনেকেই এই ডাকে অভ্যস্ত নয়। নিশ্চয়ই অনেকেই 'মা' বলেন তবে বৌমা বলতেও শুনেছি অনেককে। বসন্তবাবু এবার প্রবলেমের কথাটা বলেন। কৃষ্ণাজী বলে, কাল আপনিও চলুন দাদা। ওই স্বপনবাবুকে কিছু বলে কয়ে যদি মায়ের গানটা লেখাতে পারেন। আমি বলি—আমি কি করব? কবিতা-টবিতা ঠিক আসে না। গান লেখার ব্যাপারে আমি কি করব?

বসন্তবাবুও ছাড়লেন না পরদিন বের হলাম কৃষ্ণাজীর সঙ্গে স্বপনবাবুর ফ্ল্যাটে। স্বপনবাবু তখনও কিছু করতে পারেননি। চেষ্টাই করছেন। ওদিকে রাহুল তাড়া দিচ্ছে গান চাই। স্বপনবাবু আমাকে দেখে বলেন, ঠিক আসছে না গানটা। ওদিকে রেকর্ডিং কালই। আমার সঙ্গে চিত্রনাট্যটা ছিল। কী ভেবে ব্যাগ থেকে সেটা বের করে ওই সিনে ওদের মায়ের প্রসঙ্গে ডাগালগগুলো দেখিয়ে বলি। আমি এই ডায়ালগগুলো তুলে দিচ্ছি। মেয়েটি ছেলেটিকে 'মা' কী এই প্রশ্ন করার পর ছেলেটি ডায়ালগ কিছু না বলে এইটা গানেই গেয়ে শোনাক। মা যে রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে শীতল ছায়া, নদীর কলতানকেই মায়ের সুর চাঁদের আলোই মায়ের হাসি—এইগুলো তিনটে অন্তরায় লিখে ফেলুন।

স্বপনবাবু এবার চমকে ওঠে—বাঃ দারুণ হবে এটা তো ভাবিনি। স্বপনবাবু এবার ওগুলোকেই গানে সাজিয়ে নিয়ে দৌড়লেন রাহুলের মিউজিক রুমের দিকে।

আমরা এইবার বাইরে চা খেয়ে মিউজিক রুমে ঢুকলাম। তখন রাহুলের সঙ্গে স্বপনবাবুও হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছে। ওই নতুন গানটা বেশ মেজাজ দিয়ে সুর নিয়ে পড়েছে।

গানটা শোনালো রাহুল। খুব ভালো উৎরেছে। সুরও হয়েছে তেমনি। ওদিকে মুখ বোদা করে বসে আছে স্বরূপ নায়েক। কৃষ্ণাও খুশি তার গান সব হয়ে গেছে। এই গানটা গাইবে কবিতা কৃষ্ণমূর্তি। গেয়েছিলও দারুণ 'মা' ছবিতে এই গানটা ছিল প্লাশপয়েন্ট।

স্বরূপকেও এবার উড়িয়া ভাষান্তরিত করতে হবে ওই গান, মা-এর সমন্ধে বাঙালির সেন্টিমেন্ট আর ওদের আবেগের কিছুটা এদিক ওদিক আছে। বৌমা-ই ওদের মা—ফলে বৌমা কথাটা বসিয়ে ওই ছবিটাকে আঁকার অসুবিধা আছে আসছেনা। স্বরূপ আমাকে বলে, দাদা তুমিই মুকে মহানদীর জলে ফেলাই দিলা।

—আমি কি করলাম? স্বরূপ বলে তুমিই তো ডায়ালগ উঠিয়ে ওগুলো ওকেই দিয়ে দিলে, নাহলে স্বপনদাও হাবুডুবু খাচ্ছিল, ও এখন হমি পেয়েগেছে এখন মরুতব্যাটা এই স্বরূপ, তুমিই এসব করেছো। শেষ অবধি ও উড়িষ্যার জন্য ওই গান

লিখেছিল অন্যভাবে। মায়ের এই ইমোশেন ও উড়িষ্যার গানে ঠিক আনতে পারেনি, অন্যপক্ষে গানটা লিখেছিল।

মায়ের শুটিং কিছু কলকাতায়, কিছু হয়েছিল ভুবনেশ্বর, আর অ্যাকশনের সিনগুলো নেওয়া হয়েছিল পারাদ্বীপ পোর্টে কোন জাহাজের উপর।

প্রশান্ত নন্দ উড়িষ্যার অন্যতম বড় মাপের পরিচালক তখন শুটিং চলছে ভুবনেশ্বরের হোটেল সফরীতে। হোটেল সফরী মাদ্রাজ হাইওয়ের ধারে পুরোনো ভুবনেশ্বরে। প্রায় তিরিশ চল্লিশ বিঘা পাঁচিল ঘেরা একটা জায়গার একাংশে হোটেল কটেজগুলো বাকি জায়গাতে বাগান, ফাঁকা মাঠ—গাছ গাছালি একটা বড় শেড আছে তাতে সেটও তৈরি করা যায়। এছাড়া ভুবনেশ্বরের আশপাশেই পাহাড়-বন-নদী-মন্দির, সবই আছে। খণ্ডগিরি, উদয়গিরিতেও গানের টেক করা হয়েছিল। ওই হোটেলের বাগানে শেডেও সেট করে কাজ করা হয়, স্টুডিওর ভাড়াও বাঁচে। এই প্রসঙ্গে কলাকুশলীরদের ও দেখেছি। কথাটা অপ্রিয় তবু কঠিন সত্য।

বাঙালি টেকনিসিয়ানরা হিসাবটা অনেকেই ভালো বোঝেন, তাদের টি.টিফিন, লাঞ্চ ঠিক সময়ে না পেলে তারা ক্ষুব্ধ হন, বোম্বাই'র কলাকুশলীদের সঙ্গে, আশা ভালোবাসা ছবিতে চায়না ক্রিকেটে আম বাগানে এখানের কিছু কলাকুশলী কাজ করছেন, জায়গাটা আন্ধেরী থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। স্টুডিও থেকে গাড়িতে লাঞ্চ যেতে একটু দেরি করছে, একটা বাজতেই এখানের বাবুরা ছটফট করছেন, শুটিং হয় তো সন্ধ্যাই করবেন, কিন্তু বোম্বের কলাকুশলীদের এসব প্রশ্নই নেই। তারা কাজ করছে মুখ বুজে। খাবারের একটু ঊনিশ বিশ হলেই আপত্তি যেন রোজই সকলে ষোলআনা সুখাদ্যই খান। এদের ঘড়ি ধরে আট ঘণ্টা শিফ্‌ট, আধ ঘণ্টার বেশি কাজ হলেই দেড় শিফ্‌টের মজুরি দিতেই হবে। মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদে এই শিফ্‌টের কড়াকড়ি নেই, ডে বেসিসে কাজ আর ওদের খাবারও বাংলা ছবির মত এত দামিও নয়। সাধারণত নিরামিশই। ওরা কাজ করে নিষ্ঠার সঙ্গে কিছু করার জন্য। আমরা কাজ করি রোজগার করার জন্যই। ওয়ার্ক কালচার বাংলা ছবিতে যা আগে দেখেছি আজ তা নাই। কলাকুশলীদের ওই অবস্থা, শিল্পীরাও একসঙ্গে বহু ছবির কাজ করেন, তারপর ওয়ান ওয়াল, বাইরের ফ্রেপ, সভার হাজিরা দিয়ে অ্যাপিয়ারেন্স মানিও নেন, ফলে একদিনে দুটো ছবির কাজও, ওসব করেন। প্রযোজকের শুটিং ডেট বাড়ে তারা কম সময় দেন বলে। এডিটিং করতেও দেড় মাস লাগে। তখন দরকার এডিটার তার সহকারীর। ঘরের মধ্যে কায। তবু ইউনিয়ন এর আদেশ একজন প্রোডাকশন বয় নিতেই হবে। তার কাজ কিছুই নাই। তবু প্রযোজককে একশো পঁচিশ টাকার মত মজুরি টিফিন লাঞ্চও দিতে হবে তাকে বসিয়ে দেড় মাস দুমাস তাকে এই ঘটা বইতে হবে। প্রযোজক এখানে অসহায় সে যেন মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।

ছবি শেষ করা হতো তখন তাতে পরিবেশকও কিছু টাকা দিতেন। এখন সাধারণ

প্রযোজককেই ছবি শেষ করতে হয়, তারপর পরিবেশক আসেন। তিনি কয়েকটা রিলিজিং হাউস থেকে কিছু আগাম নিয়ে তা দেন প্রযোজককে ছবির মুক্তি পাবার জন্য। আর তার পর থেকে পরিবেশকই তখন ছবির ভাগ্যবিধাতা। প্রযোজক তার হাতে, পরিবেশক যা হিসাব দেবেন তাই মেনে নিতে হবে। তার টাকা ছবি সুপার হিট না হলে প্রায়ই ওঠেনা। নতুন প্রযোজক সব দিক থেকেই অসহযোগিতা বঞ্চনার শিকার হন অনেক ক্ষেত্রেই। যারা ছবির জগতে আছেন তারা এসব সামলে কাজ করতে পারেন। ভুবনেশ্বরে গিয়ে দেখি রাখী ইউনিটে বেশ জমিয়েই রয়েছেন। তার রন্ধনপর্ব চলেছে মাছের নানা পদও আমিও শরিকান হই। এখানে মাদ্রাজের কলাকুশলীদের সঙ্গে উড়িষ্যার ছেলেরাও কাজ করছে।

সেদিন বেলা বারোটা নাগাদ সেটের প্রডাকশন বয়কে বল্লাম আমি আজ জগন্নাথ এক্সপ্রেসে কলকাতা ফিরবো। তুমি সন্ধা আটটায় আজ আমার রাতের খাবার ঘরে পৌঁছে দেবে আমি প্রশান্ত নন্দার পাশের দুনম্বর রুমে আছি। ছেলেটি বলে ঠিক আছে স্যার। তারপর দিন ভোর কাজে ডুবে যাই। প্রশান্ত নন্দার মত পরিচালকও দেখি চিত্রনাট্যে বেশ কিছু বাড়তি দৃশ্য যোগ করেছেন বলি এগুলো মূল কাহিনীর সঙ্গে মিলছে না। এগুলো রাখলে গল্পই মার খাবে। তিনি ডিরেক্টর নিজেই ওগুলো পাঁচ দিন শুটিং করলেন অবশ্য তারপর ওই শুটিং করা নিগেটিভ ফেলেই দিতে হলো। মাস থেকে টাকা গেল। প্রযোজকদের প্রোডাকশনের সময় হিসেব থাকেনা। হিসাব ঠিক ঠাক থাকে লেখক, চিত্রনাট্যকারদের বেলাতে। যারা টাকা দেন তারা যদি লেখককে সেই টাকাটা তার লেখার সময়ই দেন লেখার মান অনেক উন্নত হয়, লেখক সেখানে তার নায্য প্রাপ্যটুকু সময়ে পান মন দিয়ে লিখতে পারেন। তাতে প্রযোজকেরই লাভ। কিন্তু এরা সেকথা বুঝতেই চান না। ফলে ছবির মানও নেমে যায়। 'মা' বাংলা উড়িয়া দুই ভাষাতেই হিট করেছিল। পরে বীরেশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুখের সংসার নামে একটি বাংলা উড়িয়া ছবি করেছিলাম। উড়িষ্যাতে এখনও ছবির জগতে ওয়ার্ক কালচার আছে ওরা বাংলা নয় অন্ধ্র, মাদ্রাজের প্রতি বেশি আকৃষ্ট, তাই ওই কাজের পরিবেশ আছে তা বুঝেছিলাম হাড়ির একটা ভাত টিপলে বোঝা যায় তেমনি। সেই উড়িয়া প্রোডাকশন বয়টির কাজের নমুনা দেখে ওদের উপর আস্থা বেড়েছিল বেলা বারোটায় তাকে সন্ধ্যার খাবার ঘরে আটটার সময় দিতে বলে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আর মনেও ছিলনা। রাতে ফিরতে হবে। সাড়ে সাতটায় স্নান করে এবার খাবারের কথা মনে পড়ে। কে জানে ছেলেটি বোধহয় ভুলে গেছে। কিন্তু ঠিক আটটার সময় বেল বাজতে দরজা খুলে দেখি সেই ছেলেটি আমার খাবার নিয়ে এসেছে। ছোট্ট একটা ঘটনা কিন্তু আমাকে বিস্মিত করেছিল। এখানে এ ঘটনা ঘটেনা। তিনবার তাড়া দিলে তবে কিছু হবে। এদের সিফ্‌টের হিসাব নাই এখানের কর্মীরা জানাতো আট ঘণ্টা হয়ে গেছে। আমার ডিউটি খালাস।

এই আতঙ্কে আসাম, উড়িষ্যার প্রযোজকরা ভুলেও এখানে আসে না। শক্তি সামন্ত আসতে চেষ্টা করেছিলেন। ইউনিট করতে চেয়েছিলেন তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

এবার ইন্দোবাংলা দেশ যৌথ প্রযোজনার আইনের ফাঁকে অগোচরে এক নতুন ব্যবসা শুরু হলো। বাংলা ছবির জগতে এর মধ্যে বাংলাদেশের থেকে আসত এক প্রযোজক। পরিচালক বাংলা দেশের হিট নিম্নরুচি, ভিন্নরুচির কিছু ঝড়তি পড়তি ক্যাসেট এনে সেই গল্প মেঠো সংলাপ ওয়ালা সস্তারুচির ছবির রিমেক শুরু করলেন।

ততদিনে বাংলা ছবির দর্শককে টানতে শুরু করেছে টিভির নরমগরম অনুষ্ঠান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিল সিনেমার প্রধান দর্শক, টিভি তাদের আটকে দিয়েছে। এখন ছবি দেখে টি-ভি যাদের নাই। সমাজের প্রত্যন্ত শ্রেণীর মানুষ, তাদের রুচিতে বেশ উপভোগ্য হয় ওই বাংলা দেশের তৈরী রগরগে ছবি। ফলে সেই ডিরেক্টার এর ছবি পয়সা পায়, প্রযোজকরাও ভালো ছবি করে লোকসান দেবার কথা ভেবেই ওই ধরনের ছবির জন্য সেই চালু হাতে গরম ছবির ডিরেক্টারের পিছনেই লাইন দেন। তিনিও এবার পাইকেরী হারে ছবি করে গিনেস বুকে নাম তুলবার কথা ভাবছেন। বিজ্ঞ পরিচালকরা একসঙ্গে দুটো ছবি শুরু হলে ভাবিত হন। এরা দুহাতে বছরে সাতজন প্রযোজকের সাতখানা ছবি সুর করেন। তার তাতে চলে এলো শিল্পীরাও কলাকুশলীরাও, বাঁধা কাজ এই দাদা ছাড়া আর কেউ দেবেন না। তিনি একই সেটে সকালে মহাজনের বাড়ি, দুপুরে পর্দা বদলে সোফা বসিয়ে শিল্পপতির ড্রইং রুম, সন্ধ্যায় সেটের একটা পাশ খুলে আলনা চৌকি বসিয়ে সেই সেটের গ্রামের ঘর বানালেন অন্য ছবির জন্য আর একই শিল্পীরা সকালে মহাজন, তস্যপুত্র, দুপুরে শিল্পপতি, তস্য ম্যানেজার রাত্রে গ্রামের আদর্শবান বৃদ্ধ শিক্ষক, তস্য ছাত্র, ইত্যাদি সেজে এক অন্ধ, তিন রাপ ফুটিয়ে ছবি করলেন। তিনটে ছবির কাজ করে নগদেই দুই ছবির টাকা পেলেন। প্রযোজকের সেটের ঘটাও পড়লো এক তৃতীয়াংশ, টেকনিশয়ানরাও ডবল রোজ পেয়ে তিনটে ছবিতে ওই সময়ের মধ্যে খেটে দিলেন। আর কাহিনী চিত্রনাট্যের জন্য বাংলাদেশী লেখককে কিছু দিয়ে ম্যানেজ করেছে। চিত্রানাট্য কপি করেছে ভি-সি-আর দেখে। ডিরেক্টারকে ক্যামেরাম্যানকে ভাবতে হবেনা। ক্যামেরা প্লেসিং-এর জন্য। ফলে ওই এক দিনে তিনছবির শুটিং করে পঁচিশ দিনেই সারা। পরে দেখা গেল বারো পনেরো লাখ টাকা একটা ছবির খরচ পড়েছে ওই ফ্যাক্টরী থেকে বের হতে। আর তিনটে ছবির একটা ওই মেঠো দর্শকরা লুফে নিলেই জয়জয়কার হয়। ওই পরিচালকের আবার আসে এক ঝাঁক প্রযোজক আবার এক কড়াই বেগুনি ছাড়া হলো কড়াই-এ হাতে গরম মাল বের হবে। শুরু হল ওর আর একগুচ্ছ ছবির কাজ। ওদেশের লেখক কিছু প্রণামী পেলেন এদেশের লেখকদের ঠাঁই এদেশের লেখক তার কাছে চিত্রনাট্যকারদের গালে এমনি করে বঞ্চনার থাপ্পড়ই মারা হয়েছে। এদেশের লেখকদের ডজন ডজন বই বাংলাদেশে

বিক্রীর অনুমতিতে ছেপে তারা প্রকাশ্য বাজারে জাহাজঘাটায় বিক্রী করেছেন এদেশের লেখককে বঞ্চিত করে তার কোন প্রতিকার হয়নি। আজও সেই ব্যবসা চলছে রমরম করে। অথচ সেদেশের এক চিত্রকাহিনীকারের একটা চিত্রনাট্য এখানের এক প্রযোজক অমনি ঢাকা মার্কা কোন পরিচালককে দিয়ে ছবি করালেন তাতে সেই চিত্রকাহিনীকাররের নাম ছিল না দেখে তিনি এখানে কেসও করলেন ছবির প্রদর্শনীও বন্ধ হলো। পরে দেখা গেল যে চিত্রকাহিনীকার এটিকে তার কাহিনী বলে জোরালো দাবী করেছেন। সেটি আসলে শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাসের কাহিনী। সেই ঘটনা সংলাপও সবই আছে। তাতে ওই লেখক একটি মুসলিম চরিত্র কিছু ঘটনা যোগ করেছেন মাত্র। শরৎচন্দ্রের দেশে এসে তিনি এহেন কান্ড করতে প্রয়াস পান। তার আবেদন অবশ্য টেকেনি। আবার দেখি দীপামেহতা যার শিল্পী স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সুনীল গাঙ্গুলীও আবেদন করেছিলেন তিনিই সুনীলবাবু উপন্যাসের কিছু অংশে চিত্রনাট্যে বসিয়ে তার নামেই অভিযোগ এনেছেন, সুনীলবাবুর নামে এই অসত্য অভিযোগ বাঙালি সাহিত্যিকদের প্রতিই অবমাননার বঞ্চনার প্রয়াস।

সাহিত্যিকরা এই বঞ্চনার শিকার সর্বত্রই সাহিত্যিকদের তেমন কোন সংস্থা আজও নেই যারা এর প্রতিবাদ প্রতিকার করতে পারেন।

ওইভাবে একছাঁচে ছবি তৈরি হতে হতে এখন দর্শকরা সেই ফাঁকিটা ধরে ফেলেছেন। ফলে সেই সব ছবিও এখন চলছে না। প্রযোজকরা তার পিছনে ইঁদুর দৌড় থামিয়েছেন। কিন্তু এতকাল ধরে ওই পেঁয়াজী খাইয়ে দর্শকদের রুচিকে তার মত পরিচালকরা শেষ করে দিয়েছে।

আর এক শ্রেণীর প্রযোজক তারা আরও করিতকর্মা। এঁরা তবুতো এখানে শুটিং করেন মাসাবধিকাল। শিল্পী, কলাকুশলীরা কিছু পয়সা পান, মডিটিং, ল্যাবরেটারীও পয়সা পায়। কিন্তু এই করিতকর্মা প্রযোজকরা যৌথ প্রযোজনার আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কলকার বাইরে অন্যত্র শুটিং-এর নামে ওদেশ থেকে কিছু লোকজন শিল্পী এনে কিছুদিন মাত্র শুটিং করে বাকি ওদেশের স্যুটকরা নেগেটিভ এর সঙ্গে হুড়ে ছবি তৈরী করে বাজারে খুব কম খরচে ছবি করে ছাড়তে থাকেন।

এই নিয়ে শিল্পী কলাকুশলীরা বঞ্চিত হয়ে প্রতিবাদ মিটিং মিছিল করে আন্দোলনে নামেন। কিছুটা বন্ধ হলো, আর দেখা গেল প্রতিবাদ! কিছু লোককেই সেই প্রযোজকরা তাদের ওমনি আধ খেবড়া ছবির ডিরেক্টারই করে দিলেন আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে গেল কোন মন্ত্র বলে।

অবশ্য দর্শকরা সেসব ছবিকেও নিদারুণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আজ তাই দু-একখানা ভালো ছবি যা ওরা হচ্ছে তারা শহর অঞ্চলেই ব্যবসা করছে সুনাম পাছে গ্রাম গঞ্জের দর্শক যারা বেশি পয়সা দেয় সেখানে টানতে পারছেনা। সেই দর্শকদের রুচিকেও ক'বছরে ওইসব গরম মার্কা ছবি বিকৃত করেছে।

ছবির ব্যবসাতে কিছু দিন আগেও বহু বনেদী বাঙালি প্রযোজক ছিলেন পরিবেশক ছিলেন তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় অনেক রুচিপূর্ণ ভালো বাংলা ছবি হয়েছে। আজ সেই প্রযোজক, পরিবেশক, পরিচালকরা নেই। বাংলা ছবির নিয়ামক এখন অবাঙ্গালী প্রযোজক পরিবেশরাই তাঁরা হিন্দি তামিল হিট ছবির দুতিনটে ক্যাসেট দেখে নিজেরাই একটা গল্প তৈরী করে নিয়ে। যাত্রা জগতের বাতিল লেখক বা তাদের পেটোয়া কোনও লোককে দিয়ে নিজেরাই ফরমাইস মত একটা গল্প খাড়া করেন। পরিচালকও তারাই ধরে এনে ছবি করান অনেক ক্ষেত্রে পরিচালকই গল্প চিত্রনাট্য সব লিখে দেন। শিল্পীরও খুবই অভাব বাংলায়। সেই ক'জনই ঘুরে ফিরে সব ছবিতে সেবার পুজোতে চারখানা ছবি রিলিজ করলো একজোড়া হিরো হিরোইনের ফলে দর্শকও হতাশ নতুন মুখ নাই। চারটে ছবিই ফেল করলো।

বাংলা ছবিতে ভয়ে প্রযোজকরা গুটিয়ে গেছেন। টি-ভির সিরিয়ালই এখন কলাকুশলী, কিছু শিল্পীদের বাঁচিয়ে রেখেছে। স্টুডিওগুলোও কোনমতে টিকে আছে।

বাংলা থিয়েটার যা ছিল বাঙালির গৌরব, ঐতিহ্য, যেখানে শিল্পী তৈরী হতো, সেই পেশাদার রঙ্গমঞ্চ আজও মৃতপ্রায়, বাংলার ছবির ভবিষ্যৎও আজ তমসাচ্ছন্ন। টিকে আছে টিভি কিন্তু ওতো ওষধি বৃক্ষ বিজ্ঞাপন আর স্পনসরের দায় চলছে। একবার দেখানো হলে শেষ, আর জলঢেলে সাবানের ফেনার মত ফুলিয়ে তোলা বুদবুদ পরখ নেই সে শূন্যে বিলীন এদিয়ে স্থায়ী কোন ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে প্রকাশ করা মুশকিল।

তাই ভয় হয় পঞ্চাশ বৎসর আগে তারপর ষাটের দশকেও বাংলা রঙ্গমঞ্চ ছবিতে যে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রকাশ ঘটেছিল তাকি দুই সহস্রাব্দেই শেষ হয়ে যাবে? কিন্তু তা মনে হয় না। এই সব মাধ্যম বিজ্ঞান বর্তমান সভ্যতার যুগে বাতিল হয়ে নতুন কোন মিডিয়া মাধ্যম আসবে। এই প্রজন্মকে সেই পরিবর্তনকে মেনে নতুন করে এগিয়ে যেতে হবে। তার মাধ্যমেই আবার পুরাতন কৃষ্টি, ঐতিহ্যকে নবরূপে প্রকাশ, প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই কাজ নতুন প্রজন্মের। সেই মাধ্যমে আর তারা নতুন করে নিজেদের আবিষ্কার করার এই বিশ্বাস আমি রাখি।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পিছনে চাইলে সেই দিনগুলোর কথাই মনে পড়ে কত ঝলমলে দিন কত নতুন মানুষের মুখ, কত বন্ধুর মিছিল তারা সব হারিয়ে গেছে। আমিও একদিন হারিয়ে যাব, তবু এই জগৎ স্বমহিমায় টিকে থাকবে আবার সৃষ্টির সার্থকতায় ভরে উঠবে নিশ্চয়ই। জীবন কোনদিনই থেমে থাকে না। সে কালের প্রবাহ পথে মহাকালের দিকে এগিয়ে যায়।